উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)

আম্মাজান

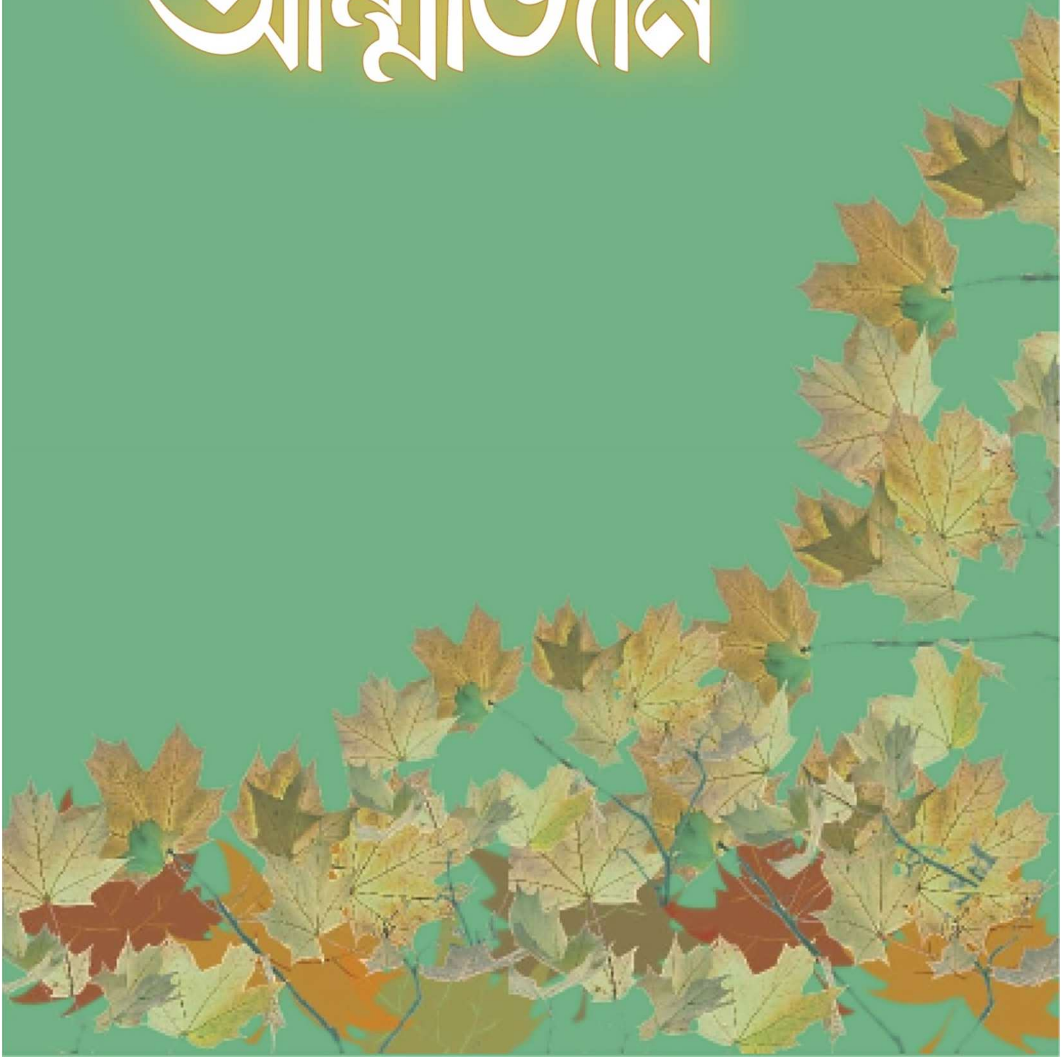

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)

আম্মাজান

প্রথম প্রকাশ
২৬ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট

গ্রন্থস্বত্ত্ব:
প্রকাশক

প্রচ্ছদ:
ড. হাসনে আয়মুন

গ্রাফিক্স
লাইভ কালার

মুদ্রণে:
আলোকধারা বুক্‌স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

শুভেচ্ছা মূল্য: ২০০ টাকা মাত্র

সম্পাদনাঃ

ড. হাসনে আয়মুন

সম্পাদনা পর্ষদঃ

অধ্যাপক জহুর উল আলম
আবু নাসের নূর অন্তু
তানভীর হোসাইন
মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন
মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান টুটুল
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম

তথ্যসংগ্রহঃ

সৈয়দা রাইসা ফাতিমা
শাহিনা আখতার
এইচ আর মেহবুব জিকু
এডভোকেট শাহজাদী মুক্তা
সৈয়দা রেহেনা আফরোজ
মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীন
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

অনুলিখনঃ

এলিজা মহসিন
সৈয়দা আকলিমা ফাতিমা
উম্মে আল আসফিয়া
মোহাম্মদ মুজিবুল হক
তারেক আহমদ
ইরফানুর রহমান রিয়াদ
মোহাম্মদ ইসমাইল
ফয়েজুল ইসলাম
ইশতিয়াক আহমেদ ফাহিম
ইরফান হাসান
ইরফানুর রহমান
হাবিবুল করিম তুষার
মোহাম্মদ সাদ ইবনে আলম
শেখ মুবিনুর রহমান
মোহাম্মদ জিয়াউল আলম
মোহাম্মদ সানজিম সরোয়ার রাকিব

সহযোগিতাঃ

সঞ্জয় পাল
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন বেলাল
মোহাম্মদ শাখাইরুল ইসলাম

উৎসর্গ

মাইজভাণ্ডারী দর্শনের স্বরূপ উন্মোচক
অছিয়ে গাউসুল আযম
হযরত শাহ্ সুফি **সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)** এবং
তাঁর পত্নী **শাহ্জাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন মাইজভাণ্ডারী (রহ.)**-এর
পবিত্র করকমলে

আমাদের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

এই বিশ্ব চরাচরে প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)'র জীবনসঙ্গীনি হিসেবে প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আ.)কে প্রেরণ করেছেন মহান সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ্। ধর্মীয় কিতাবসমূহ এবং মানব সভ্যতার সকল ইতিহাসে আদম-হাওয়ার বিবরণী সযত্নে লিপিবদ্ধ আছে। তবে আহলে কিতাবীদের কোন কোন গোষ্ঠী ভুল তথ্য সংযোজন এবং পরিবেশন করে পৃথিবীতে হযরত আদম (আ.)'র প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহের জন্যে হযরত হাওয়া (আ.)'র উপর দোষ চাপিয়ে থাকেন। অথচ পবিত্র কোরআন "তাদের উভয়কে কুমন্ত্রনা দিল" বাক্যাংশের মাধ্যমে হযরত হাওয়া (আ.)'র উপর একতরফা দোষারোপকে খণ্ডন করে দিয়েছে। মূলত: আল্লাহ্ আদমকে তথা মানব জাতিকে পৃথিবীর বুকে তাঁর খলিফা হিসেবে প্রেরণ করার জন্যে যে উসিলার অবতারণা করেছেন তাতে মানব রুহের সঙ্গে নফ্‌সের অবস্থানগত সম্পর্কও নির্দেশ করা হয়েছে। রুহ্ এবং নফ্‌স মানব-মানবী উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তাই পৃথিবীর বুকে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয় রকমের কর্মধারার সঙ্গে পুরুষ এবং নারী সমভাবে জড়িয়ে আছে। একতরফাভাবে আহলে কিতাবীদের কোন কোন অংশের ভুল তথ্যের ভিত্তিতে হযরত হাওয়া (আ.)-কে দায়ী করে নারী সমাজ সম্পর্কে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং কুসংস্কার লালন করা কোরানিক নির্দেশনা বিরোধী। আহলে কিতাবীদের একাংশের অভিমতকে ধারণ করে নারীজাতি সম্পর্কে বিকৃত ধারণা পোষনের কারণে শুধু মুসলিম উম্মাহ্'র মধ্যে নয়, পৃথিবীজুড়ে নারীদের প্রতি এক ধরনের উপেক্ষা-অবজ্ঞা চলমান রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম উম্মাহ্'র অনেকেই নারীজাতি সম্পর্কে এ ধরনের সংকীর্ণ আচরণ ও মনোভাব লালন করে থাকেন।

হযরত আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)'র আগমনের পর তাঁরা দু'জন পৃথিবীর দু প্রান্তে অবস্থান করেছিলেন। কষ্টসাধ্য জীবনাতিপাত এবং অনুশোচনায় উভয়েই দগ্ধ হয়ে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছিলেন। তখন বিরহ, বিচ্ছেদ, বিলাপের সময়কাল পুরুষ এবং নারীর জন্যে ভেদরেখা মানেনি। পৃথিবীতে কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি, মানব বংশ বিস্তার, সৎকর্ম সাধনসহ তাঁদের উদ্যমেই পৃথিবী আবাদ হয়েছে, মানব জাতির বংশ বিস্তার ঘটেছে, আল্লাহ্'র প্রতিনিধিত্বের সুর নানা রবে ধ্বনিত হয়েছে। তবে আলোচনায় অগ্রাধিকার লাভ করেছেন পুরুষ হিসেবে হযরত আদম (আ.)।

আল্লাহ্'র প্রিয় বান্দা হিসেবে নবী-রাসূল, ওলী-দরবেশের পবিত্র খাতায় অন্তর্ভুক্তি হিসেবে পুরুষের সংখ্যা যেমন রয়েছে, একইভাবে পবিত্র, সতী, মহতী হিসেবে সম্বোধিত নারীর সংখ্যাও কম নয়। হযরত নূহ্ (আ.) এবং লুত (আ.)'র স্ত্রী যেমন বিপথগামী হিসেবে অভিহিত হয়েছে, অনুরূপ ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া মুসা নবীর (আ.) লালন-পালনকারী হিসেবে সিরাতুল মুস্তাকীমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। একইভাবে পুরুষদের মধ্য থেকে যেমন নবী-পয়গম্বরের সংখ্যা দেখা যায় তেমনি কাবিল, কেনান, নমরুদ, ফেরাউনের মতো জালিমরা পুরুষই বটে। সুতরাং আল্লাহ্'র পৃথিবীতে শারীরিক কারণে পুরুষের গঠন শৈলীতে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হলেও সৎকর্ম, উদ্যম এবং পারিবারিক পর্যায়ে বংশধরদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি এবং নৈতিকতা রপ্ত করানোর ব্যাপারে নারীর ভূমিকাই হচ্ছে মূখ্য। এই প্রসঙ্গে ইসলাম প্রচারের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় নারীদের মহান ভূমিকা উল্লেখ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) কর্তৃক মক্কার কুরাইশদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পেশ কালে প্রকাশ্যে প্রথম ইসলাম এনেছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রা.)। বিশ্বনবী (দ.)'র নবুয়ত সম্পর্কিত তথ্য নবী পরিবারের বাইরের ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম অবহিত করেন হযরত খাদিজা (রা.)। একই সঙ্গে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলাম প্রচারে উৎসর্গ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়ে আছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং বিশ্বনবী (দ.)-কে আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে স্বীকার করে প্রকাশ্যে ঈমান ঘোষণা করার কারণে প্রথম শাহাদাত আলিঙ্গণ করেন একজন নারী। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর মাতা হযরত সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত (রা.)। উল্লেখ্য যে এই মহান

মজলুম মহিলা সাহাবী সকল নির্যাতিত সাহাবা এবং শহীদের পথিকৃত হিসেবে সম্মানিত হয়ে আছেন।

ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নারীর এ ধরনের প্রাথমিক ভূমিকা অনুল্লেখ্যই থাকে। ফলে অসংখ্য রকমের নীরব কর্মধারায় ব্যাপক অবদান রাখা সত্বেও নারী জাতির গৌরবগাঁথা তেমনভাবে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয় না। তাই অসংখ্য মহীয়সী নারীর জীবনগাঁথা এবং অবদান মানবজাতির নিকট অজানাই থাকে। এ কারণে আমরা উম্মুল মু'মিনীন (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) সহ কতিপয় বিশেষভাবে পরিচিত মহিলা ব্যক্তিত্ব ব্যতীত অনেকের সম্পর্কে কিছুই অবহিত নই। আদম জাতির মাতা হযরত হাওয়া (আ.), হযরত আছিয়া, হযরত রহিমা, হযরত মরিয়ম (আ.) সহ পবিত্র কিতাবে উল্লেখিত মহিলা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা বিশেষ কিছু জ্ঞাত নই। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের অবদান এবং কর্মধারা সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা নেই। এটি মানব ইতিহাসের মহা ঘাটতি।

নারী জাতি সম্পর্কে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা যখন বিদ্যমান তখন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট কর্তৃক উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর কর্ম ও জীবন সম্পর্কে স্মারক গ্রন্থ 'আম্মাজান' প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি বিরল উদ্যোগ। উম্মুল আশেকীন আমাদের জন্মদাত্রী আম্মা। আমাদের মহান পিতা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) আধ্যাত্মিক জগতের চির দীপ্যমান কর্মকর্তৃত্বে আল্লাহ্'র তরফ থেকে নিয়োজিত থাকায় সংসার ও পরিবার পরিজনের জন্যে প্রাসঙ্গিক সময় দিতে সক্ষম হননি। তাঁর সান্নিধ্যও আমরা কম উপভোগ করেছি। পিতৃসান্নিধ্যের সীমিতাবস্থা আমরা পূরণ করতে পেরেছি আম্মাজানের সার্বক্ষণিক সতর্ক কর্মব্যস্ততা এবং অসীম স্নেহ মমতায় – সর্বোপরি বস্তুনিষ্ঠ দিক নির্দেশনায়। আমাদের 'মা' আমাদের কাছে এক অনন্য অধ্যায়। এই সঙ্গে তিনি অগণিত ভক্ত-আশেকের মহীয়সী আম্মাজান হিসেবে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বরিত হয়েছেন। তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' কর্তৃক গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন সম্পন্ন করায় আমরা আনন্দিত – প্রফুল্লচিত্ত। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, সম্পাদকীয় পরিষদ, লেখক, তথ্য সংগ্রাহক, অনুলেখক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্'র প্রতি আনুগত্য পেশ করে রাসূলে খোদা (দ.)'র প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। অগণিত শোকরিয়া বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র ত্বরিকা, বিশ্বসমাদৃত 'ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রতি। না'ত ও সালাম পেশ করছি গাউসুল আযম বিল বিরাসাত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.), মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং ত্বরিকার উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রতি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের প্রতি রহমতের অবারিত দৃষ্টিদান করুন। আস্-সালাম।

সৈয়দা জেবুন্নাহার বেগম, চেয়ারপারসন
সৈয়দা হুমায়রা বেগম, সদস্য
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান, ম্যানেজিং ট্রাস্টি
সৈয়দা কুমকুম হাবিবা, সদস্য
সৈয়দা মুনমুন হাবিবা, সদস্য
সৈয়দা কানিজ ফাতেমা, সদস্য

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবর্গ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

সম্পাদকের কথা

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সহধর্মিণী এবং হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ.)-এর মাতা। তাঁর প্রথম ওফাত বার্ষিকীতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আম্মাজান শিরোনামে স্মারক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করায় আমি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তথ্য সংগ্রহ, অনুলিখন, সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সমপৃক্ত সকলকে ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গ্রন্থের কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। সকলের পরম প্রিয় শ্রদ্ধেয় আম্মাজান, বৈবাহিক সূত্রে যার আগমন ঘটে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসায় যিনি আপন করে নিয়েছেন পরিবার-পরিজন, ভক্ত-অনুরাগী সকলকে। সুখ, দুঃখ, হাসি, আনন্দে অতিবাহিত করেছেন জীবনের চলার পথের প্রতিটি মুহূর্ত। যিনি ছিলেন গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রাণ। যার পদচারণায় একসময় মুখরিত ছিল মন্‌জিল প্রাঙ্গন। যার কথা মনে হলেই শুভ্র পরিপাটি শাড়িতে স্নিগ্ধ হাসি মাখা পবিত্র একখানা মুখ ভেসে ওঠে হৃদয় পটে। অন্দরমহল থেকে যিনি তাঁর স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও দৃঢ়তা সহকারে সামলেছেন অন্দর ও বাহিরের যাবতীয় কার্যক্রম। অগণিত ভক্তকুলের দেওয়া আম্মাজান উপাধিতে তিনি সবার হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। তাঁর প্রথম ওফাত বার্ষিকীতে প্রকাশিত স্মৃতিচারণ মূলক স্মারক গ্রন্থ সংকলনে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত, কৃতজ্ঞ। আমি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি, মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন। আমিন।

ড. হাসনে আয়মুন
অক্টোবর, ২০২২ ইং

সূচিপত্র

ভক্ত	১১
খাদেম-খাদেমা	১১১
আত্মীয়-নিকটাত্মীয়	১৪২
পরিবার	২০৮
তথ্য সংগ্রহকারীর মতামত	২৮০
অ্যালবাম	২৮৬

আম্মাজান ও তাঁর পৈত্রিক পরিচিতি

আম্মাজান আমার ছোট ফুপুআম্মা। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে তাঁর স্নেহ আদর সোহাগে বড় হয়েছি, ছোটবেলায় মাইজভাণ্ডার গিয়েও অনেক জ্বালাতন করেছি, তিনি হাসি মুখে সব সয়েছেন, কিভাবে কি করতে হয়, জিয়ারতে কি পড়তে হয় তা শিখিয়েছেন। বাবাজানের সাথে আমাদের বাড়ি আসলে, বাবাজান কখনো সবাইকে নিয়ে একা পাঠালে তাঁর আদর স্নেহ এ বয়সে কম পাইনি। তিনি আমাদের সবার মধ্যে আলাদা – অদ্বিতীয়।

মা'জানের আব্বা বদরুজ্জামান চৌধুরী। তাঁর পিতা: এমদাদ আলী চৌধুরী। মাতা: সিরাজ খাতুন – যাঁর পিতা: হাসমত উল্লাহ্ চৌধুরী, জান আলী চৌধুরী বাড়ি, হাইদচকিয়া, ফটিকছড়ি। বদরুজ্জামান চৌধুরীর একমাত্র বোন – নজবা খাতুন, ফকির মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়িতে যাঁর বিয়ে হয়। বদরুজ্জামান চৌধুরী বিয়ে করেন আজিজা খাতুনকে, পিতা ফজু মিয়া চৌধুরী, দৌলতপুর, ফটিকছড়ি এবং মাতা আশরাফ জাহান। তাঁদের তিন পুত্র পাঁচ কন্যা। মা'জান সবার ছোট।

সর্বজ্যেষ্ঠ বড় বোন জয়নাব আরা বেগম। স্বামী: উকিল আজিজ আহমদ চৌধুরী। গ্রাম: কালীপুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। ২য় জন বড় ছেলে বাদশা মিয়া চৌধুরী। স্ত্রী: সাজেদা বেগম, হাফেজ চৌধুরী বাড়ি, দৌলতপুর, ফটিকছড়ি। ৩য় জন আবদুল মালেক চৌধুরী, স্ত্রী: জহুরা আখতার চৌধুরানী, হাসমত উল্লাহ্ চৌধুরী বাড়ি, আলীনগর, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। ৪র্থ জন জামাল আরা বেগম, স্বামী– বদিউল আলম চৌধুরী, হাপানিয়া চৌধুরী বাড়ি, নারায়নহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ৫ম জন: ফেরদৌস আরা বেগম, স্বামী: ছালেহ আহমদ চৌধুরী, চৌধুরী বাড়ি, হারুয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ৬ষ্ঠ জন ৩য় পুত্র আবু তালেব চৌধুরী, স্ত্রী: জাহানারা বেগম, বিদেশ্বর মুন্‌শি বাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ৭ম জন ৪র্থ কন্যা: লায়লা বেগম, স্বামী: আহমদুল হক মিয়া, বোচা উকিল বাড়ি, কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ৮ম জন: ৫ম কন্যা– মুনাওয়ারা বেগম (মা'জান), স্বামী: শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জনাব বদরুজ্জামান চৌধুরী তিনবার হজ করেছেন। বিশেষ করে ৩য় বার হজে যাওয়ার পূর্বে তিনি সহায় সম্পত্তি, জমিদারী, জমিদারীর কার্যক্রম বড় ছেলের মৃত্যুর কারণে সবকিছু মেজ ছেলের মাধ্যমে কর্মচারীদের বুঝিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। ৩য় বার হজ্জ থেকে আসার পর সংসারজীবন সম্পূর্ণ ত্যাগ করে মসজিদ চৌহদ্দীতে ১২ × ১৬ ফুট আকারের একটি শন-বেড়ার ঘর করে সেখানেই থাকতেন। শুধু বিকেলে একবার চা খেতে ঘরে যেতেন। তিনি গ্রামে একটি বাজার, একটি স্কুল, একটি মাদ্‌রাসা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। শুনেছি দরবার থেকে ফুপুর বিয়ের প্রস্তাব আসার পর তিনি গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ রাখেন, মুনিবকে কী করে বেয়াই ডাকবেন এবং একই বিছানায় বসবেন, খাবেন তা যেন তাঁকে করতে না হয়। যেদিন দরবার থেকে চূড়ান্ত পয়গাম আসে, ঘরে আয়োজন চলছিল সেদিন ভোরেই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চলে যান। তিনি ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বাবা ও ছোট আব্বা চেয়ারম্যান হওয়ার পর তা আমার মাধ্যমে আপাতত ইতি ঘটে। এছাড়াও বলতে হয় তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রথম দুই মাস পাকিস্তানী বাহিনী বর্ডার সীল করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন রাতে একশো থেকে দেড়শো লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে আমাদের দুটা লম্বা ধানের গোলার ধান শেষ হলে স্বাধীনতার পর ধান কিনে খেতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে বার্মা থেকে আগত রোহিঙ্গা পরিবার অসহায় গরিব দুঃখি পরিবার পরিজনকে বাড়ির অনতিদূরে নিজের জায়গায় বাড়ি তৈরি করে থাকতে দিয়েছিলেন যা বংশানুক্রমে চলে আসছে, আর তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থাও চলমান ছিল যা বর্তমানেও অনেকটা বিদ্যমান। তাছাড়াও মসজিদের মোতওয়াল্লীর পারিবারিক ব্যবস্থা, নাপিত-ধোপা-মুচি-মেথরের ব্যবস্থাদি ছিলই। কাছারি ঘরের সামনে লম্বা আর একটি ঘর ছিল যেখানে পরবাসীরা থাকতো। তারা বাড়ির দেওয়া রসদ রান্না করে খেতো, তাছাড়া দূর্বলদের নিজেদের রান্না করা খাবার থেকে দেওয়া হতো।

তিনি ছিলেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী পরিচালিত উরস ব্যবস্থাপনা কমিটির

সাধারণ সম্পাদক। সেই সুবাদে তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশাল ভূ-সম্পত্তি এবং চট্টগ্রামের সর্বত্র একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়েও মাইজভাণ্ডার শরিফে তিনি নিজেকে একজন নগন্য খাদেম পরিচয়ে তুষ্ট থাকতেন।

শাহীন চৌধুরী
পিতাঃ আবদুল মালেক চৌধুরী
গ্রামঃ দাঁতমারা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
উম্মুল আশেকীন এর ভ্রাতুষ্পুত্র

সাধারণ গৃহী পরিবার অথচ সুবিশাল আধ্যাত্মিক সংসারের অধিকর্তা হিসেবে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জাগতিক ও মারেফাতী অবয়বের শব্দচিত্রঃ

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম-এর স্মৃতিসিক্ত জবানী

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।”

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতার এই দুটি চরণের মধ্যে মানব সমাজের বাস্তব কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ধারাবাহিক ইতিহাসের সারমর্ম চমৎকার শব্দের ফ্রেমে সজ্জিত হয়েছে। যে কোন কল্যাণকর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সফল মানুষের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাদের সাফল্যের পশ্চাতে মা হিসেবে হোক, পত্নী হিসেবে হোক, ভগ্নি হিসেবে হোক, নারীর বিপুল বাস্তব অবদান রয়েছে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) সহ একাধিক নবীর সৃজনশীল বিকাশের লক্ষ্যে সুকঠিন রিয়াজত-সাধনায় লেগে থাকা ও টিকে থাকার মতো মনের জোর ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির পশ্চাতে নারীর অমূল্য ভূমিকা অর্থাৎ তার পত্নী হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভূমিকা ইতিহাসবিদিত। বিখ্যাত অলি-আল্লাহ্দের কঠোর সাধনা, অধ্যয়ন ও বিকাশের পশ্চাতে “মা” হিসেবে নারীর ভূমিকা ইতিহাসে বিধৃত আছে। অনেক অলি-আল্লাহ্ নিজেদের ভগ্নি থেকেও পেয়েছেন মূল্যবান নির্দেশনা ও সহযোগিতা, যেমন হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহ.)। প্রত্যেক অলি-আল্লাহ্ যে কঠোর জীবন যাপন করেন, স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট-জর্জরিত জীবন যাপন করেছেন, তা সম্ভব হয়তো হতো না, যদি না তাঁদের পত্নীগণ নিজ নিজ স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে অপরিমেয় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম ও কষ্টসহকারে স্থির না থাকতেন। অলি-আল্লাহ্দের সাধনা-রিয়াজতের সময়কালটা প্রবল ঝঞ্ঝাময়, কখনো বা অগ্নিঝড়ের মতো পরিবারের উপর পতিত হয়। ধৈর্যশীল, নীরবে কষ্ট সহিষ্ণু পত্নীরা এ সময়ে স্বামীদের পাশে থেকে সব সহ্য করে তাঁদের সামনে যাবার পথ পরিষ্কার করে দেন। রাজনৈতিক, সামাজিক পরিসরে এবং বিজ্ঞানী, গবেষকদের বিকাশেও পত্নীদের এমন ধৈর্যশীল সহনশীল ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কঠোর রিয়াজত-সাধনার দুরূহ সময়ে তেমনিভাবে পরম ধৈর্যশীলা, কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী প্রকৃত জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে অনন্য সহযোগিরূপে আমরা দেখতে পাই লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের শ্রদ্ধাভাজন "আম্মাজান", 'উম্মুল আশেকীন' হিসেবে পরিচিতা হযরত মুনাওয়ারা বেগমকে। স্বল্প ও মৃদুভাষী এই সর্বজন শ্রদ্ধেয়া মা-জান যেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, একজন মহান অলি-আল্লাহ্র কঠোর মারেফাত-সাধনার অন্তরঙ্গ সাথী ও সাক্ষী হিসেবে তাঁকে তাঁর সাথে কথা বলার এবং তাঁকে অনুভব করার সুযোগ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। মারেফাত জগতের অভিযাত্রা এক মহান অলি-আল্লাহ্র কল্যাণময়ী জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে তাঁর কাছে গত ৪ সেপ্টেম্বর (২০১০) 'মাসিক আলোকধারা'র পক্ষ থেকে সবিনয়ে কিছু আর্জি পেশ করেছিলাম, শাহানশাহ্ হুজুর সম্পর্কে এমন কিছু তথ্যদান করার জন্য যা মানুষের কল্যাণে আসবে।

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান সম্মত হলেন। আমি তাঁকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করি। দাদুমনি যেন স্নেহ-মমতার অপার ভাণ্ডার, অন্তহীন ঝর্ণাধারা। দীর্ঘদিনের নিবিড় স্মৃতির প্রশাখায় রোমন্থনের মৃদুসমীরণের দোলা লাগতেই ভোরের শিশির বিন্দুর মতো অশ্রু টলটল করে উঠলো আম্মাজানের চোখে, তিনি মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলেন।

'সালেক-জাব সর্ব অবস্থায় বিদ্যমান পরিবেশের সাথে একটা ভারসাম্য বজায় থাকতো'

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে তাঁর জীবদ্দশায় যেমন ছিল, তেমনি তাঁর ওফাতোত্তর কালেও আশেক-ভক্ত-জনগণের মাঝে অফুরন্ত কৌতুহল বিদ্যমান। একজন মহান অধ্যাত্ম সাধক সম্পর্কে কৌতুহল থাকেই। ব্যক্তি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং মারেফাত জগতের অবিশ্রান্ত অভিযাত্রী শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে স্বীয় উপলব্ধি ও অধ্যয়ন প্রসঙ্গে 'আম্মাজান' জানালেন: "তাঁর সামগ্রিক কার্যকলাপের মধ্যে একটা সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ করতো"।

পৃথিবীতে তিনি যে অবস্থানে স্থিত ছিলেন, অর্থাৎ জজব হালের কিম্বা সালেকে মজজুব যে অবস্থায়ই তিনি বিরাজ করতেন না কেন; তাঁর পরিবেশ-প্রতিবেশকে তিনি তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী যা দেবার দরকার, দিয়ে গেছেন। প্রতিদিন এমনকি প্রতি মুহূর্তে নিজের সীমিত গৃহী পরিবার কিম্বা সুবিশাল আধ্যাত্মিক সংসারের প্রতি তিনি স্বীয় কর্তব্য বিচ্যুতিহীনভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। কেউ নিজস্ব পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়নি। তিনি নিজস্ব কার্যকলাপের ধারা মোতাবেক চলতেন। কখনো বা বাজারে গিয়ে প্রচুর বাজার করতেন। কারো ঘরে গিয়ে বাজারগুলো রেখে আবার বের হয়ে যেতেন।

দিনের পর দিন নিজের দেখা অনেক রহস্যপূর্ণ ঘটনা থেকে মাত্র দু'একটা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করে আম্মাজান বলেন, "তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। খাওয়া-পরায় কোন প্রকার বাহুল্য ছিলনা। পরিধানে ছিলনা বিলাস কিম্বা আয়েশের ন্যূনতম ছোঁয়া। অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ আমি লক্ষ্য করিনি। তাঁর কাছে টাকা আসতো প্রচুর। তবে তা দান করে দিতেন। দৌলতপুর নিবাসী ইব্রাহিম মিঞা নামে একজন ভক্ত দরবারে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রতিদিন টাকার বান্ডিল নিতেন। ঐ টাকার বান্ডিল প্রতিদিনই বালিশের নিচে রাখতেন। পরদিন ঐ টাকার বান্ডিল বালিশের নিচে আর পাওয়া যেতনা। আবার ইব্রাহিম মিঞাকে খবর পাঠাতেন টাকা আনার জন্য। এ টাকা কোথা থেকে আসতো, কোথায় যেত, কেউ জানতো না। এভাবে অতিবাহিত হয়েছিল প্রায় একমাস। এভাবে টাকা উধাও হয়ে গেলে আমরা কি একই জায়গায় টাকা রাখবো? রাখবো না। কিন্তু উনি তো রাখতেন...।

"প্রচণ্ড কষ্ট সহিষ্ণু শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) যেন নিজেকেই নিজে পীড়ন করে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মুখোমুখি করে রাখতেন।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দিবারাত্রি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আম্মাজান বললেন, "তাঁর জীবনধারাই ছিল অন্যরকম। কখনো রাতের কিছু অংশ ঘুমাতেন, নীরব থাকতেন। বাকী রাত জেগে থাকতেন। পুরো রাত কখনো ঘুমান নি। যতোদিন বেঁচে ছিলেন, আমিও তাঁর সাথে জেগে থাকতাম। জেগে থাকলে আমাকে ডাকতেন। দু'পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করে দু'চারঘণ্টা পর্যন্ত বসে থাকতেন। সেটা যে কী প্রবল কষ্টকর। অথচ তাঁর কাছে যেন কিছুই না। এ সময় হাতে দিয়াশলাই, সিগারেটও থাকতো। শরীর কিম্বা

কোন অঙ্গ পরিশ্রান্ত বলে মনে হতো না। বহু ভক্ত তাঁকে এ অবস্থায় দীর্ঘকাল দেখেছেন।”

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আত্মপীড়ন ও প্রবল সংযম এবং কষ্ট স্বীকারের কিছু তথ্যের উল্লেখ করে আম্মাজান বললেন, “বিয়ের পর উনি বাড়িতে থাকলেও নব বধূর সাথে না দেখা করেছেন, না কথা বলেছেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ঘরে আনা যায়নি। বিয়ের পর দোকানের লবণের গুদামে ছিলেন আট মাস। কখনো বা বের হতেন, আবার সেই গুদামে ঢুকে যেতেন। বাড়ি আসেন আট মাস পর। তাও ভেতরে কম আসতেন। তিনি সারা জীবন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। অনেক সময় মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে পায়ে হেঁটে শহরে যেতেন। আবার হেঁটেই মাইজভাণ্ডার ফিরতেন। এভাবে একবার পা ফেটে ফুলে গিয়েছিল। রাতের বেলা বের হলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। প্রথম দিকে খুঁজেও পাওয়া যেতনা।

অতীতের স্মৃতিচারণ করে আমাজান বললেন; তখন এই বাসগৃহ এরকম ছিলনা। ছিল ছোট একটা সাধারণ ঘর। বাড়ির চারপাশে ছিল জঙ্গল। পিছনে একটা পুকুর ছিল। রাতে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে থাকতেন। তিনি বসে আছেন তো আছেনই। কোন মশাও তাঁকে কামড়াতো না কোনদিন হাত দিয়ে মশা তাড়াতে দেখিনি। অনেক সময় গায়ে কাপড়ও থাকতো না। খালি গায়ে বসে থাকতেন। আমরা ঘরে বসে থাকলেও তো আমাদেরকে মশা কামড়ায়। শীতকালে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন। শীতের রাতে গোসল করতেন। গরমকালে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতেন। শীতকাল-গরমকাল কোন ভেদাভেদ ছিল না। আমার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লাগে, এই যে খালি পায়ে বসে থাকতেন, মশা কামড়াতোনা! আমরা তো মশার কামড়ে পাগল হয়ে যাবো! আমরা যখন এ বাড়িতে আসি তখন বাড়ির চারপাশে গাছ-গাছালি, বন-বাদাড় ছিল। প্রচুর সাপও ছিল। এমনকি বাসার পা-পোশের নিচেও সাপের বাচ্চা থাকতো।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই কঠোর সাধারণ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নীরব সাক্ষী আম্মাজান হযরত মুনাওয়ারা বেগম কিন্তু ফটিকছড়ি থানার দাঁতমারা ইউনিয়নের স্বনামধন্য জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সিকদার সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা। স্বতন্ত্র সত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রতিষ্ঠাপর্বের দিনগুলো

ছিল অত্যন্ত কঠিন, যেখানে কষ্ট, আয়াস ও সংগ্রামের কঠোরতাই ছিল প্রাধান্য। শাহানশাহ্ হুজুর এই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে ছিলেন দৃশ্যতঃ ও কার্যতঃ অবিচল, স্থির ও নির্লিপ্ত। কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। তুচ্ছ, জাগতিকতার অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থিতি। এমন দুরূহ পরিস্থিতিতে অতি কষ্টের এই জীবনকে নীরবে হাসিমুখে গ্রহণ করেন আম্মাজান। ধৈর্য-কষ্ট স্বীকার, আরাম-বিমুখতাই হলো তাঁর নিত্য সাথী। এভাবে নিজেকে পুনর্গঠন করতে পেরেছেন বলেই স্বামীর মারেফাত পথের অভিযাত্রা হতে পেরেছে গতিময় এবং তিনি আজ 'উম্মুল আশেকীন' বা আশেক-ভক্তদের মাতা হিসেবে বরিতা।

'সংসার ও সন্তানদের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্বপরায়ণত'

এই মহান অধ্যাত্ম সাধক তাঁর কাছে আগত প্রত্যক ছোট ছোট শিশু-কিশোরের প্রতি ছিলেন নিজ সন্তানের মতোই অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও মমত্বপূর্ণ। এটা সকলেরই জানা কথা। নিজের সংসার ও সন্তানদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও আচরণ সম্পর্কে জানতে কৌতূহল প্রকাশ করায় আম্মাজান জানালেন, ছেলে-মেয়েদেরকে কোলে পিঠে নিয়ে খেলাধূলা না করলেও তাদের প্রতি স্নেহ-মমতার কমতি ছিল না। যেদিন ছেলে-মেয়েদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, সেদিনই সম্পূর্ণ মায়া-মমতা ঢেলে দিতেন। অত্যন্ত আদর করতেন। তাদেরকে মা-বাবা ছাড়া কথা বলতেন না। ছেলেকে কখনো "হাসান বাবা" বা "হাসান মিয়া" ছাড়া শুধু "হাসান" বলেন নি। মেয়েদেরকে ডাকতেন "মাধু"; তা ছিল অনেক গভীরের মায়া। স্বাভাবিক অবস্থায় শান্তভাবে যখন কারো সাথে কথা বলতেন, অত্যন্ত নরম ও মিষ্টি স্বরেই কথা বলতেন। তবে জালালিয়াত অবস্থায় অন্যরকম হয়ে যেতেন। সবাই তা জানতো। সবাই ভয় পেতো। ওটাই তাঁর ধারা।

"সাংসারিক বিবেচনায় তিনি আমাকে, ছেলে-মেয়েদেরকে খুবই মর্যাদা দিতেন। আমার বিবেচনায় তিনি সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। যদিও তিনি সংসার করেন নি। সংসারে কখন কার কি দরকার, তার খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমেই তা বুঝাতেন। যেমন ঘরে (অন্দরমহলে) আমরা ছেলে-মেয়েরা থাকা অবস্থায় বাইরের মানুষের প্রবেশ পছন্দ করতেন না। প্রাইভেসী রক্ষার সুক্ষ্ম নিয়মগুলো মানতেন। একবার ঘরের সেফটি ট্যাংক

নির্মাণের সময় বলেছিলেন, আপনাদের ট্যাংকটি আলাদা করে ফেলুন। ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা, হেফাজত, নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। বাইরের মানুষের অন্দরমহলে প্রবেশ বা পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিধান প্রভৃতি ক'জন মানুষই সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে।

"জালালিয়াত অবস্থায় তিনি তাঁর ঘরেই থাকতেন। দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতেন। ইচ্ছা হলে কোনসময় খাওয়া-দাওয়া করতেন, কোনসময় করতেন না। হঠাৎ হঠাৎ মধ্যরাতে ডেকে খাবার (ভাত) খেতে চাইতেন। কখনো খেতেন, কখনো খেতেন না। তাই আমরা জেগে থাকতাম। কখনো সারাদিন উপোস থাকতেন, আবার কখনো একবেলা খেতেন। রাতে যতক্ষণ জেগে থাকতেন, চা খেতে চাইতেন। আবার প্রতি রাতে ভাত খেতেন না। হঠাৎ হঠাৎ চাইতেন। কোন কোন সময় মধ্যরাতে এসে ছেলে-মেয়েদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। খাবার (ভাত) খাওয়াতেন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।"

'পরিবারের কর্তারূপে'

পরিবারের কর্তা হিসেবে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) কেমন দেখেছেন, জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে আম্মাজান বলেন, "তিনি কোন কাজে-কর্মে তেমন কোন নির্দেশ বা আদেশ দিতেন না, তবে নিষেধও করতেন না। একবার বেড়ার ঘরের পাশে নতুন ঘর তৈরীর সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঘর করবো কিনা। তিনি বলে দিলেন "করুন না, করুন, ঘর বাঁধা ভালো। কোন কোন সময় ঘরের কেউ (ছেলে-মেয়েরা) কোথাও যেতে চাইলে বাধা দিতেন (মাঝে মধ্যে)। যেমন আমার মেয়ে জেবু পরীক্ষার জন্য শহরে যাচ্ছিল। উনি যেতে দিলেন না। পরীক্ষাও আর দেওয়া হলো না। দু'তিন মাস পর একজন মানুষ মাইজভাণ্ডার শরিফে এসেছিল তার মেয়ের পরীক্ষায় পাশের সুসংবাদ জানাতে, দেখা করতে। এটা শোনার পর তিনি আমাকে ডাকলেন, (জেবুর মা)! বললেন, আমার জেবু এ বছর পরীক্ষা দেবে, তাই না। আমি জব্দ খেলাম। কি বলব। আমি বললাম, "আপনি যেতে নিষেধ করেছিলেন, তাই যায়নি।" তিনি মনমরা হয়ে বললেন, "ওমা, আমি নিষেধ করেছিলাম, এটা কোন কথা।" তিনি কোন হালতে নিষেধ করেছিলেন, এটা তিনিই জানেন। তবে তিনি যখন কোন ব্যাপারে নিষেধ করেন, ঐ নিষেধ পরবর্তীতে কাজ আবার নিয়মমাফিক চলবে।

যে সময় তিনি বাধা দেন, তখন কোন প্রয়োজনেই হয়তো বাধাটা দেন। বিপদ-আপদ, ভালো-মন্দ, অনেক কিছুই থাকতে পারে। এটা তিনিই ভালো জানতেন। আমি তাঁর প্রকাশ্য নিষেধের সীমা কখনো অতিক্রম করিনি।

"আমি কোন কিছুই তাঁর পরামর্শ ছাড়া করিনি। তিনি আমার দু'মেয়ের বিয়ে দেখে গেছেন। মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে দিতেন। অন্যান্যরা সমালোচনা করলেও আমি তাঁর পরামর্শ নিয়েই করেছি। আমার মেয়েরা সুখে আছে, শান্তিতে আছে।"

'কোরআন শরিফের প্রতি সবিশেষ সম্মান ও অপরাপর কিছু প্রশ্ন'

পবিত্র কোরআন শরিফের প্রতি তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধার প্রসঙ্গ এলো কথায় কথায়। আম্মাজান বললেন, মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত বলতেন, যাতে হয়তো অনেকের অনেক প্রশ্নের জবাব থাকতো। কোরআনের ব্যাখ্যা, হেফজ, তেলাওয়াত একটি বিশেষ পৃথক ব্যাপার। যারা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী ও রহমতে পরিপূর্ণ, তাঁরা সরাসরি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পান। তাঁরা সাধারণের নিয়মের বাইরে। পুস্তক আকারে কোরআনকে কখনো তিনি অবহেলা করেন নি। একবার কে যেন একটি ছেঁড়া কোরআন শরিফ পিছনের বারান্দায় রেখেছিল, হয়তো আনতে মনে ছিল না। তিনি তা দেখার পর আমাকে ডেকে বললেন, "কোরআন শরিফটা নিয়ে যত্ন করে রেখে দিন"।

"কায়িক পরিশ্রমী লোকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিলনা। তাদের সপক্ষে তাঁর বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেয়াতের প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করতেন।"

"স্মৃতির বেদনা, বেদনার স্মৃতি"

শাহানশাহ্ হুজুরের কোন কোন আচরণ, ব্যাপার তাঁকে আকর্ষণ করতো জানতে চাইলে আম্মাজান বলেন, "তিনি একেক সময় একেক রকম থাকতেন। তাঁর রাগ-ঠাণ্ডা সবকিছুই আমাকে আকর্ষণ করতো। তবে আমি তাঁকে খুব ভয় পেতাম। আর এ জন্যই আমার উপর বেশী রাগ করতেন।

“আমার ছেলে মেয়েরা তো বলতে গেলেই তাঁর কিছুই দেখলো না। তাদের বুদ্ধি হবার আগেই তিনি চলে গেলেন।”

“তিনি ওফাত পাবার আগে স্বপ্নে দেখেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নের অর্থ বুঝিনি। এরকম কিছু হবে তা চিন্তা করিনি। তাঁকে স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি কিছু বলেননি। তাঁদের তো সব কিছু জানা হয়ে যায়। আমার হাসান মিয়া তখন সবেমাত্র এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন ...। আমার নিজেকে বরং অপরাধী মনে হয়। কি করলাম, কি করতে পারলাম। এতো তাড়াতাড়ি তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন ভাবিনি। তাঁর স্মৃতি মনে পড়লেই ...।

গ্রন্থনা ও অনুলিখন: হাসনে আয়মুন
এম.এ (অর্থনীতি), এম. ফিল, পিএইচডি গবেষক
প্রকাশকাল: আলোকধারা, অক্টোবর, ২০১০ ইং

'আম্মাজান'

[উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহা)-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনীত সালামী]

১. আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে : "নবী মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতৃস্বরূপ (৩৩:৬)। "হে নবী পত্নীগণ! আপনারা অন্য নারীদের মতো নন। আপনারা স্বগৃহে অবস্থান করুন এবং পূর্বতন জাহেলী প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেন না; সালাত কায়েম করুন, যাকাত প্রদান করুন, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করুন; হে নবীর গৃহবাসিনীগণ! আল্লাহ্ তো কেবল আপনাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে পবিত্র রাখতে চান (৩৩:৩৩)।

পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের একমাত্র জাগতিক ভিত্তি 'উম্মু' অর্থাৎ 'মা'। আল্লাহ্র বেমিসাল কালিমা (নিদর্শন) হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আল্লাহ্র ইচ্ছা ও হুকুমে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও মাতৃগর্ভের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা দৃশ্যমান। অতএব, 'উম্মুন্' বা মা মানব অস্তিত্বের শস্যক্ষেত্র (হারছুন) এবং একমাত্র অবলম্বন। তাই কুরআন ও নবীজীর (দ.) সুন্নাহ্ নারী জাতির সুরক্ষা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল। নবীজীর (দ.) বিশ্লেষণে নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি। এই বিশ্লেষণের পাশাপাশি মানব অধ্যয়নজাত বিজ্ঞানের বিবরণের কথাও ধরা যাক। সূরা নিসা-র প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে: "হে, মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে অভিন্ন নফ্স বা প্রাণসত্তা (নফ্সে ওয়াহেদাত্) থেকে সৃষ্টি করেছেন।" 'নফ্সে ওয়াহেদাত' শব্দদুটোর মধ্যেই কেবল পুরুষের নয়, নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্যের তথ্য গচ্ছিত আছে।

আল-কুরআনের সর্বত্র 'নফ্স'-এর পরপর ব্যবহৃত শব্দটা 'ওয়াহেদাত'। 'ওয়াহেদাত'–শব্দটার রূপ স্ত্রী লিঙ্গ। তফসীরে তাবারীতে এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক আলোচনা পরিবেশিত আছে। অতএব, সৃজনশীলতার সাথে আল্লাহ্ নারীত্বকে অবিচ্ছেদ্য অপরিহার্যতার বিষয় হিসেবে মোহর মেরে দিয়েছেন। পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীর একাধিক মরমী গবেষক সাধক আল-কুরআনের বয়ানের অনুসরণে Materia prima বা cosmic substance হিসেবে চিহ্নিত

করেছেন। নারীর উপর অর্পিত প্রাকৃতিক দায়িত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করলে আল-কুরআনের নির্দেশিত এই নিখাদ বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে উঠে।

নবী পত্নীগণকে আল-কুরআনে মুমিনদের মাতৃস্বরূপরূপী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার সূত্র (proposition) ধরে নবীজী (দ.) পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক জাগতিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে গেছেন এবং তাহলো : "আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে; তারা তোমাদের মাতা, কন্যা ও মাতৃস্বরূপা... নারীর অধিকারগুলো পবিত্র। লক্ষ্য রাখো, নারীগণ যেন তাদেরকে প্রদত্ত অধিকারগুলোতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন" (আল-হাদিস)।

২. 'আম্মাজান' শীর্ষক এই নিবন্ধের অবতরনিকায় প্রথমে আল-কুরআন, হাদিস এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আলোকে নারী জাতির পৃথক ও অথচ অতি মৌলিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সুস্পষ্ট করার চেষ্টা, নারী পুরুষের কর্তব্য-অধিকার-দায়িত্বের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে, লক্ষ্যণীয় যে, সেখানেই নারী ও পুরুষের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করেই বয়ান বর্ণিত হয়েছে। এটা আল্লাহ্‌র এই দুই সৃষ্টির একাধিক মৌলিক পার্থক্য, মর্যাদা ও অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিতবহ। নবীজীর (দ.) ইসলাম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার পর মহান খোলাফায়ে রাশেদা এবং এরপর মাত্র তিন শতাব্দী কাল ধরে মুসলিম মনীষীরা এসব বিষয়সহ কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রের স্থানিক, কালিক ও পরিবেশগত প্রায়োগিক বিষয়টি নিয়ে ফলপ্রসূ উপযোগী গবেষণা করলেও দীর্ঘ বহু শতাব্দী এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার সাক্ষাৎ পায়নি। বিংশ শতাব্দী থেকে মুসলিম জাতি এবং অন্যান্য জাতির বিজ্ঞ গবেষকরা এসব বিষয়ে হাত দিয়েছেন।

সূরা আহযাবের ৬নং আয়াতে নবী পত্নীদেরকে মুমিনদের মাতৃস্বরূপ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করার সূত্র ধরে আমাদের মহান বিজ্ঞ পূর্বসূরীরা নবীর ওয়ারেছদের অর্থাৎ পীর-বুজুর্গ-ওলী আল্লাহ্‌দের পত্নীদের ক্ষেত্রেও 'মাতৃ পদবী' আরোপের সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে প্রবর্তন করেছেন। অবশ্যই অন্যান্য ধর্মের সিদ্ধপুরুষগণের পত্নীগণ, এমন কি সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের পত্নীগণও 'মাতৃস্বরূপে' অভিহিতা, সম্মানিতা ও মান্যতা পদে অভিষিক্তা হয়ে আসছেন। অতএব, ধর্মীয় ও লোক-সামাজিক উভয় আলোকে হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) আমাদের 'আম্মাজান' হিসেবে সঙ্গতভাবেই

অধিষ্ঠিতা। তিনি সমগ্র মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সকল ওলী-আল্লাহ্‌র দরবার তো বটেই, সকল আওয়াম জনতারও মাতৃ স্থানে অধিষ্ঠিতা বাস্তবভাবেই।

৩. আম্মাজান হযরত মুনাওয়ারা বেগমসহ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সকল অন্দর-মহলের মহিলারা বিশেষ করে বাংলা মুল্লুকে গড়ে উঠা ঘরোয়া সংস্কৃতির অনুসরণে পর্দানশীন। পর্দানশীনতার সংজ্ঞা ও প্রকরণ স্থান-কাল বিশেষে কিঞ্চিৎ ভিন্নতর হলেও বাংলার মুসলিম সংস্কৃতিতে এর ব্যাকরণ একটু আলাদা। গাউসিয়া হক মন্‌জিল সমেত মাইজভাণ্ডার দরবারী ভূবনে পর্দানশীলতা এবং আব্রুশালীনতার এই ঐতিহ্যবাহী রেওয়াজে কোন প্রকার শৈথিল্য নেই। সূরা আহযাবের ৫৫নং আয়াতে বর্ণিত 'গাইড লাইন আম্মাজানের' জানাযা ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ততাসহকারে অনুসৃত হয়েছে।

আমি 'আম্মাজানকে' কখনো দেখিনি। তবে তাঁর স্নেহ শীতল অদৃশ্য বাতাস অনুভব করেছি আরো লক্ষ মানুষের মতো। অনুভব করেছি তাঁর প্রখর অন্তদৃষ্টিজাত মমতা পরায়ণতা। কাছের-দূরের সবার প্রতি প্রবাহিত ছিল তাঁর মমতার সুবাতাস। গাউসিয়া হক মন্‌জিলে প্রতি দিবা-রাত আগত অগণিত আশেক-ভক্ত-জায়েরীনদের যথাযথ আপ্যায়ন, আতিথেয়তা, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কেউ যাতে কোন প্রকারে নিজেকে অবহেলিত মনে না করে, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রতি ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। কোন মহিলা দর্শনার্থী–ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে তাঁর দর্শন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হননি। আমার নিজ গ্রাম এনায়েতপুরের একাধিক দরিদ্র, শিক্ষা বঞ্চিতা মহিলা তার পবিত্র দর্শনে ধন্য হয়ে আমার কাছে আনন্দ-ভক্তিতে আপ্লুত বর্ণনা দিয়েছেন। কেউ বিমুখ হননি। কেউ নিজেকে অপাঙক্তেয় মনে করেন নি।

আমার নিজ পরিবারের সদস্যারা বহুবার তাঁর সান্নিধ্য, স্নেহ, মমতা, দোয়া, দয়া লাভে ধন্য হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বহু মহিলা তাঁর দর্শন পেয়েছেন। তাঁদের মুখে 'আম্মাজানের সান্নিধ্যে' কাটানো সময়ের ও স্নেহময়ী আচরণের যে বিবরণ আমি জেনেছি, তাতে তাঁর সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত ধারণা শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মুসলিম মহিলা ভুবনে মারেফাত তাসাউফ স্তরে বিচরণকারীনিদের জ্ঞাত সংখ্যাও কম নয়। তাদের অবস্থান ও ক্রিয়া সমস্তরের পুরুষদের চেয়ে কম নয়। নবী পরিবারের মহিলা সদস্যাদের অবস্থানকে অনন্যসাধারণ অনুচ্ছেদে স্থাপন করে পরবর্তী জেনারেশনের দিকে তাকালে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর মহতী আম্মাজান, হযরত মনসুর হাল্লাজের জ্যেষ্ঠা ভাগনী, হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবীর (রহ.) তাসাওউফ দীক্ষাদাত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে আল-ওয়ালীয়াহ্ (রহ.) প্রমুখের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই স্ব মহিমায় ভাস্বর। পর্দান্তরালে নিজ কক্ষকে 'এবাদত গৃহে' পরিণত করে কতো মুসলিম মহিলা যে আত্মিক উন্নতি বা উচ্চতর সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক পবিত্রা, মর্যাদাসম্পন্ন মহিলার, দর্শনীয়ভাবে কিম্বা অদর্শনীয়ভাবে নৈকট্য অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁদের মহতী চরিত্র, জীবন ও কর্মে উন্নত সাহিত্যের অগুনতি উপাদান মওজুদ আছে। আমাদের 'আম্মাজান' হযরত মুনাওয়ারা বেগমের (রহ.) পদচারণা মারেফাত ভূবনেও ছিল, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আমার আছে, তবে এসব বিষয় তত্ত্বগত ও নীতিগতভাবেই ব্যক্তযোগ্য নয়।

৪. তবে এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে 'আম্মাজানের' আগমন ছিল তাঁর মহান শ্বশুর অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক অনানুষ্ঠনিকভাবে পূর্বানুমোদিত ও প্রত্যাশিত, যার ধর্মীয় আচারণগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সাথে পবিত্র শাদীয়ে মোবারকের সূত্রে **১৯৫৫** সনের ২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার। আম্মাজানের পিতা ফটিকছড়ি থানার দাঁতমারা ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সিকদার ছিলেন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মুরীদ। "বিয়ের এক বছর পূর্বে সিকদার সাহেব একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, তাঁর একটা মেয়ে দরবার শরিফ বিয়ে দিলে হাশরের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) তাঁর মুক্তির সোপারেশ করবেন। ঐ চিঠি তখনই দরবারে পাঠানো হয়েছিল।" বিয়ের প্রাকপর্বে কথা-বার্তা চলাকালে

প্রথানুযায়ী কাবিননামা ও অলংকার সাজপাত্রের প্রসঙ্গ এলে পিতা বলেন, "মুনিবের দরবারে আমার মেয়েটা কবুল হলে অধীন চিরকৃতার্থ হই। আমার সেবা যেন চিরদিন অটুট থাকে। ভক্তের কিসের দাবি দাওয়া" (জামাল আহমদ সিকদার প্রণীত শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)", 'চরণ সেবায় উৎসর্গ'–অধ্যায়। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) মহান গৃহিনী হিসেবে বদরুজ্জামান সিকদারের কনিষ্ঠা কন্যা মুনাওয়ারা বেগমের আগমন নেহাত আটপৌরে বিবাহ মাত্র ছিলনা। এতে রুহানী ও মারফতি সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়াই ছিল মুখ্য। সুতরাং, 'আম্মাজানের' রুহানী উরুজ অতি সহজেই কার্যকারণ সূত্র বলে অনুধাবনযোগ্য। 'আম্মাজান' তাঁর পূর্ববর্তী বহু মুসলিম আধ্যাত্ম মহিলা ব্যক্তিত্বের মাহফিলে সমাসীনা।

আম্মাজান হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর অন্তর্জাত ঐশ্বর্য সাধারণ্যে দর্শনাতীত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনের তথ্যাদি হাজার হাজার উম্মি মহিলার অজ্ঞাত নয়। লোক মুখে এসব বিবরণ অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে বিস্তার পেয়েছে। একজন মহতী মানবী হিসেবে তাঁর এই পরিচয় কাগজে-কলমে বিধৃত থাকার যোগ্যতা রাখে। মানুষের ব্যবহারিক জীবন তার অন্তর্জাত জীবন প্রবাহের প্রতিবিম্ব। যেসব মহিলা 'আম্মাজানকে' স্বচক্ষে দেখার ও সান্নিধ্যে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের সহজ-সরল জবানীর ক্যানভাসে তিনি যথার্থভাবে অঙ্কিত আছেন। বিভিন্ন সময়ে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আমার সিনিয়র হযরত সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ (রহ.), লেখক-গবেষক জামাল আহমদ সিকদার সমেত অন্যান্যদের সাথে কথা-বার্তায় আম্মাজানের ব্যবহারিক (practical) জীবনের যে ধারণাচিত্র লাভের সুযোগ হয়েছে নিবন্ধের উপসংহারে সেসব চিত্রের পুনরাবৃত্তি করছি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল' শিরোনামের যে প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মাইজভাণ্ডার এবং বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে বিশাল বিশাল সেবা, চিকিৎসা, জনকল্যাণ ও শিক্ষামূলক কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে, তার প্রথম বীজটা বপন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধেয়া 'আম্মাজান' মহিয়সী মহিলা মুনাওয়ারা বেগম, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিনী এবং শাহ্জাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম.জি.আ.) আম্মাজান।

সমকালে ফটিকছড়ি থানা তথা চট্টগ্রাম জিলার অন্যতম মর্যাদাশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা তিনি। আবাল্য সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে লালিতা। ১৯৫৫ সনের ২৮ জানুয়ারি তাঁদের শাদীয়ে মোবারক সম্পন্ন হয়। নববধূ সহকারে বাড়ি ফিরে বর গিয়ে ঢুকেন রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর দিকে তৎকালীন স্যাঁতসেঁতে লবণ গুদামে। তিনি তখন নিরত প্রচণ্ড রিয়াজতে। সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয় এক দুঃসহ জীবনের চৌহদ্দিতে পা রাখলেন সংসার-অনভিজ্ঞা নববধূ। কিন্তু তাজ্জুবের ব্যাপার! সংযম ও ধৈর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন দরবার শরিফ মহল্লা থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের আশেক-ভক্তসহ সবার কাছে। সবার অলক্ষ্যেই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে ওঠেন সকলের। একজন মহান অধ্যাত্ম সাধকের ঘরণী হবার কঠোরতা, ঝক্কি সইবার মতো ধৈর্য, মনোবল, সহিষ্ণুতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদর্শিতার তালিম নেবার পাঠ শুরু হলো জীবনের পাঠশালায়। আল্লাহু সুব্হানুতায়ালা স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই দু'ভাবে কঠিন রিয়াজতে লাগিয়ে দিলেন যেন। মন্জিলের বহির্জগতে 'শাহানশাহ্ বাবাজান'। অন্তর্জগতে 'আম্মাজান'।

জাহেরী-বাতেনী উভয় সড়কে দীপ্তিমান পথিক, মহান পুরুষ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সুবিন্যস্ত হিসাব অনুযায়ী ১৩৮০ বঙ্গাব্দের (১৯৭৩ইং) ৩০ আষাঢ় শাহানশাহ্ হুজুরকে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য 'বাগান বাড়ি তথা হাসান বাগে' পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের সাংসারিক প্রতিকূলতা জয় করার জন্য সংগ্রামের ভার যেন তাঁদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়! শাহানশাহ্ হুজুর 'মগ্লুবুল হাল' মানব। ঘরের দিক সামলানোর দায়িত্ব পড়ে আম্মাজানের উপর। অর্থ-কড়ি সংসার জীবনের গাড়ীর চাকা। সে অর্থ কোথায়? আম্মাজান নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির হিস্যা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রথমে ছোট একটা পাকা ঘর নির্মাণ করেন এবং দুই মেয়ে ও একমাত্র শিশুপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে স্বাভাবিক আবাসের অনুপযোগী সেই ঘরে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে 'গাউসিয়া হক মন্জিলের' কঠিন যাত্রা শুরু হয় আম্মাজানের ধৈর্যধর স্নেহশীতল আঁচল তলে, একান্ত নিজস্ব সম্বল ও সামর্থের ওপর ভর করে।

এই বিস্ময়কর তথ্যাদি 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)' গ্রন্থে সংক্ষেপে পরিবেশন করেছেন এই মন্জিলের সাথে পূর্বাপর সম্পৃক্ত ফানা-ফিশ্-শায়খ মুরীদ লেখক জামাল আহমদ সিকদার : "দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়া

বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী নিজেকে মনে-প্রাণে স্বামী সেবায় নিয়োজিত করেন। বেদনার্ত মুহূর্তগুলো স্নেহময়ী শাশুড়ি গভীর মমতায় ভুলিয়ে দিতেন। শ্বশুরের কাছ থেকেও পেয়েছেন অত্যধিক স্নেহ। স্বামী জজব হালে...। আবার শান্ত অবস্থায় সুমধুর ব্যবহার।... কষ্টকর কোন কাজ করতে এবং রান্না ঘরে যেতে নিষেধ করতেন।... কখনো চা চাইলেন তো সারারাত চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিকে খেয়ালই নেই। চোখে-ঘুম নামলে কতো অসতর্ক মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন। স্বামীর খেয়াল হলে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একদা তাঁকে মূল ভবনে থাকতে নিষেধ করে পেছনের স্যাঁতসেঁতে নড়বড়ে বেড়ার ঘরে থাকতে বলেন। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা বলে সেবিকা মেয়েরাও সে ঘরে থাকে না। তবুও স্বামীর নির্দেশ পালন করেন। দু' বছর পর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকা পেলে অনুমতি নিয়ে সেখানেই একটি পাকা ঘর নির্মাণ করেন। মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সে ভবনে থাকেন। শত দুঃখ-কষ্ট এভাবেই আশীর্বাদে পরিণত হয়। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে এমনি অসংখ্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছে।"

গাউসিয়া হক মন্‌জিলে ভেতর-বাইরের সব রান্না হয় এক ডেকচিতে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত-সন্তান মন্‌জিলে যে খাবার গ্রহণ করেন, এই লক্ষ ভক্ত সন্তানদের 'আম্মাজানও' খান সে খাবার। কোন ফারাক নেই। এই হচ্ছে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের জীবনের সামান্য স্কেচ।

আম্মাজান এই পৃথিবী ছেড়ে মহান রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে চলে গেছেন ০৬-অক্টোবর ২০২১ ইং। এই করোনাকালীন সময়েও তাঁর জানাযায় শরিক হয়েছিলেন অগণিত শোকাতুর মানুষ। আল্লাহ্ তাঁর রুহের মাগফেরাত দিন এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পাশাপাশি তাঁকেও আমাদের নাজাত ও কল্যাণের উসিলা করুন। আমিন!

মোঃ মাহবুব উল আলম
বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক
সহ-সম্পাদক দৈনিক আজাদী
প্রাক্তন সম্পাদক – মাসিক আলেকধারা

“শ্রদ্ধাভাজনেষু আম্মাজানের স্মরণে কিছু স্মৃতিকথা যা মন থেকে কখনোও মোছা যাবে না।”

প্রথমে আন্তরিক শত কোটি সালাম ও কদমবুচি জানাচ্ছি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত সাহেব কেবলা কাবা (র.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (র.), হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (র.), আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ বিশ্ব অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (র.) এবং পরম সম্মানিত রাহবারে আলম (ম.) তথা মওলা হুজুরের প্রতি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ অধ্যাত্ম মহাপুরুষদের পদস্পর্শে গড়ে উঠা এই উপমহাদেশের একটি অধ্যাত্ম মিলনকেন্দ্র। এটি যেন আধ্যাত্মিক জগতের এক মহাসাগর। এ সাগরে আমাদের পরিবারে প্রথম ডুব দিয়েছিলেন আমার বাবা জনাব মরহুম সিরাজুল হক মুন্‌সি (বাড়ি- এয়াছিনগর, রাউজান) যিনি পরলোকগমন করেন ১৯৬৫ সালে। তারপর আমার চাচা হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা নজির আহাম্মদ সাহেব (র.), তাঁরা দুইজন হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (র.) বায়াত। আর আমার মা বায়াত হয়েছিলেন হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (র.)-এর নিকট।

আমাদের পরিবারে জায়গা জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার নানা সমস্যা ছিল। মা একা সংসারের নানা ঝামেলায় অস্থির হয়ে সময়ে-অসময়ে তাঁর পীরের স্মরণাপন্ন হতেন। সেই ছোটবেলা থেকে (১৯৬৮—৬৯) মায়ের সাথে আমাদের দরবারে আসা-যাওয়া শুরু। মা বেশিরভাগ সময় তাঁর পীর সাহেবের ভিতরের বাড়িতেই সময় কাটাতেন। সেই সময় আমার বাবাজান বেচাল অবস্থায় ছিলেন। বড় আম্মাজানকে আমাদের তখন থেকেই অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। মা'জান তখন থেকে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। স্নেহ-মায়া-মমতায় ভরা। আমাদের পারিবারিক সমস্যার কথা জানতেন, তাই মাকে সবসময় সান্তনা দিতেন। মা'জান তখন থেকেই আমাদের অত্যন্ত আপনজন। মা'জানের তিরোধানে আমাদের হৃদয়ের গহীনে যে হাহাকার তা কখনো মুছা যাবেনা।

মা'জান ছিলেন হক মন্‌জিলের ভক্ত আশেকানদের জন্য বিশাল এক বটবৃক্ষ। যার ছত্রছায়ায় ও তাঁর মায়াবী কণ্ঠস্বরের স্নেহের পরশে আশেকানদের হৃদয়

শীতল হয়ে যেত। তাঁর সাক্ষাৎ যেন স্বয়ং বাবাজানের সাক্ষাৎ ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে হক মন্‌জিলের অন্তপুর যেন শূন্য মরুদ্যান।

বিগত ৬/৭ বছর পূর্বে আমি একদিন তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার জন্য বাবাজানের জিয়ারত শেষে ভিতরের বাড়িতে আম্মাজান ছিলেন জেনেও দেখা না করে শহরে চলে আসি। ভেবেছিলাম পরের বার দরবারে গেলে মা'জানের সাথে দেখা করব। কিন্তু না ঐ দিন রাতে স্বপ্নে বাবাজান নির্দেশ দিলেন, মা'জানের সাথে দেখা না করাটা ঠিক হয়নি। "দ্রুত যেন মা'জানকে কদমবুচি করে আসি"। আম্মাজান আমাদের কাছে এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব যার সাথে ছলনা প্রতারণা করা যায় না।

আমাদের সাথে মা'জানের যখন দেখা হতো শত ব্যস্ততা হাজারো আশেকানের ভিড়েও তিনি আমার মায়ের কুশলাদি জানার চেষ্টা করতেন। (বিগত ১৬/১৭ বছর ধরে আমার মা অসুস্থ হওয়ায় দরবারে যেতে পারেন না।)

আম্মাজান মহিলা আশেকানদের যেন জীবনীশক্তির উৎস। তাঁকে হারিয়ে আমরা আজ যেন অসহায়। সুখ-দুঃখের কথা বলার আর আশ্রয় আমাদের নেই। আজ আমরা ভক্ত আশেকানরা মা-হারা, দিশাহারা। মা'জানের অভাবখানা পূরণ হবার নয়। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কায়মনে প্রার্থনা করি আমাদের মা'জানকে আল্লাহ্ জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মকামে দাখিল করুন। তাঁর পরকালীন অনন্ত জীবনের শান্তি কামনা করে আমার স্মৃতিচারণ এইখানে শেষ করছি। আমীন।

আনোয়ারা বেগম
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গহিরা কলেজ, চট্টগ্রাম

মানবতার সেবায়
শ্রদ্ধাষ্পদ আম্মাজান

আম্মাজান মুনাওয়ারা বেগম ফটিকছড়ি দাঁতমারা ইউনিয়নের প্রখ্যাত জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সিকদার সাহেবের কন্যা। হজ করে আসার পর তাঁর বাবা সিকদার সাহেব মসজিদের পাশে একটি পর্ণকুঠিরে অবস্থান করতেন। সেখানে এবাদত বন্দেগীতে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। তিনি শুধু দৈনিক একবেলা আহার করতেন। উল্লেখ্য, জনাব বদরুজ্জামান অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) মাইজভাণ্ডারীর মুরিদ ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা দরবারে এসে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম উপাধি লাভ করেন। মহান অলি-আল্লাহ্‌র সহধর্মিনী হয়ে জীবনে তিনি বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। জমিদারের মেয়ে হয়েও তাঁর কোন প্রকার অহংকার ছিল না। তিনি যেমন উদার-হৃদয় মানবসেবী ছিলেন তেমনি ছিলেন সাদামাটা সহজ-সরল স্বভাবের। শাহানশাহের নির্দেশ পালনে শীতকালে পর্যন্ত মা'জান ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে শনের ছাউনি নড়বড়ে বেড়ার ঘরে থেকেছেন। শাহানশাহ্ বাবাজানের পূত পবিত্র পরশধন্য মা'জান মুনাওয়ারা মন্‌জিলে আগত হাজার হাজার লক্ষ কোটি মানুষের জন্য সর্বাবস্থায় মমতাময়ী মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। দরবারে আগত নারী-পুরুষ সবার জন্য আপ্যায়ন থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানের জীবনী লেখক জামাল আহমদ সিকদার সাহেবের ভাষায়: শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.) মাইজভাণ্ডারীর "ওফাতের পর ভক্তদের মধ্যে ঐক্য রক্ষায়, বিপুল ব্যয়ে রওজা শরিফ নির্মাণ, মন্‌জিলের প্রচার প্রসার ও উন্নয়নে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও প্রায়োগিক কৌশল এক অনন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সাংগঠনিক গুণ ও অনুপম চরিত্রে তিনি দরবারী মহলে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত"। তাই পরবর্তীতে তিনি সকল মানুষের শ্রদ্ধাষ্পদ মা'জান হিসেবে খ্যাত হন।

রচনা, কবিতা ও মাইজভাণ্ডারী সংগীত প্রতিযোগিতা

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পূর্বদিকে তখন মাঠ ছিল। সেখানে মহান ১০ই পৌষ খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে একদা (সকাল ১০টা থেকে) আলোচনা সভা ও মাইজভাণ্ডারী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমি অংশগ্রহণ করে রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম ও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। রচনার শিরোনাম ছিল 'মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও মানব ধর্ম'। আমার কবিতার শিরোনাম ছিল 'মাইজভাণ্ডারী বাউল'। উল্লেখ্য, রচনা প্রতিযোগিতায় আরও একজন মাদ্‌রাসার ছাত্র প্রথম হয়েছিল। অর্থাৎ দুইজনই প্রথম স্থান অধিকারী। হক মন্‌জিলের তৎকালীন সভাপতি হযরত সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের (র.) সুন্দর হস্তাক্ষরের সাইন সম্বলিত সনদপত্র, প্রাইজবন্ড এবং শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী-গ্রন্থ (ঐ সময় তা সদ্য প্রকাশিত হয়) ১ম সংস্করণ পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়েছিলাম। শাহানশাহ্ বাবাজান হুজরা শরিফে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ছিলেন। তখন কারো সাথে কথা বলছেন না, অর্থাৎ জানালা দিয়ে মানুষ যে আর্জি নিবেদন করছে সে সবের কোন প্রকার জবাব দিচ্ছেন না। হাদিয়া, মানত পূরণের টাকাও জানালা দিয়ে মানুষ দিয়ে গেছে এবং কোন সাড়া না পেয়ে অনেকে চলে গেছে। [তখন শাহানশাহ্ বাবাজান আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন] আমিও খুশিমনে প্রাইজবন্ডের প্যাকেট দুটা দিয়েছিলাম। পরে এগুলো মা'জান আমাকে ফেরত দেন। সম্ভবত সবকিছু তুলে লাই (বাঁশের টুকরি) ভরে অন্দর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, যখন বাবাজানের ঘর পরিষ্কার করা হয়। শাহানশাহ্ বাবাজান টাকা বা অন্য কিছুর প্রতি ফিরেও তাকাতেন না। তবে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে, মানুষের একান্ত আগ্রহে, অনুরোধে, আর্জি-ফরিয়াদে কোন উপহার গ্রহণ করলেও তা আবার অন্যদের দিয়ে দিতেন। এমনটিও দেখা গেছে বিদেশ থেকে কেউ ঘড়ি আনলো, সামনা-সামনি কথা বলে বাবাজানের কাছে ভক্তি সহকারে নিবেদন করেছেন। তা হয়তো কিছুদিন নিজের কাছে রেখেছেন।

মা'জান দরবারের ভিতর বাড়িতে থেকে সারাজীবন মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন

শাহানশাহ্ বাবাজানকে বড় হওয়ার পর থেকে কখনো পা ছুঁয়ে সালাম করতে পারিনি। দূর থেকে সালাম জানিয়েছি। একবার গাউসিয়া হক মন্‌জিলের বাইরের ঘরে তিনি মাদুরার উপর পা গুটিয়ে বসেছিলেন। ঘরটি ছিল বাঁশের বেড়ার তৈরি এবং উপরে (সম্ভবত) শনের ছাউনি ছিল। তাঁর মুখোমুখি দক্ষিণের দরোজা দিয়ে আকাশ দেখা যায় এবং তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সে সময় খুব শান্ত ছিলেন, (ভিতরে গিয়ে) আমাদেরকে চা-পানের কথা বললেন। এর আগে আমার ঠিকমতো চা-নাস্তা খাওয়ার অভ্যাস ছিলো না। মা'জানের অনুমতিতে একজন গৃহকর্মী শরবত, নাস্তা এবং সেমাই দিলে তা খেয়ে চলে আসার সময় চা-এর কথা জিজ্ঞেস করলেন বাবাজান এবং আবার পাঠালেন চা-পানে? এবারও চা চাইতে পারছিনা লজ্জায়, মুখ ফুটে বলতে পারছিনা, বসে আছি চুপচাপ। মা'জান গৃহকর্মী নিয়ে ভাতের টাইমে ৩/৪ পদের সুস্বাদু রান্নাসহ আমি ও আমার বোনের জন্য ভাত পরিবেশন করলেন। কিন্তু ফিরে আসার সময় শাহানশাহ্ বাবাজন আবারো চা-এর কথা জিজ্ঞেস করাতে ১ম বার, ২য় বার কী কী খেয়েছি বললাম। তিনি পুনরায় বললেন, চা-পান করে আসতে। এভাবে তিনবার শুধু চা-এর জন্য পাঠালে তৃতীয়বারে লজ্জা সংকোচ ফেলে সাহস করে চা-পানের জন্য বাবাজান পাঠিয়েছেন, তা বললাম। তখন মা'জান বললেন: হ্যাঁ, এখানেই আছে দু' কাপ চা। এগুলোর কথা বলেছেন। মা'জান ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা দিয়েছেন। অবাক লাগছে, তিনবার আমাদের মেহমানদারি করেছেন একই সময়ে কিন্তু মা'জান কোন ধরনের বিরক্তবোধ করেননি। মা'জানকে আমি সবসময় শান্ত দেখেছি। সেই সময় আমি নানা এবং নানী ডেকেছি। বাবাজান, মা'জান ডাকতে জানতাম না। পরে একটি স্মরণীয় উক্তি দেখেছি: "অলি-আওলিয়া মানুষের রূহানি পিতা, তাঁদের বাবাজান ডাকা উচিত"। হযরত সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার (র.) শাহ্ সাহেব বাবাজান-মা'জান ডাকতেন। প্রথম তাঁর মুখ থেকে শুনে শিখেছি এবং শব্দগুলোর মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছি।

যখনই দরবারে যেতাম, কোন সময় না খেয়ে আসতে হয়নি। সবসময় মা'জান খাবার খেয়েছি কিনা খোঁজ নিতেন, আপ্যায়ন করতেন। আরেকবার দেখা করতে গেলে, সাথে সাথে মা'জান আমাদের খাবার টেবিলে বসিয়ে দিতেন।

কারণ ঐ সময় দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর নিজের জন্য খাবারগুলো টেবিলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মা'জান সেই বেলা কোন খাবার গ্রহণ করতেন না। পরম তৃপ্তিতে আমাদের খাইয়ে শান্তি পেতেন। চিকন চালের সাদা ভাত, শিং মাছ, ডাল, টাটকা তাজা শাক-সবজির রান্না, ফল টেবিলে দেয়া হয়েছিল। আমরা খেতে বসলে মুরগি, বড় মাছও এনে দিলেন মনে হয়! এগুলো অনেক আগের স্মৃতি। তবে আমার কাছে এটি স্পষ্ট যে, পৃথিবীর সেরা আপ্যায়ন দরবারেই পেয়েছি। অন্যান্য সময়ও (আমার অল্প বয়সে) সেরা খাবার দরবার থেকে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। মিষ্টি, সন্দেশ, কোর্মা পোলাও, নানান পদের বিরিয়ানি, এমন কি ডিম-সব্‌জি বিরিয়ানিও খাওয়া হয়েছে দরবারে। এই মহাত্মা নারীর (মা'জানের) তত্ত্বাবধানে দরবারের আতিথেয়তায় অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি, শান্তি পেয়েছি। এভাবে মুগ্ধ হয়েছে, শান্তি পেয়েছে আরো হাজারো শিশু-কিশোর, নরনারী লক্ষ কোটি মানুষ।

পবিত্র মওলা হুজুরকে চিনতে পারা

মহিয়সী নারী মা'জানের মাধ্যমে আমি মওলা হুজুরের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। আমার জীবনে যখন একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে, এর আগে কিংবা তখনো আমি পবিত্র মওলা হুজুরকে জানতে বা চিনতে পারিনি। অর্থাৎ রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.) মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক সত্তার অধিকারী, তা আমি বুঝতে পারিনি। তখন সব হারানোর অন্তর্জ্বালায় আমি ব্যথিত, পীড়িত, দগ্ধ হলেও অনেকে ভুল বুঝে আমাকে দোষী ভাবতে শুরু করেছে। একদা দরবারে গেলে নানী (মা'জান) নিজ থেকে বললেন, তোমার মামা (মওলা হুজুর) আছে, দেখা করবে নাকি? আমি হ্যাঁ বলাতে ডেকে দিয়েছেন। ওই সময়ের পর থেকে আমি পবিত্র মাওলা হুজুরকে চিনতে বা বুঝতে শুরু করি। তিনি দোতলার ঘর থেকে আলোক ঝর্ণা হয়ে নেমে আসলেন। নিজের ভেতর 'সত্য' আলোর মতো যেন তড়িৎ ঢুকল, অনুভবে ঐশী প্রেরণা জাগল, কান্নার আবহে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইলো! চিরন্তন সত্যের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হল। তবে তাঁর ঐশী দ্যুতির উজ্জ্বলতায় স্থির থাকতে না পেরে সামনাসামনি অবস্থান থেকে আমি তাঁর ডান পাশে একটু দূরে সরে গিয়েছি।

যা বলছিলাম – মা'জান হযরত মুনাওয়ারা বেগমের মাধ্যমে আমি পবিত্র মাওলা হুজুরের সাক্ষাৎ লাভ করে অনুকম্পা পেয়েছি। অসুস্থ সময়ে জীবনের শেষ দিনগুলো ছাড়া অন্যান্য সকল সময় মা'জান দরবারে থাকতেন। দুর্দশায় নিপতিত মানুষ বিশেষ করে মহিলা ভক্তরা তাঁর সাথে দেখা করতে চাইতো। তিনি দেখা দিতেন, একেক জনের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা ধৈর্য সহকারে শুনতেন। সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ মা'জানের পরামর্শ চাইতো, দোয়া চাইতো। দরবারে দিনরাত মানুষের আনাগোনা, তিনি কখনো বিরক্ত হতেন না। মানুষকে সময় দিতেন, মহিলাদেরও সুপরামর্শ দিতেন, উপকার করতেন। সমস্যা সমাধানে দোয়া করতেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য রওজা শরিফে একান্তে ফরিয়াদ-আর্জি জানাতেন। আত্মীয়ের মধ্যে বহু ঘনিষ্ঠজন মা'জানকে নিয়ে শাহানশাহ্ বাবাজানের মাজারে যেতেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিশেষ প্রিয় উসিলার মাধ্যমে মানুষের প্রার্থনা দ্রুত কবুল করেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কুরআন শরিফে বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে, আল্লাহ্কে চেনার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় ১টি উসিলা (মাধ্যম) খোঁজ করতে। সূরা মায়েদা; আয়াত ৩৫: ইরশাদ হচ্ছে: হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় কর। খোদার দিকে উপায় বা উসিলা তালাশ কর। আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টিত হও। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।

দরবারের আলোর ফোয়ারা

গাউসিয়া হক মন্জিলের বিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য মা'জান সৈয়দা মুনাওয়ারা বেগমের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তিনি ঘরের কাজ করতেন আবার অতিরিক্ত কাজ কর্মচারী দিয়ে করাতেন। কর্মীদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল শান্ত, কোমল কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল প্রবল। কাজে কর্মে শৃংখলায়, সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসায় মা'জান দরবারের চারদিক আলোময় করে রাখতেন। কার্যগত দিক থেকে অনন্য পরিচালনার গুণে তিনি ছিলেন দরবারের আলোর ফোয়ারা। যা নরনারীর দুঃখ কষ্ট লাঘব করে ব্যক্তিজীবনের মলিনতা ধুয়ে মুছে শান্তি এনে দিতো! সেই যুগে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উরসের কাজের ব্যবস্থাপনায় মা'জানের পিতার অক্লান্ত সেবাদান অব্যাহত ছিল। তেমনি দরবারী নিত্য নৈমিত্তিক কাজ থেকে শুরু করে সব ধরনের ছোট-বড় কাজে মা'জানের তদারকি ও সেবাদান চিরস্মরণীয়। আরো উল্লেখ্য, মা'জান মুনাওয়ারা বেগম

নিজের ছয় সন্তানকে লালন পালন করে পড়ালেখায় উচ্চ শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলেন। বিয়ের ক্ষেত্রেও অভিজাত সম্ভ্রান্ত সুবংশীয় পরিবারের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। দরবারে আগত মানুষের সাথে তাঁর সুকন্যাদের আচরণও অত্যন্ত সুভদ্র-মার্জিত-পরিশীলিত। সম্মান প্রদর্শনে মানুষের সাথে তাঁদের ব্যবহার অতুলনীয়।

শেষের দিনগুলোতে অসুস্থতার কারনে মা'জান চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় ছিলেন। তখন দরবারে সুনশান নিরবতা, কী এক শূন্যতা বিরাজ করছিল!! পৃথিবীর সেরা সম্পদ, একমাত্র আপনজন আত্মার বন্ধন আম্মাকে বিদায় জানাতে মাওলা হুজুরকে অতুলনীয় অশেষ সহ্য শক্তিতে ধৈর্য্য ধরতে হয়েছে। মাওলা হুজুরের পরিবার, তাঁর বোনেরা, আত্মীয়সহ ভক্ত-আশেক এবং কাছের মানুষের ধৈর্যধারণের মধ্য দিয়ে মহিয়সী নারী মা'জান ইহধাম ছেড়ে পরলোকে গমন করেন (৬-১০-২০২১ ইং)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:– ক্ষমাকর, ধৈর্য ধর, হউক সুন্দরতর বিদায়ের ক্ষণ / মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয় শুধু সমাপন। শুধু সুখ হতে স্মৃতি / শুধু ব্যথা হতে গীতি / হে মহাসুন্দর শেষ / হে বিদায় অনিমেষ / হে সৌম্য বিষাদ / ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির / মুছায়ে নয়ন নীর / করো আশীর্বাদ।। এখনতো মা'জানকে আর দেখতে পাইনা! কিছুদিন আগে কোন এক রবিবারে দরবারে আসা প্রায় ২০০ জন মহিলার জন্য গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পূর্বের বাড়ি থেকে অন্দর বাড়িতে দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হয়। পুরুষদের জন্যও একই ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পবিত্র মওলা হুজুর শহর থেকে সেদিন বাড়িতে/দরবারে অবস্থান করছেন। ঐদিন খাবারের ন্যায্যমূল্যও সংগ্রহ করতে দেখিনি। বহুদিন পর তখন আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল! যুগ যুগ ধরে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সকল মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থাপনা চালু রাখা হয়। সে এক এলাহি কান্ড। দরবারের প্রতিনিধিদের যে কতো শান তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার নেই।

বদ্‌রুননেসা সাজু
বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম

শ্রদ্ধেয় "দাদীজান"

খুব ছোটবেলা থেকেই আব্বুর সাথে আমার মাইজভাণ্ডার শরিফ যাওয়া শুরু। মাইজভাণ্ডার শরিফ আমার এবং আমার পরিবারের কাছে আমাদের দ্বিতীয় বাড়ি। এ বাড়িতে আমাদের একজন "দাদীজান" ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (রহ.) স্ত্রী। আব্বু-আম্মু দু'জনই তাঁকে 'মা জান' বলে সম্বোধন করতেন। সেই হিসেবে তিনি আমাদের তিন ভাই-বোনের "দাদীজান"।

আব্বু যখন আমাকে ফোন করে বললেন "দাদীজান" সম্পর্কে কিছু লিখতে তখন ছোটবেলার অনেক স্মৃতি মনে পড়ছিল। দরবারকে ঘিরে আমাদের অনেক স্মৃতি। সেই স্মৃতিগুলোতে অমলিন আমাদের শ্রদ্ধেয় "দাদীজান"। আজ আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা লিখবো।
তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়, আব্বুর (সাংবাদিক মাহবুব উল আলম) সাথে দরবারে গিয়েছিলাম। আব্বু তখন নানা কাজে দরবারে যেতেন, এটা আমি আমার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখছি। মাঝে মাঝে বাসার সবাইকে নিয়ে যেতেন, মাঝে মাঝে শুধু আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন আমার ছেলেদের মত চুল আর পোষাকও ছিল তাই। যথারীতি সেই পোশাকে আমি দরবারে চলে যাই এবং বিগত দিনগুলোর মতো সেই দিনও আব্বু আমাকে হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাসায় রেখে কাজে চলে যান। আব্বু যখন আমাকে নিয়ে একা যেতেন তখন ওই বাসাতেই রেখে যেতেন। আমাদের পরিবারের সবচেয়ে নিরাপদ ঘর। আমি মহানন্দে বসার ঘরে ঘুর ঘুর করে খেলতাম, জানালা দিয়ে ফুল দেখতাম (ঘরের পাশে সুন্দর গোলাপ বাগান ছিল), নিজে নিজে গান করতাম, ছড়া পড়তাম, কত কি করতাম। আমার এই খেলাধুলার মাঝে বাসার কর্মীরাও এসে জিজ্ঞেস করতো, কিছু খাবো কিনা? খিদে পেয়েছে কিনা? আমার খোঁজখবর রাখতো সবাই। সেইবার আমার অনেক খিদে লেগেছিল এক কর্মী (নতুন, সে আগে আমাকে দেখেনি) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ভাত খাবে?" আমিও আমার স্বভাবমতো বললাম, "হ্যাঁ খাবো"। সে আমাকে নিয়ে গেলেন ভাত খাওয়াতে। যে জায়গায় দরবারে গেলে সবাই খায় সে জায়গাটিতে। আমি অভিমান করে 'এখানে খাব না' বলে সোজা হেঁটে আবার বসার ঘরে চলে এলাম। ওই কর্মীটি খুব অবাক হলো, কিন্তু আমাকে কিছুই বললো না। বেশ

কিছুক্ষণ পর আরেকজন কর্মী (পুরাতন) এসে বললো, "তোমাকে খেতে ডাকে"। আমি তাকে মুখের উপর বলে দিলাম, "আমি ওখানে খাবো না"। তিনি আমাকে বললেন, "দাদীজান ডাকছেন খেতে"। আমি তাঁর (দাদীজান) কথা শুনে তার সাথে চলে এলাম, এসে দেখি তিনি ভাতের প্লেট নিয়ে বসে আছেন, তিনজনের জন্য প্লেট সাজানো ছিল তার মধ্যে আমি একজন। তাঁর সামনে রাখা চেয়ারে বসলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি খাবে?" আমিও বলতে লাগলাম, এটা খাবো ওটা খাবো। তাঁর সাথে বসে খাওয়ালেন আমাকে। আমার ছেলেমানুষী তিনি খুব সহজভাবে নিলেন। তাঁর সাথে বসে আমার প্রথম খাওয়া। এখন মনে হয় আমার অবুঝ শিশুমনের বোবা অর্থহীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁর সূক্ষ্মদর্শী মনের ক্যামেরায় ধরা পড়তে এক মুহূর্তও বিলম্ব ঘটেনি।
আমার মনে আছে দরবারে যখনই যেতাম "দাদীজান" অবশ্যই বলতেন "খানা খেয়ে যাবে"। কোন সময় ভুল হতো না কথাটা বলতে। না খেয়ে কোনদিন তাঁর বাসা থেকে আসিনি।
শেষবার আমি দরবারে যাই ২০১৩ সালে, আমার বিয়ের দাওয়াত দিতে। অবশ্য এর আগে মা গিয়েছিলেন সম্মতি নিতে। আমি ও আমার মা গিয়েছিলাম দাওয়াত কার্ড নিয়ে আর সাথে দোয়াপ্রার্থীও ছিলাম। তখন তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। দাদীজানের কাছে যখন খবর গেল আমি আর আমার মা এসেছি তখন তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন তাঁর শোবার ঘরে। বিয়ের দাওয়াত দিতে এসেছি শুনে তিনি হেসে দিলেন। আমার মায়ের কাছ থেকে যাবতীয় বিষয় জানতে চাইলেন। সব শুনে "দাদীজান" খুশি হলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন নতুন জীবন যেন সুখের হয়। আর সাথে এটা বলতে ভুললেন না "খানা খেয়ে যাবে"।
বিয়ের পর থেকে ঢাকায় বসবাসের কারণে আমার সাথে আর দেখা হয়নি কিন্তু আব্বুর মাধ্যমে সবসময় তাঁর সংবাদ আমি জানতাম। "দাদীজান" সম্পর্কে এই লেখাটা লিখতে লিখতে আমার চোখের সামনে পবিত্র চেহারা ভেসে উঠেছে, সাদা শাড়িতে স্নিগ্ধ শুভ্র একখানা হাসিমাখা মুখ। কিযে পবিত্র দেখতে তা। মহান আল্লাহ্ আমাদের "দাদীজান"কে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমিন।

এডভোকেট জাকিয়া আয়মুন
হাইকোর্ট ডিভিশন, ঢাকা

আমার হৃদয়ে মহীয়সী আম্মাজান

দরবার সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা ছিলনা। ১৯৭১ সালে আমার বিয়ে হয়। আমি সর্বপ্রথম আমার স্বামী মাওলানা মোহাম্মদ হাসান (রহ.)-এর মাধ্যমে দরবার শরিফে যাই। সে দিন প্রথম অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কে দেখি। আমার এত শ্রদ্ধা এবং ভক্তি লেগেছিল তাঁকে দেখে তা আমি বলে বুঝাতে পারবো না। আমার স্বামী আমাকে তাঁর হাতে সেদিন বায়াত গ্রহণ করানোর জন্য আর্জি পেশ করেন। আমার সাথে বাবাজানের কাছে আরো দুজন মহিলা বায়াত হতে গেলে তাদেরকে সরিয়ে আমাকে তাঁর কাছে বসিয়ে বায়াত করান। পরে জানতে পারলাম ঐ মহিলারা হযরত তৈয়ব শাহ্ (রহ.)-এর কাছে প্রথমে বায়াত হয়েছেন, পরে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কাছে বায়াত হতে যান বিধায় তিনি তা বুঝতে পারেন। তাই তাদেরকে তিনি বায়াত করান নি। এই সময় তিনি আমাকে ভিতর বাড়িতে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি ভিতরের বাড়িতে গিয়ে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধেয় আম্মাজানকে দেখি। তিনি রান্নাঘর থেকে বের হয়ে হাসিমুখে আমাদেরকে বললেন, 'আপনারা এসেছেন বসেন এবং আমাদের সামনে বসেন', তারপর তাঁর রান্না করা খাবার পরিবেশন করার নির্দেশ দেন। আমি দেখেছি তিনি প্রায় সময় হাসিমুখে থাকতেন এবং সাদা রঙের কাপড় পড়তেন। তবে কোনদিন কোন পরপুরুষের সাথে/দরবারে আগত ব্যক্তি সেবকদের সাথে কথা বলতে দেখিনি। আমি মা'জানকে দেখেছি একজন মমতাময়ী মা হিসাবে। আমি তাঁর শাশুড়িকে (হযরত বাবা ভাণ্ডারীর কন্যা) দেখিনি।

যেদিন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী আমাকে বায়াত করান সেদিন তিনি বলেছিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। তোমাকে দরবারে আর আসতে হবেনা। কিন্তু আমি বলেছিলাম, বাবাজান আমি দরবারে না এসে পারবো? তাই তাঁর জীবদ্দশায় কোন দরবারে যেতাম না। তবে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের পর আমি মাঝেমধ্যে যেতাম এবং হযরত কেবলা কাবা আর বাবা ভাণ্ডারী'র দরবারে যিয়ারত করে চলে আসতাম। সেই থেকে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাথে আমার সম্পর্ক। আম্মাজান-এর সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতো। যখনই যেতাম তিনি আমাকে অনেক আদর-আপ্যায়ন করতেন এবং নিজের পাশে বসতে বলতেন। কিন্তু আমি বেয়াদবি হবে

দেখে বসতাম না। আমার ৩ ছেলে ৫ মেয়েকে নিয়েও আম্মার সামনে গেলে অনেক আদর করতেন। আল্লাহ্‌র রহমতে আমার সব ছেলেমেয়ে দরবারের আশেক এবং খেদমতে আছে। আমার বড় মেয়ে হামিদা বেগমকে বাবাজানের দয়ায় আমির ভাণ্ডার দরবার শরিফে বিবাহ দিই। হামিদা বেগমের মেজ মেয়েকে নিয়ে আমি আম্মাজানের সাথে দেখা করি এবং আমার নাতনিকে ডাক্তারি পড়ানোর ইচ্ছার কথা বলি এবং দোয়া করতে বললে তিনি বলেন, ও ডাক্তারিতে চান্স পাবে তবে সরকারি মেডিকেলে নয় বেসরকারি মেডিকেলে পড়বে। আম্মাজানের কথামত সে ইউএসটিসি মেডিকেলে ভর্তি হয়। এখন এমবিবিএস পাশ করে ইন্টার্ণী করছে।

তাছাড়া আমার শ্বশুর বাড়ি হযরত মাওলানা অলি উল্লাহ্‌ শাহ্‌ (রহ.)-এর পুরান বাড়িতে আমাদের আশেপাশের প্রতিবেশি এবং জেঠা শ্বশুর ও অন্যান্যরা জায়গা নিয়ে বিরোধ করে এবং ১৯ গণ্ডা জায়গা ভোগদখল করে আমাদেরকে বঞ্চিত করে। আমি অনেক দুঃখ করে মা'জানের কাছে আর্জি পেশ করলে তিনি আমাকে সান্তনা দেন, ধৈর্য্য ধরতে বলেন এবং অনেক মামলা-মোকদ্দমার পর শেষ পর্যন্ত আমাদের জায়গা আমরা বাবাজানের দয়ায় ফেরত পেয়েছি। মা'জানের কাছে সবসময় ছেলেমেয়েদের জন্য আর্জি দিতাম। জীবনের সব দুঃখ মা'জানের কাছে বলতাম, আমার মা'জান এমন একজন মা তিনি সবাইকে আগলিয়ে রেখেছেন। তাঁর মায়া-মমতা, ত্যাগ, আদর্শ সবকিছু অনুসরণীয় এবং চির অম্লান।

২/৩ বছর আগে হজ থেকে এসে মওলা হুজুর (ম.)-এর বাসায় গেলে আম্মাজানের সাথে শেষ দেখা হয়। তখন আম্মাজান আমার সাথে কথা বলেন, আমাকে তাঁর পাশে বসতে বলেন। আমিও এখন অনেক অসুস্থ বৃদ্ধ বয়স। কিন্তু তারপরও বেয়াদবি হবে ভেবে আমি বসিনি। আমার বড় ছেলের মারফতে হজ থেকে আনা জায়নামায, তজবিহ্‌, খেজুর, জমজমের পানি ইত্যাদি মওলা হুজুর-এর কাছে পাঠালে তিনি তা বাসায় নিয়ে যেতে বলেন। তাঁর কথামত আমি যদি তা নিয়ে বাবাজানের বাসায় না যেতাম তাহলে আম্মাজানের সাথে হয়তো আর দেখা হতো না।

আমার বাপের বাড়ি সুলতানপুর। আমার বাবার নাম আহম্মদ হোসেন। তিনি অনেক আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ ছিলেন। মকবুল শাহ্ (রহ.) আমার বাবার দাদা। তিনি অনেক বড় মাপের অলিআল্লাহ্ ছিলেন।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র নেকনজর এবং ফয়েজ বরকত কতটুকু হাসিল করতে পেরেছি তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন। হযরত মুনাওয়ারা বেগম আম্মাজান (রহ.) গাউসুল আযমের একজন খলিফা, আশেক এবং নিরবে নিভৃতে তরিক্বতের প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা অনন্য এবং অতুলনীয়। আজ আম্মাজানের কথা অনেক বেশি মনে পড়ছে। তাঁর ওফাত-এর পূর্বে শেষ দেখাটা দেখার তৌফিক আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ্র দারবারে হাজার কোটি শুকরিয়া।

সুরাইয়া বেগম
স্বামী: মাওলানা মোহাম্মদ হাসান (রহ.)
মাওলানা অলিউল্লাহ্ শাহ (রহ.) বাড়ি
ছত্রপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম

স্মরণে– স্মৃতিতে অম্লান
লাখো আশেক-ভক্তের "মহীয়সী আম্মাজান"

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। যতদূর মনে পড়ে '৮৯ সালের দিকে অসুস্থ আব্বাকে নিয়ে রাতের বেলা দরবার শরিফ যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মাঝপথে গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তায় মানুষজন নেই। ড্রাইভার গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে রেখে খুব অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় দুজন অচেনা লোক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন এবং তাদের সাহায্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি ঠিক হয়ে যায়। তখনই জানতে পারি তারা এই গ্রামের লোক যদিও তারা এসময় বাড়িতে থাকেন না। আমার বিশ্বাস মহান মুনিবের উসিলায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদেরকে আমাদের সাহায্য করতে পাঠিয়েছেন। সবকিছু শেষ করে দরবারে পৌঁছাতে আমাদের অনেক রাত হয়ে যায়।

পবিত্র রওজা শরিফসমুহ জিয়ারত শেষ করে যখন আমরা হক মন্‌জিলে আম্মাজানের সাথে দেখা করতে গেলাম। তখন অনেক রাত, তারপরও তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের সবকথা শুনলেন এবং খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আপ্যায়ন করালেন। সেদিনের সেই মধুর ব্যবহার ও আন্তরিকতা সত্যিই মনে রাখার মতো। তিনি সত্যিই অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন, তাইতো তিনি শ্রদ্ধার আসনে বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

রাতে আমরা সেখানেই ছিলাম এবং ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি তিনি আমাদের জন্য নাস্তার টেবিলে অপেক্ষা করছেন। দেখা হতেই তিনি রাতে দেখা হওয়ার পরও বেশিক্ষণ সময় দিতে না পারার কথা বারবার বলছিলেন। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। এমনই আরো অনেক স্মৃতি হৃদয়পটে ভেসে বেড়াচ্ছে। সময়ে অসময়ে যখনি দরবারে উপস্থিত হয়েছি আম্মাজানের সুন্দর কথা বলা, আদরযত্ন, পরিবারের সবার খোঁজ খবর নেয়া, বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা নিয়ে আলোচনা, সঠিক পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। আম্মাজানের হাসি মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারছিনা।

অনেক দূর থেকে আসা গ্রামের মহিলা, ছোট বড় সবাই খাবার খেয়েছে কিনা তদারকি করতেন। রমজান মাসে ইফতারের সময় অনেক দেরি থাকা সত্ত্বেও আম্মাজানের কারণে ইফতারি নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। ভক্তদের থাকা খাওয়ায় কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা বারবার দায়িত্বশীলদের তাগাদা দিতেন। দায়িত্বে থাকা খালাদের এবং অফিসে যোগাযোগ করতে বলতেন। আমাদের এবং আগামী প্রজন্মের অনেক কিছু শিক্ষনীয় আছে শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের কাছ থেকে।

গর্বের সঙ্গে নিজের প্রশংসা না করা, ধোকা না দেয়া, জুলুম না করা, অন্যায় কাজ দেখলে শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী বাধা দেয়া, বিপদে আপদে সবর করা, নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ না করা, ভালো মন্দ যাকিছু হয় সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয় এই বিশ্বাস রাখা, আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখাসহ নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। রাসূলে করিম (সঃ) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন সৎ স্বভাবের উপর।

আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টির সেরা মানবের অনুপম সৌন্দর্যের প্রতীক "শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান"। পরম যত্ন, নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, এ ত্যাগ, গৌরব ও খ্যাতির উপমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্মৃতির রাজ্যে অমর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান। লাখো আশেক ভক্তের মহিয়সী "শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান" আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন পেয়ারা রাসূলে করিম (সঃ) এর সদকায় দরবারের মহান মুনিবের উসিলায় আমাদের শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের রফেদারাজাত বুলন্দ করেন এবং আমাদের নেক মকসুদ পূরণ সহ উভয় জাহানের কামিয়াবি নসীব করেন। আমিন।

এলিজা মহসিন
পিতাঃ আলহাজ মোহাম্মদ মহসিন খান
রামপুর, ঈদগাহ্‌, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম

কাছে থেকে দেখা – আম্মাজান

ছোটবেলা থেকেই আমি মাইজভাণ্ডারে আসার জন্য অনেক আগ্রহী ছিলাম। দরবারের পার্শ্ববর্তী সিকদার বাড়িতে আমার নানুর বাড়ি। যতবার নানুর বাড়ি আসতাম, প্রতিবারই দরবারে ছুটে আসি। জিন্দাঅলি দেখা আমার এক অদ্ভুত প্রত্যাশা ছিল। সবসময়ই আব্বার কাছে জিন্দাঅলি দেখব বলে বায়না করতাম। একদিন আব্বা আমাকে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর কাছে নিয়ে যান। বাবাজানের রূপবেশ আমার দেখা শ্রেষ্ঠ খোদাই জগতে মগ্ন থাকা, অশেষ গুণে গুণান্বিত আধ্যাত্মিক সাধক। এরপর থেকেই বাবাজান ও আম্মাজানের প্রেমে আবেগমগ্ন হয়ে দরবারে আসা হত। আম্মাজান আমাকে অনেক ভালবাসতেন।

একদিন বাবাজান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি লাগবে মা? আমি বললাম, বাবাজান আপনাকে লাগবে। বাবাজান বললেন, "ওহ্ বুঝেছি তোমার আল্লাহ্কে লাগবে"। আমি বললাম, বাবাজান আপনাকে পেলেই আল্লাহ্র রহমত পাওয়া হবে। বাবাজান উচ্চধ্বনিতে হাসি দিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন। বেশকিছুদিন পর আমার বিবাহ হয়। যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ায় আগের মত দরবারে হাজির হবার সুযোগ হচ্ছিল না।

একদা ১০ই পৌষ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খোশরোজ শরিফে হাদিয়াস্বরূপ পাঞ্জাবি, টুপি নিয়ে হাজির হই। বাবাজানের কাছে গিয়ে দেখি হাজারো আশেকান ভক্তগণ অপেক্ষারত আছেন। আমি বাবাজানের নির্দেশ অনুযায়ী মহিলাদের সারিতে ছিলাম। হঠাৎ শাহ্জাদা সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারী সাহেব প্রবেশ করলেন। শাহানশাহ্ বাবাজান খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে বরণ করেন। আমাকে ডেকে বললেন, আম্মাজানকে নাস্তার ব্যবস্থা করতে বল, আমার মামা এসেছেন। আমি আদেশানুযায়ী আম্মাজানের কাছে গিয়েছি। আম্মাজান সদা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিনিয়ত দরবারের মেহমানদের আসা-যাওয়া থাকেই। আম্মাজান সকলের খাবারের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সাংসারিক কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

আম্মাজানের কাছ থেকে নাস্তা নিয়ে বাবাজানদের দিয়ে আসি। এরপর বাবাজান বললেন, "হাসান মিয়াকে আমার কাছে নিয়ে এসো"। হাসান বাবাজান পরনে পুরোনো পাঞ্জাবি পরা ছিলেন। ওযু করে শাহানশাহ্ বাবাজানের কাছে আনলাম। শাহানশাহ্ বাবাজান ভক্তগণের উপহারকৃত পাঞ্জাবি থেকে একটি নিয়ে হাসান বাবাজানকে পরিধানের নির্দেশ দেন। এরপর আমাকে বলেন, বখতেয়ার মামাকে ডেকে আনতে। আমি মামাকে ডেকে আনি। সবার উপস্থিতিতে শাহানশাহ্ বাবাজান হাসান বাবাজানকে হাতে ছুরি তুলে দিয়ে বললেন "আপনি কেক কাটেন। সব সময়ইতো আর আমি কাটতে পারব না। আগামী বছর থেকে আপনাকে কেক কাটতে হবে।" "বাবাজানের কথা শুনে হাসান বাবাজানের হাসিমুখে মুহূর্তেই বিরহের ছাপ নেমে আসে। আমিও কিছুটা অনুধাবন করতে পারলাম। আল্লাহ্র অলিগণের পবিত্র কালামের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে। বাবাজান এই উক্তির দ্বারা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এটি উপলব্ধির পর আমি কান্নায় আত্মহারা হয়ে উঠি। বাবাজান আমাকে সান্তনা দিয়েছিলেন এবং অবশিষ্ট কেক আম্মাজানের কাছে নিয়ে মহিলাদের মাঝে বন্টনের নির্দেশ দেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানের সম্মানিতা সহধর্মিনী আমাদের প্রাণপ্রিয় আম্মাজান ছিলেন একজন বীরনেত্রী। গুণসম্মত, সৌহার্দ্যময়, পরোপকারী, ধৈর্য্যশীল, মহীয়সী নারী। আম্মাজানের কাছে যখনই এত কষ্ট ধৈর্য্যধারণের কথা জিজ্ঞাসা করতাম, আম্মাজান বলতেন, "আমার আব্বা মাইজভাণ্ডারের আশেকান, অছি-এ গাউসুল আযম-এর মুরিদ ছিলেন। বিবাহের মাধ্যমে আমাকে দরবারের খেদমত করতে পাঠিয়েছেন। তাই আমার কোনরূপ আপত্তি নেই। দরবারের গোলামির সুযোগ পেয়ে, আমিও তোমাদের মত আনন্দিত ও সৌভাগ্যবান অনুভব করি।" সুবহানআল্লাহ্।

আম্মাজান তাঁর সাংসারিক জীবনে কখনও সুখ বিলাসিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, পরিচর্যা, আদবশিক্ষা, প্রভৃতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। আত্মীয়ের হক আদায়ের যথার্থতা অবলম্বনে সক্ষম ছিলেন। শাহানশাহ্ বাবাজানের কাছে ভক্তগণ মানতের হাদিয়া যা কিছুই আনত, তিনি বাবাজানের নির্দেশনা মোতাবেক উপস্থিত আশেক ভক্তগণের মাঝে

তাবার্‌রুক হিসেবে বিতরণ করে অবশিষ্ট থাকলে আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন দেখলাম শাহানশাহ্ বাবাজানের কাছে এক ভক্ত অনেক বড় একটি মাছ এনেছিল। বাবাজান আম্মাজানকে ডাক দিয়ে বললেন, ‘জেবুর মা এই মাছটি মেজমিয়া, সেজমিয়া, খুলুমিয়া, ছোটমিয়া সবার জন্যে সমভাগ কর। ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা যথাযথ পালন করতেন। বাবাজানের মহত্বের দিক অনুসরণে আম্মাজানও সর্বদা অন্যের সন্তুষ্টিতে পরিতৃপ্তি পেতেন। অনেকবারই এমন হয়েছিল, নিজে না খেয়ে আশেকানদের দিতেন, নিজের ভাগটুকুও মেহমানদের আপ্যায়নে দিয়ে দিতেন। পরিবারের আগে আত্মীয়-স্বজনের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ছেলেমেয়েরাও বাবা-মায়ের নীতি আর্দশে কখনও দ্বিমত পোষণ করেন নি। আপুদের বিবাহের পরও আম্মাজান একই রীতিনীতি অনুযায়ী সম বন্টনের দ্বারা তাদের শ্বশুড়বাড়িতে সবকিছু পাঠিয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বৌমাও শাশুড়ি মায়ের নীতিমালা অনুসরণ করেন। আম্মাজান পুত্রবধূকে নীতিআর্দশ শিক্ষার আলোকে হক মন্‌জিল পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তির উপযুক্ত করে তুলেছেন। আম্মাজানের শিক্ষার পূর্ণদক্ষতা অর্জনে বর্তমানে ছোট আম্মাজান হক মন্‌জিলে দায়িত্বরত আছেন।

একবার আম্মাজান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আমি আতঙ্কিত হয়ে পাগলের মত ছুটে গেলাম আম্মাজানের কাছে। আমাকে দেখামাত্রই আম্মাজান বললেন, “তোমার মা কেমন আছে? হাসান মিয়া তোমার খালাম্মাকে দেখতে যাও”। তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম আমার আম্মা নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আম্মাজানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে দেখলাম আমার মায়ের খুবই আশংকাজনক অবস্থা। দ্রুত হসপিটাল নিয়ে জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হল।

পরেরদিন সকালে মওলা হুজুর আসেন। আম্মার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ডাক্তার সাহেব পরিচয় জানতে চাইলে বাবাজান বলেন, উনি আমার খালাম্মা। আর আমাদের খালাতো বোন বলে পরিচয় দেন। আমার আম্মা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন।

দরবারের খেদমতকারী এক আশেকানের মৃত্যুতে বাবাজান দাফনকার্য থেকে শুরু করে ঘেরা ও বেড়া দেওয়া, জিয়ারত, মুনাজাত সম্পন্ন করে বাড়ি আসেন। আম্মাজানকে কথোপকথনের ছলে আমি বিষয়টি বলেছিলাম। আম্মাজান আমাকে বলেন, "আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন অলিগণকে মানব সেবার লক্ষ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই হাসান মিয়া সর্বদা আল্লাহ্র দেওয়া দায়িত্ব পালনে অবগত থাকে।" সুবহান আল্লাহ্।

এর কিছুদিন পর আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। হযরত গরিবউল্লাহ্ শাহ্ মাজার সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তখনও বাবাজান শুরু থেকে শেষ দাফনকার্য, জিয়ারত, মুনাজাত সম্পাদনের পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেন। আম্মাজান তাঁর ছেলেমেয়েদের ও পুত্রবধূকে সর্বদা মানুষের আত্মার শান্তি কামনা করতে জোর দিতেন। মানবের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জনে সদা প্রস্তুত থাকতেন। টাকা পয়সা পাওয়ার আকাঙ্খা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, আল্লাহ্র রহমতের আশায়, নির্দ্বিধায় মানবসেবায় জাগ্রত থাকার আদেশ দেন।

দাঁতমারা ইউনিয়নের বদরুজামান সিকদারের যোগ্যকন্যা শাহানশাহ্ বিশ্বঅলির অর্ধাঙ্গীনি হবে, এটি আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিনই নির্ধারন করে রেখেছেন। জাগতিক সকল বিষয়টি তুচ্ছ জ্ঞাপন করে আল্লাহ্র প্রেমমগ্ন, আধ্যাত্মিকতায় রত, মজনুহালের জজ্বায় পরিপূর্ণ সাধকের সহধর্মিনী হওয়ার উপযুক্ততা আম্মাজানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিবন্ধিত ছিল। সেই শুভাকাঙ্খিতে তিনি আজ জগতের মা জননী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। শাহানশাহ্ বাবাজানেরও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় আম্মাজান উত্তীর্ণ হয়েছেন। একদিন বাবাজান আম্মাজানকে বেশি করে রান্না করতে বলেন। আম্মাজান তাড়াতাড়ি পোলাও ভাত, মুরগির মাংস, গরুর কোরমা আরো নানাবিধ পদ রান্না করে সন্ধ্যায় বাবাজানকে খেতে দিলেন। বাবাজান নতুন বাটি দেখিয়ে বললেন, এটিতে করে দাও। আম্মাজান সেই ডিনারসেটটি বের করে আবারও সাজিয়ে সবকিছু প্লেট, বাটি, গ্লাস পরিবর্তন করে বাবাজানের সামনে রাখলেন। বাবাজান লুঙ্গি গোচ করে খাবারের ট্রে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে যান। সবাইকে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

ওফাতের আগে আম্মাজানের অসুস্থতার খবর শুনে তাঁকে দেখতে দরবারে গিয়েছিলাম। আম্মাজানের কদমে বসে বলছিলাম, "আম্মাজান আপনি আমাকে কবুল করেছেন। আমার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়েন"। আম্মাজান বললেন, "তোমরা আমার সন্তান। আমি তোমাদের কবুল করে নিয়েছি। তোমাদের কোন ভুল নেই। তোমারা দরবারের খেদমতে এসেছ। আল্লাহ্ রহমত করুন"। আম্মাজানের এই মহান উক্তিই ছিল আমার সঙ্গে তাঁর শেষকথা।

লুৎফুরনেসা চৌধুরী
পিতা আলী আহমদ চৌধুরী
মাতা খাদিজা খাতুন
আলমদার আহমদ চৌধুরী বাড়ি, পাইন্দং, ফটিকছড়ি

অগণিত আশেক-ভক্তের মহীয়সী আম্মাজান “উম্মুল আশেকীন” এর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

৬ই অক্টোবর ২০২১ সাল। স্মৃতির পাতায় একটি বেদনাবিধূর দিন। ঐদিন আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ‘লাখো ভক্তের মহীয়সী আম্মাজান’ উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) ওফাত বরণ করে স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌঁছে যান।

আম্মাজান-এর ওফাতে সেদিন লাখো ভক্তের অশ্রুধারার সাথে প্রকৃতিও যেন একাত্ম হয়ে অশ্রুবর্ষণ করছিলো।
শ্রদ্ধেয় মা'জান এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ছি। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে বার বার। কি লিখবো আসলে বুঝে উঠতে পারছিনা। কিন্তু মাকে নিয়ে খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। আমি এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করি কেউ লিখতে পারুক আর না পারুক মা'জানের নূরানী কার্যক্রমগুলো অগণিত শোকার্ত আশেক-ভক্তদের আমৃত্যু সাথী হয়ে থাকবে। লাখো আশেক-ভক্তের হৃদয়ের মনিকোঠায় শ্রদ্ধার আসনে মা'জান বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

ইতোপূর্বে বিশিষ্টজনেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর ও সুচারুরূপে এই মহীয়সী রমণীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। তাদের আলোচনায় মা'জানের পবিত্র চরিত্রের সুন্দরতম দিকগুলো ফুটে উঠেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি অধম, নালায়েক মনে করি অনন্য সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী এই মহীয়সী রমণীকে নিয়ে কিছু লেখার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। তবুও আমার জীবনে তাঁর সোহবত পাওয়া কিছু স্বর্গীয় মুহূর্তের কথা সবার সাথে ভাগাভাগি করতে খুব ইচ্ছে করছে। তাই এই অধমের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আম্মাজানকে আমার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয় ১৯৯১ সালের ২০শে অক্টোবর রবিবার। স্মৃতির পাতায় দিনটি এখনো সমুজ্জ্বল। আমাদের বিয়ের একদিন পর আমার স্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমার শাশুড়ি আম্মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য সহ আমরা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জিয়ারতে যাই। উল্লেখ্য, আমার শাশুড়ি আম্মা দরবারে পাকের একজন সম্মানিত আওলাদ।

সত্যি বলতে কি, আল্লাহ্ পাকের মহান অলিয়ে কেরামের শান-মান ও দরবারে পাক সম্পর্কে আমার তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না তবে শ্রদ্ধাবোধ ছিল।
(আমার সেজ ভাই বিভিন্ন দরবার সমূহে জিয়ারতে যেতেন। তার কাছ থেকে আমি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের কথা শুনেছি)

সেদিন আমরা পবিত্র রওজা শরিফসমূহ জিয়ারতের পর যখন গাউসিয়া হক মন্জিলের ভিতর বাড়িতে গেলাম। তখন আমি শুভ্রবসনা, স্নিগ্ধ, মায়াময়ী, স্বল্পভাষী, মোহনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের সাক্ষাৎ লাভ করি। মা'জান সেদিন বিশেষ আপ্যায়নের (নতুন বউয়ের জন্য) ব্যবস্থা করেছিলেন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, হৃদ্যতাপূর্ণ আপ্যায়ন দেখে আমার মনে হয়েছিল আমি যেন আমার পরম আপনজনের কাছে এসেছি।

দরবারে নবাগত একজন সাধারন দর্শনার্থী হিসেবে তাঁর মোহনীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছিল। সেই থেকে তিনি আমার একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন। তারপর থেকে যখনি সুযোগ পেতাম তখনই তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত কিছু কালাম শোনার জন্য, দোয়া নেওয়ার জন্য তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম।

মা'জানের স্বর্গীয় সান্নিধ্যে থাকা আরেকটা দিন আমার জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।
আম্মা অসুস্থ হওয়ার বেশ কিছুদিন আগের কথা। আম্মা তখন দরবারে ছিলেন। আমি দরবার শরিফ জিয়ারতে গিয়ে যথারীতি ভিতর বাড়িতে আম্মার দোয়া নিতে গেলাম। সেদিন আশেক ভক্তের খুব বেশি ভিড় ছিল না। কয়েকজন সেবিকা সহ তিনি একাই ছিলেন। সেদিন আম্মাজানের সান্নিধ্যে একান্ত কিছু সময় কাটানোর সৌভাগ্য আমার নসিব হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ্।

সেদিন আম্মাজান আমাকে তাঁর কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রেখে দিলেন। পাশে বসিয়ে পরম আদরে অনেক কিছু খাওয়ালেন। অনেক বিষয়ে আলাপ করলেন।

আলাপকালে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যে, তিনি একজন সাধারণ গৃহবধূ নন, তাঁর চিন্তাভাবনা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

তিনি সমাজ নিয়ে, দেশ নিয়ে, দেশের মানুষ জনের সমস্যা এবং এর সমাধান নিয়ে সুগভীর চিন্তা করেন অর্থাৎ তিনি দেশ-বিদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যাপারে বেশ সচেতন ও সুঅভিজ্ঞ।

কত বড় মাপের মানুষ হলে অন্দরমহলে থেকেও জনমানুষের জন্য এমন সুদুরপ্রসারী ও কল্যাণকামী চিন্তা করা সম্ভব!

এরপরও অনেক অনেক বার শ্রদ্ধেয় মা'জানের সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু ওই দিনটির কথা আমি কখনোই ভুলবো না।

আম্মার প্রথম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে "স্মারক গ্রন্থ" প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পাক দরবারে লাখো কোটি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

স্মারকগ্রন্থের জন্য লেখা সংগ্রহ করতে গিয়ে আম্মাজান সম্পর্কে পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, ভক্তকূল, সেবিকাবৃন্দ ও অন্যান্যরা আম্মার জীবনের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন, যেই দিকগুলো আমাদের অনেকের অজানা ছিল, তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবার অনেক লেখা পড়তে গিয়ে চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে বারবার। সত্যিই আমরা আমাদের পরম আপন জনকে হারিয়ে ফেলেছি। মা'জান শুধুমাত্র বড়দের কথা চিন্তা করতেন তা কিন্তু নয়, ছোটদেরকেও তিনি অনেক স্নেহ করতেন।

তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের মতই সেবিকা ও তাদের সন্তানদেরও স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়েছেন সাথে সাথে শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা ইত্যাদি শিখিয়েছেন। সেবিকারা অনেকেই আলাদা আলাদা সাক্ষাৎকারে মা জানের স্মৃতিকথাগুলো তুলে ধরেছেন।

আর একটা ব্যাপার আমাকে খুবই বিস্মিত করে সেটা হচ্ছে আম্মার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলে, যদি জিজ্ঞেস করতাম আম্মা কেমন আছেন? তখন আম্মা মিষ্টি হেসে উত্তর দিতেন, খুব ভালো আছি। অথচ আমরা জানি আম্মা খুবই অসুস্থ কিন্তু সবসময় হাসিমুখে বলতেন, আমার কোনো অসুখ নেই, আমি ভালো আছি।

আসলে আম্মা নিজের সমস্যাকে কখনো সমস্যা বলে মনে করতেন না বরঞ্চ আত্মীয় স্বজন, ভক্তবৃন্দের সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তিত ও ব্যথিত হতেন। এমনই বড় মনের অধিকারিণী ছিলেন আমাদের মা'জান।

যখনই আম্মার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতো আমি, "আলোর পথে" ও "দি মেসেজ" মহিলা মাহ্‌ফিলের বিভিন্ন কার্যক্রম এর ব্যাপারে আলাপ করতাম। আম্মাজান মাহ্‌ফিলকে আরো যুগোপযোগী ও ফলপ্রসু করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিতেন।

আম্মা একবার "দি মেসেজ" এর মাহ্‌ফিলে তাশরিফ নিয়েছিলেন। "আলোর পথে" ও "দি মেসেজ" এর ঘরোয়া মাহফিল আয়োজন করার সুদূর প্রসারী চিন্তাটা আম্মাই করেছিলেন।

ঘরোয়া মাহ্‌ফিলগুলো এখন পুরো চট্টগ্রাম শহরে এবং বিভিন্ন থানা ও উপজেলাতে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

শুধু আমি একা নই, দরবার শরিফে আগত তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আশেক-ভক্ত-জায়েরিনদের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের কাছে আম্মাজানের দয়াশীলতা, মহানুভবতা, পরোপকারিতা, মানব কল্যাণ চিন্তা, এই ধরনের অনেক অনেক মহান গুণাবলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

মহান রাব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে ফরিয়াদ করছি, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর উসিলায় আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের মহীয়সী আম্মাজানের চরিত্রের মহান গুণাবলীগুলো চর্চা করতে পারি ও সে অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিচালিত করে দেশ ও দশের মঙ্গলে কিছু কাজ করতে পারি।

এই মমতাময়ী মায়ের ছায়া যেন আমাদের উপর কেয়ামত তক্ জারি থাকে, আমাদের প্রাণপ্রতিম মুর্শিদ রাহবারে আলম মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র অমীয়বাণী দৃঢ়ভাবে বুকে ধারণ করে আমাদের মমতাময়ী মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা যেন উভয় জাহানে কামিয়াব হতে পারি, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেটাই ফরিয়াদ করছি। আমীন। সুম্মা আমীন।

শাহিনা আখতার
পরিচালক
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও
জ্ঞানানুশীলনমূলক প্রতিষ্ঠান "আলোর পথে"
সিনিয়র শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)
চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

চিনবনা কেন? তুমি মুক্তার মা

আমি ছোটবেলা থেকেই মাইজভাণ্ডার শরিফ যাই। আমাদের পরিবারের সবাই মাইজভাণ্ডারের আশেকান ছিলেন। ১৯৯৭ সালে পটিয়ার জাফর মামার মাধ্যমে আমি প্রথম হক মন্‌জিল যাই। মামা আমাকে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) এর সম্মানিতা সহধর্মিনী উম্মুল আশেকীন আলহাজ মুনাওয়ারা বেগম আমাদের প্রাণপ্রিয় আম্মাজানের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন। ২২শে চৈত্র বাবাভাণ্ডারী কেবলা কাবার উরস শরিফের সময় আমি চারদিন মাইজভাণ্ডার শরিফ অবস্থান করি। আম্মাজান ভিতরবাড়ির মহিলাদের নির্দেশ দেন আমাকেও তাদের সাথে রাখার জন্য।

আম্মাজান অনেক দয়াশীল ও কোমল মনের মানুষ ছিলেন। তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফে আগত সকল আশেকান মা-বোনদের খাওয়া-দাওয়া, মেহমানদারী, সকল কিছুর প্রতি সর্বদা সজাগ ছিলেন। আম্মাজান এর সাথে কেউ সাক্ষাত করতে গেলে না খাইয়ে কাউকে বাড়ি ফিরতে দিতেন না।

সর্বদা দায়িত্বরত মহিলাদের নির্দেশ দিতেন কেউ যেন তাবার্‌রুক না খেয়ে না যায়। যখন যাকিছু খাবার থাকত তাই আশেকানদের বণ্টন করে দিতেন। তাঁর মায়া মমতায় আকৃষ্ট হয়ে সকলেই আম্মাজানের কাছে হাজির হতেন। তিনি হলেন প্রেম ভালবাসার মূর্তপ্রতীক।

একদিন দরবারে খেদমত করতে গিয়ে বৃষ্টির কারণে আমার পুরো শরীর ভিজে যায়, আম্মাজান আমাকে দেখামাত্রই আলমারি থেকে তাঁর একটি কাপড় পরিধানের জন্য দিলেন।

আম্মাজান এতটাই মহৎ, হৃদয়বান ছিলেন যে, আওলাদে রাসূল (দঃ) বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী'র সম্মানিতা সহধর্মিনী, রাহবারে আলম শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মওলা মাইজভাণ্ডারী (মঃ)'র শ্রদ্ধেয় আম্মাজান, এত আশেকান ভক্তগণ প্রেমমগ্ন হয়ে দিনরাত তাঁর খেদমত এ নিয়োজিত থাকতে চাই, এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েও আম্মাজানের তুচ্ছ পরিমাণ আত্মাভিমান ছিল না।

করোনাকালীন পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় সতর্কীকরণ অবলম্বনের ফলে আম্মাজানের সঙ্গে সাক্ষাত করা থেকে বিরত রাখা হয়, সে সময়েও আশেকানরা একপলক দেখার আশায় দরবারে ছুটে যেত। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে আম্মাজানকে দেখেছিলাম। আম্মাজানও আমাদের সঙ্গে কুশলাদি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। দায়িত্বরত মহিলাদের বলেছিলেন "আমাকে ওদের সঙ্গে দেখা করতে দাও। ওরা দুরদূরান্ত থেকে আমার কাছে এসেছে। ওদেরকে আমার কাছে আসতে দাও"। আম্মাজান এতটাই স্নেহার্দ ছিলেন করোনা পরিস্থিতিকেও উপেক্ষা করে সকলের দুঃখকষ্টের আরজি শুনতে চাইতেন।

আমার স্বামী অসুস্থ হলে আমি আম্মাজানকে বলি; আম্মা আমার স্বামী অনেক অসুস্থ। আমি উরস শরিফে কিভাবে হাজির হব। আম্মাজান বললেন "আল্লাহ্ ভরসা। আল্লাহ্ যেটা চান সেটাই হবে। আল্লাহ্ যদি তোমাকে আনেন তুমি আসতে পারবে।" আম্মাজান এর কালাম মোবারক আমার কাছে কিছুটা রহস্যময় মনে হয়েছিল, তার বেশ কিছুদিন পর আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। সেইদিন বুঝতে পেরেছিলাম আম্মাজান এমন কথা কেন বলেছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় আম্মাজান বেলায়তি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আশেকানের মনোবাসনা দেখামাত্রই বুঝতে পারতেন।

আম্মাজান সাংসারিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। গৃহের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকতে চাইতেন। অবসর সময়ে বিভিন্ন পিঠাপুলি বানাতেন। নিজ হাতে সকলকে পিঠা বানানো শিখাতেন। সবার সঙ্গে বসে নক্‌শিকাঁথা সেলাই করতেন। মহিলাদের সবসময়ই গৃহের কাজের নির্দেশ দিতেন। আত্মীয়তা রক্ষার্থে সজাগ ছিলেন। আশেকানদের নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন। কখনও খালি হাতে ফিরতে দিতেন না। আম্মাজান এর কাছে গেলে মনে হত নিজের বাপের বাড়িতে এসেছি। সবসময় তাবার্‌রুক খেয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করতেন।

আম্মাজান কখনও খাবার অপচয় করতে দিতেন না। একদিন দেখলাম অনেকগুলো পান্তাভাত পড়ে আছে, কেউ খেতে চাইছে না। আম্মা বললেন, "আমাকে পান্তাভাত দাও। আমি মরিচ দিয়ে খাব।" আম্মাজান খাবার পর সকলে মিলে তাবার্‌রুক এর ন্যায় ভাতগুলো মুহূর্তের মধ্যেই খেয়ে শেষ করল।

আম্মাজান খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। গ্রামীণ পিঠা অনেক পছন্দ করতেন।

শেষ দেখার সময় আম্মাজান অনেক অসুস্থ ছিলেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, আম্মাজান আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের কবুল করে নেবেন। আম্মাজান বলেন, "চিনব না কেন, তুমি মুক্তার মা, বশর কোম্পানির বৌ আরকি। তোমরা আমার মেয়ে। তোমাদের কোন ভুল নেই। ক্ষমা কিসের, আমি সকলকে আওয়াল আখেরে কবুল করে নিয়েছি।" আম্মাজানের এই শেষ উক্তি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

খুরশিদা বেগম
স্বামী- মরহুম আবুল বশর কোম্পানী
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম

তোমার কিছু হবে না
আল্লাহ্ রহমত করুন

১৯৯৮ সালে আমি দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিলাম। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে, আমাকে বাঁচানো সম্ভব হবেনা বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে, মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে চরম হতাশার মধ্যে ছিলাম। এমতাবস্থায় জাফর মামা আমাকে মাইজভাণ্ডার শরিফ যাওয়ার জন্য বলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে মাইজভাণ্ডার নিয়ে আসেন এবং বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সম্মানিত সহধর্মিনী, উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম আমাদের প্রাণপ্রিয় আম্মাজান এর সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন।

আম্মাজান আমাকে দেখে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিলেন এবং পরম স্নেহের সাথে আমার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তখন অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে আমার দূরারোগ্য রোগের কথা জানাই। আম্মাজান শুনামাত্রই বলেছিলেন, "তোমার কিছু হবে না। আল্লাহ্ রহমত করুন। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ্"। এই বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আম্মাজান এর পবিত্র কালাম মুবারক আমার অন্তরকে উৎফুল্ল করে দিল, বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পেয়ে স্বস্তি পেয়েছিলাম। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত ও মেহেরবানীতে এবং আম্মাজানের দোয়া বরকতে এখন আমি পরিপূর্ণ সুস্থ। আলহামদুলিল্লাহ্। সেইদিন থেকে আমি মাইজভাণ্ডারীর কদমে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম।

২০১১ সালে পারিবারিক জটিলতা ও শত্রুতার কারণে আমার নিজবাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হই। এরপর দিশেহারা হয়ে আবাসস্থল ফিরে পাবার আশায় আম্মাজান এর কাছে দোয়া চাইতাম। তিনি আমাকে সবসময় বলতেন, "ধৈর্য্য ধর"। আল্লাহ্র রহমতে সব ঠিক হয়ে যাবে, তোমার ঘর তুমি ফিরে পাবে।" এরূপ সান্ত্বনা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। অতঃপর ২০১২ সালে আল্লাহ্র কৃপায়, বাবাজান এর মেহেরবানী ও আম্মাজানের দোয়ায় আমি বাড়িটা পুনরায় কিনে নিতে সক্ষম হই। আলহামদুলিল্লাহ্।

আম্মাজান অতুলনীয় দয়ার অধিকারী। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও দয়ার মহিমা আমার জীবনকে সুসজ্জিতভাবে সাজিয়ে তুলেছে। বাবাজানের সকল আশেকান ভক্তদের তিনি যথাযথ মেহমানদারি করানোর নির্দেশ দিতেন। সকলের দুঃখ দূর্দশার কথা

তিনি গুরুত্বসহকারে শুনতেন। ধৈর্যের সাথে সকল আশেকান মা-বোনদের সাথে সাক্ষাত করতেন। সকলকে নিজ অবস্থান থেকে পরিস্থিতির মোকাবেলায় সঠিক পথ প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন এবং দোয়া করতেন। আম্মাজানের দোয়া বরকতে অনেকেই বিভিন্ন সমস্যা হতে পরিত্রাণ পেয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন এর উদ্দেশ্যে আম্মাজানের সংস্পর্শে আসেন। যা আমি নিজ স্বচক্ষে দেখায় আম্মাজানের প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আরো বেড়ে যায়।

আমার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আসলে, আমি প্রতিবারের ন্যায় এবারও আম্মাজানের কাছে আরজি পেশ করি। বললাম, আম্মা আমার মেয়ের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে সেটা আমার পছন্দ নয়, আমি ইউরোপে বসবাসকারী বাঙালি সুপাত্রের কাছে মেয়েকে বিবাহ দিতে চাই, এটা আমার অনেক বড় আশা। যাতে করে আমার মেয়ে বিদেশে বসবাস করতে পারে এবং সুখী হয়। আম্মাজান বললেন, "আমার নাতিনকে বিয়ে দিবে নাকি, অসুবিধা নেই, তোমার বাড়ির আশেপাশে বিবাহ হয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ্। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে এক সপ্তাহের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে"। আম্মাজান এর পবিত্র কালাম শুনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি, হঠাৎ এরূপ আধ্যাত্মিক উক্তি ও নির্দিষ্ট সময়সীমার কথা শুনে হতবাক হয়ে বাড়ি ফিরে আসি এবং মনে মনে অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ি। সারারাত আম্মাজানের কথাটি স্মরণ করছিলাম। মনের মধ্যে অনেক কৌতুহল জমে উঠেছিল।

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর এক ভদ্রলোক আমার বাসায় আসেন, আমাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তিনি এসেছেন। ভদ্রলোক বললেন, আপনার মেয়ের জন্য আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। পাত্র আমেরিকায় বসবাস করে। বিভিন্ন কথোপকথন ও পারিবারিক আলাপ আলোচনার সাপেক্ষে দুই পক্ষের সন্তুষ্টির আলোকে আল্লাহ্র রহমতে সেই সপ্তাহেই আমার মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। পরের দিন আমি মাইজভাণ্ডারে ছুটে যাই এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে আম্মাজানের কদমে বসে সবকিছু বলি। আম্মাজান আমার কথা শুনছিলেন আর হাসছিলেন। আম্মাজান আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কারামত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উম্মুল আশেকীন শ্রদ্ধেয় আম্মাজান অনেক দয়াশীল ও কোমল মনের অধিকারী ছিলেন।

নারগিস বেগম
হাজী সালাম ফকির বাড়ি
বলিরহাট, খাজারোড
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

এক স্বর্গীয় নারীর পবিত্র দর্শন লাভের পরম সৌভাগ্যের ইতিকথা...

সময়টা ১৯৯৯ সাল। দিনটা ছিল মে মাসের ১ তারিখ। সবেমাত্র জীবনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে পারি দিলাম। ৩০ এপ্রিল আমি আমার স্বামী মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রিয় পর্ষদ-এর সদস্য এম মাকসুদুর রহমান চৌধুরী হাসনু'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। প্রতিটি নারী-পুরুষের জন্য-এ এক মাহেন্দ্রক্ষণ। তাইতো সময়টাকে ইতিহাসে সাক্ষী করে রাখার জন্য আমার স্বামী আমাকে নিয়ে রওনা হলেন পবিত্র ভূমি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের উদ্দেশ্যে। আমি একটু আশ্চর্য হলাম! বিবাহ পরবর্তী সময়ে মানুষ ঘুরতে যায় বিনোদন স্পটে, পার্কে, রেস্টুরেন্টে, সমুদ্র সৈকতে অথচ তিনি আমাকে নিয়ে আসলেন দরবার শরিফ। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও আমার কাছে ভালো লেগেছে।

মাইজভাণ্ডার দরবার নিয়ে পূর্বে তেমন জানা না থাকলেও শ্রদ্ধা সব সময়ই ছিল। যদিও আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন এ মহান দরবারের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল আশেক। বিশেষ করে আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি এ দরবারে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন, সে সুবাদে আমার স্বামীও দরবারমুখি হয় আলহামদুলিল্লাহ্।

সেদিন সকাল ১০টায় আমরা দরবার শরিফে আগমন করি। এসেই আমার স্বামী আমাকে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের মহিলাদের ভেতর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে গিয়ে মমতাময়ী আম্মাজান উম্মুল আশেকীন মোসাম্মৎ মুনওয়ারা বেগম (রহঃ) এর পরম সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। আমার জীবনের স্মরণীয় একটি দিন হয়ে থাকবে এই ১লা মে।

প্রথম দর্শনের অনুভূতি: এইকি দেখলাম আমি!!! এতো মায়াবী, এতো মায়া লাগানো নজর কাড়া অপরূপ সুন্দর মানুষ বুঝি পৃথিবীতে আছে?

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মা'কে দেখছি। আহা! কত পবিত্র তাঁর চাহনী, নূরের একটি টুকরো যেন আমারই সামনে ঝলমল করছে। সুবাহানআল্লাহ্। এতো ভাল লাগা পবিত্র মুখখানি দেখার ইচ্ছে যেন শেষই হয় না। আমার অবাক লেগেছে মমতাময়ী আম্মাজান আমাকে দেখেই 'মা' বলে সম্বোধন করেছে। পরম যত্নে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'মা' কোথা থেকে আসছেন? কখন আসলেন? বাসার

সবাই ভাল আছেতো? কিছু কি খেয়েছেন? ইত্যাদি। মমতাময়ী আম্মাজানের প্রথম দর্শনেই আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাই। মায়ের প্রতি কি মায়াবী টান আমার ভেতর কাজ করতো। তাঁর এমন আতিথেয়তাপূর্ণ কথার মায়ায় পড়লাম। এরপর থেকেই পর্দা করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মমতাময়ী মায়ের সান্নিধ্যে থাকার ও গোলামী করার এক স্বর্গীয় সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

তাঁর স্বামী বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) দুনিয়ার ভাব-বিভোরতা ত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে বেশি মনোযোগী হওয়ায় আম্মাজানকে একাই সংগ্রাম করে জীবন চালাতে হয়। ৫ কন্যা আর এক পুত্রকে তিনি উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নীতি নৈতিকতার শিক্ষার আদর্শ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলেছেন। আজকের প্রতিষ্ঠিত গাউসিয়া হক মন্‌জিলের মূল কারিগরের ভূমিকায় ছিলেন আম্মাজান। শাহানশাহ্ বাবাজানের দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর দীর্ঘ সময় তিনি একা একা সন্তান লালন পালন, দরবারের বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করেছেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বুকে আগলে রেখেছেন। কঠিন সময়েও দৃঢ়তা সহকারে এগিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমান আম্মাজান (বাবাজান মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী'র পবিত্র সহধর্মিনী) এর সাথে বড় আম্মাজানের 'মা-মেয়ের' সম্পর্ক ছিল। একজন শ্বাশুড়ি আর বউয়ের এমন সুন্দর সম্পর্ক নজিরবিহীন। মায়ের সাথে ছায়ার মত সব সময় বর্তমান আম্মা পাশে থাকতেন। বর্তমান আম্মা প্রায়শঃ কথার ছলে বলতেন, আমি আম্মাজানের কাছে অনেক আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা পেয়েছি, কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করে পরিস্থিতি সামাল দেয়া, সব সময় মুনিবের উপর ভরসা রাখার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন। তিনি আরো বলেছেন, আম্মাজান যদিও দরবার শরিফেই তার জীবন চালিয়েছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন আধুনিক ও যুগোপযোগী চিন্তাধারার এক শক্তিমান নারী। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব খবরা খবর তিনি রাখতেন, নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমদের খবর শুনে তিনি কষ্ট পেতেন, আর আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের জন্য দোয়া করতেন। মায়ের বিদায়ের পর যখনি মায়ের কথা আসতো বা আমরা মাকে নিয়ে কিছু বলতাম, তখন দেখেছি বর্তমান আম্মার চোখ ছলছল করতে।

লক্ষ আশেকের আম্মাজান এর শূন্যতা জানি পূরণ হবার নয়, এরপরেও আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস বর্তমান আম্মাজান লক্ষ আশেকের অন্তরে ঠাঁই করে নিয়ে আম্মার রেখে যাওয়া দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করবেন। আমরা সে গুণ আর আদর্শ বর্তমান আম্মার কাছে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ্, আম্মাজান পর্দা করার আগে এমন একজন গুণবতী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নারী সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ইনশাহআল্লাহ্, তিনি হবেন আম্মাজানের আদর্শিক প্রতিচ্ছবি এবং আশেকানদের ভরসার কেন্দ্রস্থল।

নীরবে দান করা ছিল নিত্যদিনের কাজঃ মমতাময়ী মায়ের কাছে অনেক গরীব অসহায় মহিলা আশেকান এসে তাদের অসহায়ত্বের কথা বলতেন, তাদের এ অভাব অনটনের কথা শুনে মা মন খারাপ করতেন, আফসোস করে তাদের সান্ত্বনা দিতেন, তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য দোয়া করতে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে পরামর্শ দিতেন। এই সময় তিনি তাদের প্রত্যেককে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। এভাবে তিনি অকাতরে অসহায় মানুষের মাঝে টাকা বিলিয়ে দিতেন। যেমনটা স্বামী করেছিলেন ভক্তের প্রয়োজনে। তিনি টাকা ছুঁড়ে দিতেন নদীর দিকে, সে টাকা ঐ ভক্তের কাছে গিয়ে পড়তো যে ভক্ত কিছুক্ষণ আগেও টাকার জন্য হাহাকার করছিলেন। রাহবারে আলম মওলা হুজুর হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)ও একই ধারায় বহমান একজন আদর্শিক প্রতিনিধি। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট এর মাধ্যমে তিনি কোটি কোটি টাকা অসহায় মানবতার কল্যাণে ব্যয় করছেন।

লক্ষ আশেকের পরম মমতাময়ী মায়ের বিদায়ঃ পৃথিবীতে জন্মালে বিদায় নিতেই হবে। পরম স্রষ্টার দরবার হতে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এই নিয়মই চলে আসছে। তাইতো লক্ষ আশেকের করুণ আর্তনাদ, সন্তানদের গগণবিদারী চিৎকার কিম্বা চিকিৎসকের শত চেষ্টা সত্বেও পরম প্রভূর মহামিলনের ডাকে সাড়া দিয়ে আম্মাজান দুনিয়া থেকে পর্দা করলেন। আশেকদের জন্য এক বেদানাবিধূর দিন ৬ অক্টোবর।

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের অন্দরমহলের মধ্যমনি, যাকে এক নজর দেখার জন্য মহিলারা শত বিড়ম্বনা সহ্য করে লাইনে দাঁড়াতেন। মাকে এক পলক দেখে মনের প্রশান্তি খুঁজে পেতেন, যার কাছে জীবনের সব কথা মন খুলে বলা যেত,

যে মা সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সেই অভিভাবক তুল্য মায়ের পর্দার খবর শুনে আশেকদের হৃদয়ে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। চারদিকে কান্না। বুক ফাটা আর্তনাদ আর চীৎকারে আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে। শোকে স্তব্ধ তাঁর পাশে থাকা খাদেমগণ, চারিদিকে কি এক হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে তা বলে বুঝানো যাবে না। কোন এক প্রিয় মানুষের বিদায়েও এমন কান্নার দৃশ্য চোখে পড়েনি, যেমনটা মায়ের বিদায়ে দেখা গেছে। প্রকৃতি আর আশেক শোকে একীভূত হয়ে গিয়েছে। ৬ অক্টোবর রাতে চট্টগ্রামসহ সারা দেশে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সেদিন লক্ষ লক্ষ আশেকানদের সাথে প্রকৃতিও বুঝি অঝোরে কেঁদেছিলো?

পরমাত্মার সাথে মহামিলনঃ জানাযা শরিফ শেষে আম্মাজানকে তাঁর পরমাত্মা, তাঁর স্বামী বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর রওজার ঠিক পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার যেন সব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। প্রকৃতি যেন এই পরমাত্মার মিলন দেখতেই দীর্ঘ ৩৩ বছর অপেক্ষা করছিলো। পবিত্র দাফন শেষে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় দুই পরমাত্মার পবিত্র রওজা শরিফ, পরমাত্মার মিলনে তৈরী হল এক স্বর্গীয় প্রেম বাগান। মহান স্রষ্টা বলেন: যাঁরা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, যা তোমরা উপলব্ধি করতে পারোনা। [আল-বাক্বারাহ্ ১৫৪]

'রাব্বুল আলামিন'! আপনি আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবতার কল্যাণে যিনি বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছেন রাহবারে আলম মওলা হুজুর হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম.) ও উম্মুল আশেকীন মা মুনওয়ারা বেগম এর মতো মহীয়সী ব্যক্তিত্বকে দেখার ও তাঁর কাছে যাবার এবং তাঁর খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। যারা আপনার সংজ্ঞা ও সূত্র অনুযায়ী পরিপূর্ণ প্রকৃত মানুষ এবং আপনার প্রতিনিধিত্বের যথার্থ গুণ সম্পন্ন। আমি এ জন্য বার বার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এটাই আমার পার্থিব জীবনের পরম প্রাপ্তি।"

আলহামদুলিল্লাহ্।

নাসিমা হাসনু
সদস্য
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন
মহিলা সংগঠন 'দি মেসেজ'

আমার প্রাণের প্রিয় "মা'জান"

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম। বিশ্ব অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সহধর্মিনী এবং রাহ্বারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)-এর সম্মানিত আম্মাজান। সুবহানআল্লাহ্। তিনি একজন মহান অলির সহধর্মিনী এবং একজন মহান অলির আম্মাজান। নিঃসন্দেহে তিনি এই যুগের রাবেয়া বসরী।

তিনিই আমার মা জান, যাকে আমি দীর্ঘ বহু বছর মা ডেকে ধন্য হয়েছি। যাকে হারিয়ে আজ আমি শূন্যতা অনুভব করছি। মনে হয় যেন আমার মাঝে এই আমি আর নেই। এই শূন্যতা আর কখনও পূর্ণ হবার নয়।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে হজ্বব্রত পালনকালে মা'জান এবং রাহ্বারে আলম মাওলা হযরত এর সান্নিধ্য, সাহচর্য আমার জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

এই জীবনে চলার পথে অনেক গুনী জ্ঞানী রমনীদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তাঁরা কেউই আমার মা জানের ধারে কাছেও নয়। উম্মুল আশেকীন আমার মা জান যুগ যুগ ধরে আপন স্বামী, (জিয়া বাবা যিনি মজ্‌জুব এ সালেক অলি ছিলেন) ছয়জন সন্তান, পরিবার, সমাজ, হাজারো আত্মীয় স্বজন ও দরবারের লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরিদানের আরজি শুনে অতি মমতায় মায়ার হাত বুলিয়ে, পবিত্র দরবারকে যেভাবে পরিচালনা করেছেন তা এক নজিরবিহীন ত্যাগ সাধনা যা আর কারো মাঝে দেখিনি। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর থেকেই আমি শিখেছি কিভাবে আল্লাহ্‌র নবীর প্রেমে বিলীন হওয়া যায়, কিভাবে স্বামীর খেদমত করতে হয়, কিভাবে আপন সন্তানদের সুশিক্ষিত করতে হয়। কিভাবে ধৈর্য্য সবরে সংসার ধর্ম পালন করা যায়।

আমি মনে করি আমরা যারা মা'জানের সান্নিধ্য পেয়েছি, তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, জেনেছি, তাঁর নূরানী কর্মকান্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আপন আপন জীবন ও সংসারকে সাজাই, তাহলে কামিয়াবী ইনশাআল্লাহ্ আমাদের জীবনেও আসবে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমার মা'জানকে জান্নাতের উঁচু মকাম দান করুন এবং তাঁর উসিলায় সকলের হাজত মকসুদ পূরণ করুন। আমীন। সুম্মা আমিন।

সায়েলা খান
সদস্য, 'দি মেসেজ'

একটু নিয়ম মেনে চলো : ঠাণ্ডা এড়িয়ে চলবে

আজ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে লিখতে বসেছি। মহান রাব্বুল আলামিন এর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, আমার মত একজন পাপী বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকত পেয়েছি এবং উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম আম্মাজান এবর ফয়েজ বরকত ও স্নেহ ভালোবাসা আমার নসিব হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বলার ও লিখার কোন যোগ্যতাই আমার নেই। কিন্তু কিছু স্মৃতি ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য আজ কলম হাতে নিয়েছি। মহান রাব্বুল আলামিনের দয়ায় এবং হুজুর পুরনূর সরকারে দো আলম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.), বিশ্বঅলি হাযরত রাওয়া মুশকিল কোশা ফানাফিল্লাহ্ বাকাবিল্লাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী সহ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সকল আওলাদে পাকের উসিলায় আমার এই প্রয়াসটুকু যেন কবুল হয়। আমিন।

আমি খুব ছোটবেলা থেকে পরিবারের বড়দের সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে যাওয়া-আসা করতাম। সাল বা তারিখ নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। আমার নানাবাড়ির আত্মীয়রা গাউসিয়া রহমান মন্জিলে তথা হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ওয়ারিশগণের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন এবং বাবা বাড়ির সবাই সাধারণত গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিলে হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ওয়ারিশগণের সাথে সম্পর্ক বা দরবারে গেলে তাঁদের সাক্ষাতে যেতেন। এইভাবে মাঝে মধ্যে উরস শরিফে বা বিভিন্ন নিয়ত, মানতের উদ্দেশ্যে আমারও যাওয়া হতো। কিন্তু আমার বয়স যখন ১৫/১৬ বছর তখন থেকে আমি গাউসিয়া হক মন্জিলে আমার বাবা-মার সাথে যেতাম। আজ পর্যন্ত আমি আর কোনো মন্জিলে যিয়ারত ছাড়া কোন কারণে বা বায়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাইনি।

১৯৯৮ সালে আমি তখন এইচ এস সি'র ছাত্রী। আমার ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তারি (এমবিবিএস) পড়বো। তাই সর্বপ্রথম আমার বুদ্ধি হবার পর আমি শ্রদ্ধেয় আম্মাজান উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর কাছে যাই। প্রথম দেখাতে তাঁর সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহ আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি যখন তাঁকে বললাম, মা'জান আমি ১৯৯৯ সালে এইচ এস সি পরীক্ষা দিব,

আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে প্রথম বিভাগে পাশ করতে পারি এবং ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছার কথা জানালাম। তারপর তাঁর স্নেহমাখা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দোয়া করলেন। এমনভাবে কথা বললেন আমি ও আমার আম্মা যেন তাঁর অনেক আপন। ঐ সময়ে ভিতরে থাকতেন অর্থাৎ আম্মাজানের সেবা করতেন (জানু খালাকে) এমন একজন মহিলাকে আমাদের তাবার্‌রুক খেতে দিতে বললেন এবং আম্মাজানের সাথে কথা বলে আমাদের মনে এতো প্রশান্তি লাগলো তা বলে বুঝানো যাবে না। তারপর আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তাবার্‌রুক খেলাম। এইভাবে তাঁর সাথে যতবার সাক্ষাৎ করেছি বিভিন্ন আবেদন করেছি তিনি কান পেতে শুনতেন এবং এমনভাবে আমাকে বুঝ দিতেন যাতে মুহূর্তে আমার মনটা হালকা হয়ে যেত। এমন এক মমতাময়ী মা'জান ছিলেন, জীবনের সব কষ্টের কথা তাঁর কাছে অকপটে বলা যেত।

এরপর ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তারিখটা ঠিক মনে নেই। আমি দরবারে ভিতরের বাড়িতে থাকার জন্য আম্মাজানের কাছে অনুমতি চাইলাম, তখন আমার মা উম্মুল আশেকীন মা হযরত মুনাওয়ারা বেগম এর কাছে বললেন, আম্মাজান আমার মেয়ে আপনার কাছে কয়েকদিন থাকতে চাইছে, থাকতে পারবে?

তখন মা'জান হেসে বললেন, কেন পারবে না? তোমার মেয়ে এখানে থাকবে অসুবিধা কি? আমার মা আমাকে দরবারে রেখে শহরে চলে গেলেন। তখন মা'জান আমাকে একটা রুমে থাকতে বললেন, বর্তমান যে রুমটায় মা'জানের গোসল শরিফ দেওয়া হয়েছে এবং পাশের রুমটা শাহ্‌জাদীদের জন্য রুম বানানো হয়েছে। ভক্ত-আশেকগণ এখন আর ঐ কক্ষগুলো ব্যবহার করতে পারেন না। আমাকে যে খাটে শোবার বা ঘুমানোর অনুমতি দিলেন পরে জানতে পারলাম আমার প্রাণপ্রিয় মুরশিদ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই খাট ব্যবহার করেছিলেন – শোকর আলহামদুলিল্লাহ্।
আম্মাজান আমাকে রাতে দেখতে আসেন এবং জানুকে বললেন, ওকে একটু দেখবে। ঐ রাতে আমার এমন ঘুম হলো যেনো মায়ের কোলে ঘুমিয়েছি। তারপর ফজরের আযানের শব্দে ঘুম ভাঙলো। আম্মাজান খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করে রওজা শরিফের পিছনের দরজা দিয়ে বাবাজানের রওজা

শরিফে প্রবেশ করতেন এবং অনেকক্ষণ সময় তিনি সেখানে কাটাতেন। সকাল ৬/৭টার দিকে নাশ্‌তা করতেন।

আমার দরবারে থাকার উদ্দেশ্য হলো তাঁর কিছু খেদমত করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আম্মা আপনাকে নাশ্‌তা দিই? তখন যারা সেবিকা ছিলেন তাদের সাহায্যে আম্মার কিছু সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়। আমি ৪/৫ দিন ছিলাম। তো একদিন সকালে তিনি আমাকে বললেন, আমাকে পাউরুটিগুলো গরম করে দিতে পারবে? আমি তাঁর কথামতো তা গরম করে দিয়েছিলাম।

এভাবে যতবার আমি তাঁর কাছে গিয়েছি ততবার ভিতর বাড়িতে কাছে কেউ না থাকলে নিজে উঠে আমাকে ফলমূল বা যে কোন তাবার্‌রুক হাতে দিতেন। রান্নাঘরে আসতেন সবকিছুর খোঁজখবর নিতেন। একজন আদর্শ গৃহিনীর সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিলো। তিনি অবসরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যারা দরবারের খেদমত করতো তাদের দিয়ে সেলাই কাজ (চাদর, কাঁথা ইত্যাদি) করাতেন। দরবারে যেসব খাবার আসতো তা সুষ্ঠু বণ্টনের নির্দেশ দিতেন যাতে কোনো খাবার নষ্ট না হয়।

আমরা যখনই আমার সাক্ষাৎ শেষ করে রাহ্‌বারে আলম-এর সাথে দেখা করতে চাইতাম, আম্মাজান আমাদেরকে দেখা করার সুযোগ করে দিতেন। আরেকটি বিষয় আমার খুব ভালো লাগতো বাবাজান মওলা হুজুর (ম.) যখন দরবারে অবস্থান করতেন তখন আম্মাজান তাঁর খাবারের টেবিলে বসে থাকতেন পুত্রের জন্য পছন্দনীয় সব খাবার সাজিয়ে দিতেন বা দিতে নির্দেশ দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মওলা হুজুর বাড়ির ভিতরে না আসতেন আম্মাজান খাবার টেবিলেই বসে থাকতেন। একজন মায়ের সন্তানের প্রতি কেমন ভালোবাসা বা যত্ন সর্বোপরি সন্তান লালনপালনসহ সন্তান বড় হলে সন্তানের পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব সবকিছুই যেন আম্মাজান আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন তাঁর নিজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। দরবারে আগত আশেক-ভক্তগণ এবং আত্মীয়-স্বজন সবার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একই ছিল। বরং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মেহমানদের তিনি বেশি প্রাধান্য দিতেন।

আমার সবমসয় গলার ব্যথা, টন্‌সিলের ব্যথা থাকে। তো আমার বিয়ের কিছুদিন পর আমার স্বামী ডাক্তার দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন টন্‌সিলের অপারেশন করাবেন।

আমি ডাক্তারের পরামর্শ মতো সব টেস্ট করিয়ে অপারেশন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম। এর আগে দরবারে গেলাম আর আম্মাজানকে আমার সমস্যার কথা জানালাম। আম্মাজান আমাকে বললেন, "আমার হাসান-এরও গলা ব্যাথার সমস্যা আছে, তুমি একটু নিয়ম মেনে চলো যেমন– ঠাণ্ডা এড়িয়ে চলবে, গোসলের পর ভালো করে মাথার চুল মুছে ফেলবে। তিনি আর আমাকে অপারেশন করার অনুমতি বা ডাক্তারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলেন নি।

আমি পরবর্তীতে আমার সিদ্ধান্ত বদলালাম এবং আজ পর্যন্ত গলা ব্যাথার জন্য আমি তাঁর পরামর্শটা মেনে চলি এবং আরেকজন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন আসলে আমার টন্‌সিলের সমস্যা না, ঠাণ্ডা থেকে আমার গলার ইনফেকশন হয় এবং নাকের ভিতর একটু মাংস বেড়ে গেছে। খোদার রহমতে আমি এখনো নাকের এই সমস্যাটা অনুভব করিনা। অতিরিক্ত ঘাম বা ঠাণ্ডা হলে গলাব্যাথা অনুভব হয় যা ঔষধে সেরে যায়।

আমার দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ করার পর আম্মাজানের কাছে অনেকবার আর্জি পেশ করেছি যেন আল্লাহ্ আমাকে একটা পুত্র সন্তান দান করেন। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমার একজন পুত্র সন্তান হয়।

এছাড়া আমি বেশি আর্জি পেশ করতাম আমি যেন কিছু জায়গা ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় করতে পারি। কারণ আমার শ্বশুর বাড়ির ভিটা ছোট ছিল। সেই ইচ্ছাও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উসিলায় পূরণ করেন। আমি গোনাহ্‌গার মহান আল্লাহ্‌র অলির সংস্পর্শে এসে পরিচয় দিবার মত একটা অবস্থানে পৌঁছেছি যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আসলে একজন মানুষ কখন কোথায় কিভাবে কি কাজ করবে তা তার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়না। সবকিছু খোদা তায়ালার ইচ্ছাতেই হয়। আমরা অনর্থক এত বেশি দুঃশ্চিন্তা করি এবং নিজের জীবনকে কঠিন করে তুলি। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সপ্তপদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে পারলে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠে।

আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া তাঁর জীবনের শেষযাত্রায় কাফন শরিফে আমি পাপীর খেদমত করার সৌভাগ্য নসিব হয়। আম্মাজানের পবিত্র কাফনের কাপড় আমার হাতে ছিল, আমি অধম পবিত্র কাপড় বুকে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরিধানে সহায়তা করতে পেরে আমি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে

শুকরিয়া আদায় করছি। যাতে এই উসিলায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাকে শেষ বিচারের দিন ক্ষমা করে দেন।

পরিশেষে বলতে চাই, হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) আম্মাজান একজন উম্মুল আশেকীন, খোলাফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীনের আদর্শে গঠিত একজন মহীয়সী নারী, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সুযোগ্য খাদেমা ও স্ত্রী তাই তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুরশিদ রাহ্বারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ.)।

এড. শাহজাদী ইয়াসমিন মুক্তা
চট্টগ্রাম জজ কোর্ট
সিনিয়র সদস্য, 'আলোর পথে'

দু'চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে আসে

উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগমের কথা মনে হলে তাঁর দয়ার কথা মনে হলে আমার দু'চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়ে। আমার চাচাজান সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ্ (র.) ছিলেন হযরত শাহানশাহ্ বাবাজান সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র খলিফা। সেই সূত্রে ছোটবেলা থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফের সাথে আমার সম্পর্ক। শাহানশাহ্ বাবাজান যখন আহমদিয়া মন্‌জিল হতে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসেন, তখন থেকে আমার আম্মাজানের সাথে পরিচয় এবং ভিতর বাড়িতে অবাধ আসা-যাওয়া ছিল।
মেহমান আসলে তাদের চা-নাস্তা-খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। তাই আম্মাজানের সাথে আমার কথাবার্তা বেশি হতো। উরস শরিফের মহিলা মেহমানদের খাওয়ানোর দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আমি ছোট ছিলাম বিধায় আমাকে আপন ছেলের মত আদর-স্নেহ করতেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করতে করতে অনেক সময় দুপুরের খাওয়ার সময় অনেক দেরি হয়ে যেত আমার। আম্মাজান আমাকে নিজ হাতে কিছু না কিছু খাইয়ে দিতেন এবং বলতেন, কামরুল তুমি যদি কিছু না খাও মেহমানদের মেহমানদারী কি করে করবে?

২২শে চৈত্র বাবা ভাণ্ডারীর উরসের দিন মেহমানদারী করার সময় আম্মাজান আমাদের জন্য শরবত-নাস্তা পাঠিয়ে দিতেন। একদিন দরবারে থাকা অবস্থায় আমাকে হরিণে কামড়ায়। এতে আমার পায়ের উরু কেটে যায়, ৩টি সেলাই করা হয়। আমার জন্য আম্মাজান অস্থির হয়ে পড়েন। আম্মা আমার মাথায় হাত বুলাতে থাকেন এবং দেখলাম আম্মার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। আমি আম্মার চোখের পানি দেখে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। আমিও কাঁদতে লাগলাম।

আম্মা সবসময় ঔষধ ঠিকমত খাচ্ছি কি না খবরা খবর রাখতেন। আম্মা সবাইকে কিভাবে আপন করে নিতেন, তাঁর সান্নিধ্যে না গেলে বুঝা যাবেনা। কত বড় মনের মানুষ কেউ যদি কোন ভুল করে কাজের মধ্যে, তিনি খুব স্নেহ সহকারে বলতেন, 'বাবা তুমি এই কাজটি এইভাবে করলে ভাল হতো'। কখনো আম্মাজানকে রাগান্বিত হতে দেখিনি। উরস শরিফে সকল মহিলা মেহমান চা-

নাস্তা-তাবার্রুক পেয়েছেন কিনা খোঁজ খবর রাখতেন। আমাকে বলতেন, কামরুল দরবারের আশেক-ভক্তগণ অনেক দুর-দুরান্ত থেকে অনেক কষ্ট করে আসে। তাদের যেন খাওয়া-দাওয়ার কোনরূপ ক্রুটি না হয়। মুনিবের দরবারে এসেছে তাদের খেদমত করতে হবে।

আমি দেখেছি তিনি অনেক মহিলাকে টাকা/জিনিসপত্র দিতেন, আম্মাজানের কাছ থেকে কেউ কিছু না খেয়ে যেতে পারতো না।

আম্মাজানের কাছে কোন মহিলা মেয়ের বিবাহের জন্য টাকা চাইলে আম্মাজান সাধ্যমত টাকা-পয়সা দিতেন। শাহানশাহ্ বাবাজান যেমন মানুষের জন্যে করতেন, তাঁর সহধর্মিনীও তেমন অকাতরে দান করতেন। দরবারের আশেপাশে মহল্লার এমন কোন গরীব লোক নাই, যে আম্মাজানের নিকট থেকে সাহায্য পায়নি। তার প্রমাণ তাঁর ওফাতের দিন মহিলাদের আর্তনাদের ধ্বনি, আকাশে-বাতাসে গগণবিদারী কান্নার রোল। আম্মাজান মানুষের মনের মধ্যে এমন করে ঠাঁই করে নিয়েছেন যে, তাঁর ওফাতই তা প্রমাণ করে দিলো।

সৈয়দ কামরুল আহসান
বক্তপুর সৈয়দ বাড়ি
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

আম্মাজান উম্মুল আশেকীন

বহু মহীয়সী নারীর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কিত চারিত্রিক কাহিনী শুনেছি। ইতিহাস থেকে অনেক বুজুর্গ মহিলা সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু তা শোনা এবং পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের কাউকে দেখি নি। কিন্তু আজ যে মহীয়সী নারী সম্পর্কে বলবো, তা আমার চোখে দেখা স্পষ্ট বাস্তবতা। তিনি এক মমতাময়ী মা, যার কথাবার্তা, উপদেশ, আদেশ আমার দু'কানে এবং অন্তরে গেঁথে আছে। যে মমতাময়ী মা ৬ অক্টোবর ২০২১ সনে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়াবী সফর সমাপ্ত করেছেন।

সময়টা ২০১১ সাল, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ব্যতীত অন্য যে কোন একদিন হবে, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ যাই হোক আমি গাউসিয়া হক মন্‌জিলের ভিতর বাড়িতে এতিমখানার ছাত্রদের বিকালের নাস্তার জন্য গিয়েছিলাম। বলে রাখা ভাল 'উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা'র ছাত্রদের জন্য গাউসিয়া হক মন্‌জিল এর পক্ষ থেকে প্রতিদিন সকাল, দুপুর, রাতের খাবারের পাশাপাশি বিকালবেলা নাস্তার ব্যবস্থাও ছিল। সেদিন আমি অধম ভিতর বাড়িতে গিয়েছিলাম, মাদ্‌রাসার সকল ছাত্রদের বিকালের নাস্তার জন্য।

তখন ভিতর বাড়ির আপ্যায়ন বিভাগের দায়িত্বে ছিল কাঞ্চন নগর নিবাসী ঝিলু নামক এক মহিলা, যিনি এখনো বেঁচে আছেন। গিয়ে দেখি মেহমান ঘরে একটি সাদা কাঠের চেয়ারে মমতাময়ী আম্মাজান বসে আছেন। আশেপাশে আরো ৫/৬ মহিলা আশেক ভক্তও ছিল। আম্মাজানকে তাজিম করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলো, আম্মা এই ছেলেটা কামরুল ভাইয়ের ছেলে। এটা শোনার সাথে সাথে আম্মাজান মাথা নেড়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলে উঠলেন, বউ কেমন আছে? (মানে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন) উত্তরে আমি বললাম জ্বি আম্মা, ভালো আছেন।

বলে রাখা ভালো, ভদ্রমহিলাটি কামরুল ভাইয়ের ছেলে বলার সাথে সাথে আম্মাজান সহজে চিনে ফেলার কারণ হলো, আমার পিতা সৈয়দ কামরুল আহসান ছোটবেলা থেকে শাহ্ সুফি সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ (রহ.)'র মাধ্যমে শাহানশাহ্ বাবাজানের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তখনকার সময়ে আমার পিতা বয়সে ছোট থাকার কারণে দরবারের বিভিন্ন কাজেকর্মে ভিতর বাড়িতে আসা যাওয়া করতেন বিধায় আম্মাজান ভালোভাবেই চিনতেন।

আমাকে আম্মাজান আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন এসেছ? আমি উত্তরে বললাম মাদ্‌রাসার ছেলেদের বিকালের নাস্তার জন্য এসেছি। ঠিক সে সময়ে ভিতর বাড়ির আপ্যায়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারী কাঞ্চননগর নিবাসী ঝিলু খালা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, যাও অফিসে গিয়ে সবার জন্য বিস্কুট নিয়ে নাও। আজকে এখানে কোন ধরনের নাস্তা নাই। যখনই আমি অফিসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, চট্টগ্রামের ভাষায় আম্মাজান বলে উঠলেন, নাস্তা একেবারে কিছুই নেই? উত্তরে ঝিলু খালা বলল, না আম্মা আজকে নাস্তা কিছুই নাই। আম্মাজান আমাকে বললেন, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি মাথা নেড়ে ঠিক আছে বলে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একজন মহিলা সম্ভবত অনেক দূর থেকে এসেছিল, সাথে একটা ছোট বাচ্চাও ছিল, আম্মাজানের সামনে বসা ছিল। ভদ্রমহিলাটি আম্মাজানকে বললো, মা আমি এখানে থাকতে চাই, এখানে থেকে আপনার খেদমত করতে চাই। মহিলাটির উদ্দেশ্যে আম্মাজান ডান হাতের ইশারায় বলে উঠলেন এই যে দেখো, এখানে আমার খেদমত করার জন্য অনেক মহিলা (খেদমতগার) আছে। এই যে দেখো ওরা আছে, ভিতরে আরো আছে। আর তো প্রয়োজন নাই, এখন আরো বেশি হয়ে গেছে। এটা শুনে মহিলাটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে পুনরায় আরজি জানালে আম্মাজান মহিলাটির চোখের পানি দেখে বলে উঠলেন, নাহ্-নাহ্-নাহ্, কান্না করিও না। তুমি এখানেই থাকবে, তোমার যা যা লাগবে ওদেরকে বলবে।

তারপর সাদা চেয়ারটি থেকে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কয়জন? আমি মনে হয় বলেছিলাম ৪০/৪৫ জন (আনুমানিক), পুনরায় বললেন, তুমি একটু দাঁড়াও আমি আসছি। এরপর আম্মাজান অন্দরমহলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ৪০/৪৫টা কমলা নিয়ে আসলেন এবং বললেন নাও, এগুলো নিয়ে যাও সবাইকে একটা একটা করে দেবে। তারপর আমি ভিতর বাড়ির স্থান ত্যাগ করে মাদ্‌রাসায় এসে ছাত্রদের মাঝে কমলা বিতরণ করলাম।

এমন মমতাময়ী মা, আহ্! তখন বয়সে ছোট থাকার কারণে বুঝতাম না এগুলো শুধু কমলা বা খাদ্য নয়, মমতাময়ী আম্মাজানের ভালোবাসা। এমনিভাবে মমতাময়ী মায়ের ভালোবাসার আশ্রয়ে ছিল উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার ছাত্ররা।

২০১৩ কিংবা ২০১৪ সালে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের কেন্দ্রিয় অফিস শান্তিকুন্‌জ ভবনের দ্বিতীয় তলায় আপ্যায়ন কক্ষ ছিল, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদের সভা কক্ষ ও শাহানশাহ্ বাবাজানের জামাতারা যখন

দরবারে আসতেন তাঁদের খেদমতে আমি নিয়োজিত থাকতাম। শুধু আমি না আমার একজন সিনিয়রও ছিলেন। যিনি দরবারে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন, তিনি হলেন কাঞ্চননগর নিবাসী জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সিকদার।
দিনটি ছিল শুক্রবার, শান্তিকুন্জ ভবন তৃতীয় তলা সভা কক্ষে কেন্দ্রিয় কমিটির মাসিক সভা চলছিল। সভায় আপ্যায়নের জন্য আমি শান্তিকুন্জ দ্বিতীয় তলা থেকে গাউসিয়া হক মন্জিল-এর ভিতর বাড়িতে নাস্তার জন্য গিয়েছিলাম।
গিয়ে দেখি মেহমান ঘরে মমতাময়ী মা উম্মুল আশেকীন চেয়ারে বসে আছেন। আমার হাতে ছিল চায়ের ফ্লাস্ক, ফ্লাস্কটা নিচে রেখে আম্মাজানকে তাজিম করে উঠতে তিনি বললেন, তুমি কে? আমি নাম বললাম, এরপর বললাম, আমি বখ্তপুর কামরুলের ছেলে। আমার বাবার নাম সম্পূর্ণ বলার আগে আম্মাজান মাথাটা নেড়ে বললেন, ও আচ্ছা। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, কামরুল কেমন আছে? এরপর জানতে চাইলেন কেন এসেছি? সত্যি বলতে তখন ছোট ছিলম, আর সেই সময় মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বের হতো না। ঠিক সে সময় মেহমানখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা কাঞ্চনপুর নিবাসী ঝিলু খালা বললেন, আম্মা করিম দুলাভাইদের (শাহানশাহ্ বাবাজানের মেয়ের জামাই) দেখভাল করে, দোতলা থেকে এসেছে। এ বলে ঝিলু খালা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চা-নাস্তা কয়জনের দিবো? আম্মাজান আমাকে বললেন, তুমি তাদের (শাহানশাহ্ বাবাজানের মেয়ের জামাতা) ভাল করে দেখবে। ওরা লজ্জায় এখানে আসতে চায় না। তাদের যেন কোন কষ্ট না হয়। যা যা লাগবে এখান থেকে এসে নিয়ে যাবে। ঝিলুকে বলবে কি লাগবে। তারা দিতে না পারলে বড় ঘর থেকে নিয়ে যাবে। না হয় আমাকে বলবে। তাদের ডায়াবেটিস আছে সময় মত খাবার দিবে। কি লাগছে, না লাগছে সবকিছু দেখবে, হাতের ইশারায় রওজা শরিফ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে বাবাজান দেখবেন। আর আমি মাথা নেড়ে জ্বি আম্মা, বলেছিলাম। সেই থেকে আমার সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, শাহানশাহ্ বাবাজানের মেয়ের জামাতাদের খেদমত করতে। কারণ এটা ছিল মমতাময়ী মায়ের আদেশ।

আম্মাজানের সাথে যা কথাবার্তা হয়েছে সব চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় হয়েছে। যা মনে আছে সেগুলো আমি চলিত ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি মাত্র।

সৈয়দ জিয়াউল করিম
বখতপুর সৈয়দ বাড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

একজন বুজুর্গ মহীয়সী নারী
তাঁকে যেমন দেখেছি

চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অন্যতম আধ্যাত্মিক মনীষী বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সহধর্মিণী উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) কে দীর্ঘদিন ধরে কাছ থেকে দেখে এসেছি। তিনি নিজ সন্তানের মতো আমাদের স্নেহ মমতা করতেন। আমাদের পরিবারের এবং ভক্ত জনতার খোঁজ খবর রাখতেন। কোনো জিয়ারতপ্রার্থী মা-বোন মহিলা দরবার শরিফে গিয়ে আম্মাজানের কাছে আর্জি পেশ করলে এবং হাজত মকসুদের কথা জানালে তিনি হাসিমুখে দোয়া করতেন, সবাইকে স্নেহ মমতার পরশ বুলিয়ে দিতেন। উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা (রহ.) বেগম ছিলেন আদর্শ স্ত্রী, একজন আদর্শ মা, ভক্ত জনতার কাছে আদর্শ মুরুব্বি ও অভিভাবক।

বিশেষ করে প্রতি শুক্রবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গাউসিয়া হক মন্‌জিলে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) রওজা শরিফে দূর-দূরান্ত থেকে শত শত ভক্ত জনতা জিয়ারতে আসেন। এই ভক্ত জনতার অনেকেই বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজানের (ক.) একমাত্র সন্তান মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.) এর সান্নিধ্যে গিয়ে এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে প্রতিনিয়ত ধন্য হন। ভক্ত জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছেন রাহ্‌বারে আলম আমাদের মওলা হুজুর (ম.)। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবদ্দশায় উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) যেমন স্বামীর সান্নিধ্য ও আধ্যাত্মিক কৃপা লাভ করে সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষ করে শত শত নারী-শিশুর হাজত মকসুদ পূরণে নিবেদিত রেখেছিলেন নিজেকে। ঠিক তেমনি বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ওফাতের পরও ভক্ত জনতার আশা ভরসা ও অনুগ্রহ লাভের উসিলা হয়ে উঠেন মা জননী হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)।

দরবার ও মন্‌জিলে যাঁরাই মা জননীর সাক্ষাত পেতেন, বিশেষ করে হাজতপ্রার্থী নারী শিশু কিশোরীদেরকে তিনি অপাত্য স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতেন।

হাসিমুখে ফরিয়াদিদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। কোনো আর্জি পেশ করলে চমৎকার সমাধান দিতেন। খুবই মেহেরবানী করতেন। ফরিয়াদী মানুষ তাঁর আশীষ ও করুণা লাভে ধন্য ও অভিভূত হতেন। এমন সাদাসিধে হাসিখুশিমাখা সহজ সরল নির্মল নিষ্কলুষ মহীয়সী নারী আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। তিনি ছিলেন অন্য হাজারো নারীদের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তিনি কম ঘুমাতেন। স্বল্প আহার করতেন। দিনে রাতে কুরআন তেলাওয়াত, দুরুদ পাঠ, নামায ও ইবাদত বন্দেগিতে রত থাকতেন। মা জননীকে হারিয়ে আমরা আজ গভীর বেদনাহত। শোকে অনুতাপে আজ আমরা কাতর।

মা-জানকে ঢাকা থেকে এ্যাম্বুলেন্সে চট্টগ্রামে আনা হচ্ছে। এ এ্যাম্বুলেন্সে আবু নাছের অন্তুও ছিলেন। পেছনে অন্যান্য গাড়িতে আমরাও আসছি। সকাল ৭টায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আমরা পৌঁছি। তখন হাজার হাজার মানুষ দরবার শরিফে উপস্থিত। লোকে লোকারণ্য পুরো দরবার। এর মধ্যে বিকেলে নামাযে জানাযার জন্য শতা শত স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত ছিল। এর মধ্যে ডা. সাইফুদ্দিন মাহমুদ মাসুদের পরামর্শে বিশেষ বেষ্টনী গড়ে তুলতে আরেকটি ৬০ জনের স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হলো। এই বিশেষ টিম কঠোর শৃংখলার সঙ্গে মা-জানকে দরবার শরিফের শাহী ময়দানে নিয়ে যায়। বাদে আছর নামাযে জানাযা শেষে সুন্দরভাবে মা-জানের কফিন গাউসিয়া হক মন্‌জিলে নিয়ে আসা হয়। দূর দূরান্ত থেকে হাজারো লাখো মানুষ নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ৭ অক্টোবর ছিল চট্টগ্রামে পরিবহন ধর্মঘট। তবুও মানুষ ভোগান্তি দুর্ভোগ উপেক্ষা করে নামাযে জানাযায় অংশ নেন। যদি ধর্মঘট না হতো, তবে জানাযার দৃশ্য অন্যরকম হতো। মা-জানও দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। ২৬ আশ্বিন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী উরস শরিফও নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হলো। কী আল্লাহ্‌র মহিমা!

মা'জান আজ জাহেরীভাবে আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর রুহানী ছায়া আমাদের উপর সদা বিরাজমান। এটাই আমাদের বিশ্বাস। আমি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং শ্রদ্ধাষ্পদ উম্মুল আশেকীন (রহ.)-এর অনুগ্রহ কামনা করি।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আশরাফ
সদস্য
মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি, কেন্দ্রীয় পর্ষদ

ইনশাআল্লাহ্ তোমার স্বামীর কোন সমস্যা হবে না

বিয়ের আগে থেকে আমি দরবার শরিফে যেতাম। বিয়ের পরে স্বামীর মাধ্যমে সম্পৃক্ততা বেশি হয়। মা'জানের বিষয়ে অনেক কথা যা বলে শেষ করা যাবে না। ২০১০ সাথে আমার স্বামী যখন অসুস্থ ছিল তখন আমি আমার ৩ ছেলে নিয়ে দরবারে গিয়েছিলাম। বললাম ডাক্তার বলেছেন, আপনাদের ছেলে নাসিরের (আমার স্বামীর) ফুসফুসের ৪০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। মা'জান অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। আর আরেকটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আমাদের ছেলে নাসিরের কোন সমস্যা হবে না। ও যেমন আছে তেমনই থাকবে। আজ ১২ বছর আমার স্বামীর ৪০ ভাগ যে ড্যামেজ ওইটুকুই রয়ে গেছে মা'জানের দোয়ায়। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে এখনো ওই অবস্থায় সুস্থ আছে। আর একটুও বেশি নষ্ট হয় নি। মা'জানের এই দয়া আমি কখনো ভুলব না। মা'জান বলেছিলেন আপনার ৩টা সন্তানের দিকে দেখে আল্লাহ্ সুস্থ করে দেবেন, কান্না করবেন না। আজ ১২ বছর পর্যন্ত আমার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনযাপন করছেন। ৪ বার ভারতে গিয়ে ফুসফুস চেক করেছেন। ৪ বারই ৪০% ড্যামেজ। ওই যে মা'জান বলেছেন, যতটুকু আছে ততটুকুই থাকবে।

একবার দরবারে মা'জানের জন্য রান্না করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিছু বেগুন ভাজি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। মা'জানকে খেদমতগার ঝিলু আপা বললেন, মা'জান আপনার জন্য খাবার এনেছে। মা'জান জানতে চাইলেন, কি খাবার? ঝিলু আপা বললেন, মা'জান আপনার জন্য বেগুন ভাজি করে এনেছে, লইট্টা মাছ ভেজে এনেছে। মা'জান বললেন, এই জিনিসটা (বেগুন ভাজি) আমার পছন্দ আপনি কি করে জানলেন? তারপর মা'জান আমার মাথায় হাত রেখে আমার জন্য দোয়া করলেন।

আমি মা'জানকে আমার কিছু কথা বললাম। মা'জান বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনার কাজটা হবে। সত্যিই আলহামদুলিল্লাহ্, ওই কাজটা আমার হয়েছে। তারপর, মা'জান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাবার্‌রুক খেয়েছি কি না। আমি বললাম, আমরা খাইনি। তখন তাবার্‌রুক দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মা'জান তাবার্‌রুক খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঝিলু আপা বললেন, মা'জান তাবার্‌রুকতো

এখন বন্ধ হয়ে গেছে। মা'জান বললেন, আপনি তাদের নিয়ে যান। আমরা বের হয়ে দেখি আমাদের জন্য তাবার্‌রুক আনা হয়েছে। যদিও তখন তাবার্‌রুক ছিল না (আলহামদুলিল্লাহ্)।

আমাদের এক পাড়ার বোন দরবার শরিফ যেত। সে কাপড় বিক্রি করতো। আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করতো যে মা'জানকে দেখি কিনা? আমি বলতাম, হ্যাঁ, মা'জানকে দেখিতো। সে বলল, উরস শরিফে আপনাদের দেখিনা। সে আরো বলল, ম'াজান এমন একটা নিয়ামতের মানুষ শোকরিয়া করে কুল পাব না। আমি অভাবের কারণে কাপড় বিক্রি করতে পারছিলাম না। মা'জান আমাকে ২০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। এই ২০,০০০ টাকা আমার জন্য এত নিয়ামত হয়েছে আমার কাপড় বিক্রিতে আমার মা'জানের ভাগ্য লেগে গেছে। আমার মা'জানের এই সহায়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কখনো ভুলবো না। ২০,০০০ টাকা ওর জন্য ৪০,০০০ হাজার টাকার মতো হয়ে গেছে। ও এই নিয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের জন্য প্রতি সপ্তায় এবং উরসে মা'জানের কাছে চলে যেত। সে মা'জানের খুব ভক্ত ছিল।

আমরা না খেলে বলতে হতো না মা'জান বুঝে যেতেন আমরা খাইনি। থাকব কি না? কিভাবে কি করব এসব জানতে চাইতেন। চেহারার দিকে তাকালেই বুঝতেন আমরা কি বলতে চাই।

করোনার সময় মা'জানকে অনেকদিন দেখা করতে দেয়নি দরবার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মা'জান ভক্তদের জন্য বেশি উতলা ছিলেন। মা'জানের সাথে শেষে দূর থেকে কথা বলার সুযোগ ছিল। কিন্তু মা'জান ভক্তদের ডেকে কাছে বসাতেন।
উম্মুল আশেকীনের শান কারো সাথে তুলনা করা যাবে না। উম্মুল আশেকীন আম্মাজানের সাথে কারো তুলনা হবে না। উরস শরিফে মা'জানকে আমার আম্মার জন্য আর্জি দিয়েছিলাম। মা'জান আমার আম্মাকে একটু রহমত করবেন, আমার আম্মা অসুস্থ। মা'জান বললেন, "আপনার আম্মার কি প্রেসার বেশি?" অথচ আমি মা'জানকে বলিনি। আমার আম্মার আসলেই প্রেসার বেশি।

কিন্তু মা'জান বললেন, "আপনার আম্মার তো অতিরিক্ত প্রেসার। আপনার আম্মাকে ভালো একটা ডাক্তার দেখান"। আমি বললাম, আপনি দোয়া করেন। আপনি দোয়া করলে সুস্থ হবে। মা'জান বললেন, দোয়া আছে। ডাক্তার দেখান।

আশ্চর্য লাগছে আমিতো প্রেসার বলিনি, আমি বলেছি আম্মার অসুস্থতা যেন সেরে যায়। কিন্তু মা'জান যে প্রেসারের কথা বললেন, এটা আমি ভুলবনা। এর দু'দিন পর আমার আম্মার প্রেসার কমে যায়।

মা'জানকে দেখলে আমাদের মনে হতো আমরা অনেক বড় শান্তি পেয়ে গেছি। মা'জানের চেহারা দেখলে আমাদের শান্তি লাগতো। তাঁর পা ফুলে গেছে, আমরা ধরলে তিনি বিরক্ত হতেন না। পা ফুলে গেছে বললে তিনি বলতেন, অসুখে।

ফারজানা আকতার নিশু
সিনিয়র সদস্য 'আলোর পথে'
মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম

আম্মাজানের মেহেরবানী পেয়েছি

মা'জানকে আমি কখনো দেখিনি। আমি উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর নামে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানা ও হেফযখানার খেদমতে আছি। অনেকবার রুহানী জগতে মা'জান আমাকে মেহেরবানী করেছেন। যথেষ্ট মেহেরবানী করেছেন এটা এখানে আমি বলতে পারবোনা। এটা আমার ভিতরেই থাক।

আমি কিছুদিন আগে অসুস্থ ছিলাম। তখনো মা'জান আমার এখানে এসে রূহানী জগতে আমাকে মেহেরবানী করে গেছেন। সালটা মনে নেই। ২৯শে আশ্বিন চাহ্‌রাম শরিফে অফিস রুমে ফল তাবার্‌রুক ছিল না। হাবীবুল্লাহ্‌কে মা'জানের কাছে পাঠিয়েছি আমার ও আমার ছেলেদের জন্য ফল তাবার্‌রুক দিতে। মা'জান আমার জন্য ৫টা বাংলা কলা, ৫টা মাল্টা হাবীবুল্লাহ্‌কে দিয়ে পাঠালেন। আমি হাবীবুল্লাহ্‌কে বললাম, তুমি জানো কেন আমাকে ৫টা করে ফলগুলো দিলেন? সে বললো, ভাইয়া আমি জানিনা। আমি বললাম, আমার ৩ ছেলে, আমি ও আমার স্ত্রী। মা'জান জানেন আমরা ৫ জন, তাই ৫টা করে দিয়েছেন। মা'জানের একটা কেরামত। তিনি না দেখেই বলতে পারেন আমরা ৫জন তাই পাঁচটা করে ফল তাবার্‌রুক দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ্।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
(ফারজানা আক্তার নিশু'র স্বামী)
সদস্য
মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি
কেন্দ্রীয় পর্ষদ

মেহমানদারীর তুলনা হয় না

মা'জানের মতো মহীয়সী মহিলা আমি কখনো দেখিনি। মা'জানের তুলনা শুধুমাত্র মা'জান-ই। মা'জান আমাকে খুব মহব্বত করতেন। মা'জান খাটে থাকতেন। আমি গেলে খাটের নিচে বিছানা করে থাকতাম। এজন্যই তো তিনি মা'জান। মা'জানের সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না।

বাবাজানকে মানুষ জানালা দিয়ে টাকা দিতেন। বাবাজান চলে যাওয়ার পর মা'জান টাকাগুলো এনে আমাদেরকে দিয়ে সুন্দর করে ভাজ করিয়ে যত্ন করে রাখতেন। মানুষকে মা'জানের মেহমানদারীর তুলনা হয় না। আমি মা'জানের সাথে নামায পড়তাম। এটা আমার সৌভাগ্য। মা'জান আমাকে এখনও মহব্বত করেন। নিজের মাও এরকম করেন না। মওলা হুজুর যে দয়া পেয়েছি এগুলো অনেক বেশি। মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীকে আমি সাত বছর থেকে দেখছি। শুকরিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে। মা'জান সবার কাছে আপন ছিলেন। বাবাজানকে মানুষ যেরকম আপন মনে করতেন ঠিক আম্মাকেও সে রকম মনে করতেন।

জেবু আপার (বড় শাহ্‌জাদী) আগে একজন মেয়ে হয়েছিল। তখন বাবাজান বেশি হালতে ছিলেন। মা'জান আমাকে বলেছেন। তখন তাঁরা গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে ছিলেন। মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পর মেয়েটি মারা যায়। তখন বাবাজান একটি কাঠের টুকরো দিয়ে জানাযা পড়েছেন। মা'জান এই ঘটনাটি আমাকে বলেছেন।

বাবাজানের বিভিন্ন রিয়াজতের কথা আমাকে বলতেন। আমি দরবার শরিফ গেলে কোনো মহিলা ভক্তদের সাথে বসতাম না। কারো কাছে কোন কিছু জানতেও চাইতাম না। আমি আমার মতো করে সবসময় মা'জানের সাথে থাকার চেষ্টা করতাম। আর আপাদের সান্নিধ্যে। মা'জানের বোনের (জেবু আপার শাশুড়ি) সাথে থাকতাম। তিনি আমাকে খুব দেখতে ভালোবাসতেন। আপারা তো আওলাদ। আমি জেবু আপাকে বলতাম আপনি হলেন মা ফাতেমা। সব সময় বলতাম। মা'জানের সামনেও বলতাম। মা'জান হাসতেন।

মর্জিনা বেগম
চান্দগাঁও গোলাম নাজির চৌধুরী বাড়ির
মরহুম সামশুল আলম সাহেবের স্ত্রী

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) কর্মময় জীবন আশেকীনদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য ও স্মৃতিকথা

প্রথম ঘটনা

গাউসুল আযম খাতেমুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পৌত্র গদীর স্থলাভিষিক্ত অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৯৮২ইং সনের ১৬ জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। এ মহান অউলিয়ার বিয়োগ ব্যাথা অন্তরে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরই স্বনামধন্য খলিফা ফকির মোঃ নুরুল ইসলাম প্রকাশ (শাহ্ সাহেব হুজুর) সে বৎসর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জিয়ারত করতে আসেন।

যেহেতু আছি-এ-গাউসুল আযমই শাহ্ সাহেব হুজুরকে খেলাফত দান করেন এবং তার মাধ্যমে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় দিঘুয়া দরবার শরিফ প্রতিষ্ঠিত হয়। অছি-এ-গাউসুল আযমের প্রথম পুত্র বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিনী উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)। বিশ্বঅলির রাজ দরবার পরিচালনায় শ্রদ্ধাস্পদ জ্যোতির্ময়ী মহীয়সী আম্মাজানের ভূমিকা অপরিসীম যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তবু তাঁর নুরানী হাতের তাবার্‌রুক যে কতইনা বরকতময় তা আলোকপাত করাই লেখকের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। বিশ্বঅলির স্ত্রীকে মহান আল্লাহ্তায়ালা সেরূপ মর্যাদা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। লেখক আছি-এ-গাউসুল আযমের খালিফা শাহ্ সাহেব হুজুরের নগন্য মুরীদ।

পীর শাহ্ সাহেব হুজুরের সফর সঙ্গী হিসেবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে হযরত কেবলা কাবা (ক.) বাবা ভাণ্ডারী (ক.), আছি-এ-গাউসুল আযম (ক.) এর রওজা শরিফ জিয়ারত শেষে হযরত কেবলা কাবার আওলাদগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই সফরের মূখ্য উদ্দেশ্য। আছি-এ-গাউসুল আযম এর পবিত্র বেসাল শরিফের পরের ঘটনা। শাহ্ সাহেব হুজুরের সফর সঙ্গী হিসেবে তাঁর সাহেবজাদা মোঃ মাইন উদ্দিন খন্দকার, মুরীদ মতি মাস্টার ও লেখক রওজা শরিফসমূহ জিয়ারত কার্যক্রম সু-সম্পন্ন করে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে

অবস্থান করি এবং রাত্রি যাপন করি। পরের দিন সকালবেলা শাহানশাহ্ বাবাজানের সদয় সাক্ষাতের জন্য তাঁর একতলা বিশিষ্ট দালানের একটি কক্ষে অবস্থান করি। সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। শাহানশাহ্ বাবাজান দরবারে ছিলেন না। তখন সকাল প্রায় ১০টা। অন্দর মহল থেকে শ্রদ্ধাস্পদ আম্মাজান জনৈক খাদেম মারফত আমাদের বসার জন্য সংবাদ দিলেন। শাহ্ সাহেব হুজুর আমাদেরকে নিয়ে বসে রইলেন। আমাদেরকে ঢাকা চলে যেতে হবে, ঠিক সে মুহূর্তে শ্রদ্ধাস্পদ আম্মাজান খাদেমকে দিয়ে সুমিষ্ট কাঁঠাল ফল ও মুড়ি দিয়ে আমাদেরকে আপ্যায়ন করালেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজানের জীবদ্দশায় শাহ্ সাহেব হুজুর আমাদেরকে নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ জিয়ারতে আসেন। দুটি হিন্দু পরিবারে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকদ্দমা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও মাতব্বরগণ দুপক্ষে বিভক্ত হয়ে মামলা নিষ্পত্তি না করে উভয় পক্ষের জমি বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করছিল। এমতাবস্থায় এক পক্ষ শাহ্ সাহেব হুজুরের নিকট বিচার দায়ের করেন।

শাহ্ সাহেব হুজুর মিমাংসার জন্য বিশ্বঅলির দরবারে রুহানীভাবে ফরিয়াদ করতে আমাদেরকে নিয়ে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসেন। আমরা শাহানশাহ্ বাবাজানকে হুজুরাখানায় একটি চেয়ারে উপবিষ্ট দেখতে পাই। শাহ্ সাহেব হুজুরের সাথে কোন আলাপ না করেই আমাদেরকে তাবার্‌রুক খেয়ে চলে যেতে বলেন।

জনাব জামাল আহমদ সিকদার সাহেব অন্দর মহল থেকে এক বাটি পাকানো গোশ্‌ত এনে শাহ্ সাহেব হুজুকে দিলেন। বললেন ভাত নেই গোশ্‌তই তাবার্‌রুক হিসাবে গ্রহন করুন। শাহ্ সাহেব হুজুর বাটি থেকে নিজ হাতে আমাদেরকে তাবার্‌রুক খাওয়ালেন। শাহ্ সাহেব হুজুরের সফর সঙ্গী তাঁর ২য় সাহেবজাদা মোঃ নুরুল কবীর, মুরীদ মোঃ গিয়াস উদ্দিন ডিলার, আঃ মান্নান, আবদুল বারেক ও লেখক, মহীয়সী আম্মাজানের নুরানী হাতের পাকানো গোশ্‌ত তাবার্‌রুক হিসেবে খেয়ে বরকত হাসিল করি।

মাইভাণ্ডার শরিফ জিয়ারত করে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উক্ত দুই হিন্দু পরিবারের মামলা মোকদ্দমা মিমাংসা হয়ে যায়। শাহনশাহ্ বাবাজানের অদৃশ্য ইঙ্গিতেই তা সম্ভব হয়েছিল, লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস। হিন্দু পরিবার দুটি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার সনমানিয়া ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর গ্রামে বসবাস করত। মানুষের হাজার কঠিন সমস্যা মামলা মোকদ্দমা শাহ্ সাহেব হুজুর শাহানশাহ্ বাবাজানের সদয় দৃষ্টির মাধ্যমে সমাধান করতেন।

তৃতীয় ঘটনা

১৯৮৮ ইং ১৩ অক্টোবর মোতাবেক ১লা রবিউল আউয়াল, ২৫ আশ্বিন দিবাগত রাত্রি ১২:২৭ মিনিটে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী পরলোক গমন করেন। ১৯৮৯ ইং সনের ১০ মাঘ মাইজভাণ্ডার উরস শরিফ মাহফিলে শাহ্ সাহেব হুজুরের সফরসঙ্গী হিসেবে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যোগদান করি। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের মহামান্য সাজ্জাদানশীন রাহ্‌বারে আলম মওলা হুজুর হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী সবেমাত্র শাহানশাহ্ বাবাজানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এ মহান আউলিয়ার সদয় সাক্ষাৎ শেষে শাহ্ সাহেব হুজুর তাঁর কনিষ্ঠ সাহেবজাদা মোঃ মইন উদ্দিন খন্দকার সাহেবকে অন্দর মহলে শ্রদ্ধাষ্পদ আম্মাজানের সাক্ষাতের জন্য এবং পাঁচশত টাকা নজরানা স্বরুপ আম্মাজানকে দিতে বলেন। তখন সাহেবজাদা কেবল বালক মাত্র।

আম্মাজানের নিকট যাওয়া মাত্রই তাকে নিজের কাছে বসালেন। তিনটি বড় আকারের রসগোল্লা মিষ্টি খেতে দিলেন। তার মাথায় আম্মাজান হাত বুলালেন, আদর করলেন এবং দোয়া করলেন। সাহেবজাদা কেবল মাত্র ১টি মিষ্টি খেলেন। অন্দর মহল থেকে বাইরের গেটে এসে সাহেবজাদা শাহ্ সাহেব হুজুরকে জানালেন তিনি একটি মিষ্টি খেয়েছেন, বাকী দু'টি রেখে এসেছেন। হুজুর বললেন তুমি বাকী দুটি মিষ্টি নিয়ে আসলেনা কেন? আমি লেখক সে সময় নিকটেই ছিলাম।

লেখকের একান্ত বিশ্বাস যে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজান এর রুহী তাসার্‌রুপাত এবং সেদিনের মিষ্টি তাবার্‌রুক যা আম্মাজান সাহেবজাদকে খাওয়ালেন ফলশ্রুতিতে এই সাহেবজাদা স্বীয়পিতা শাহ্ সাহেব হুজুরের মতই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার খেদমতে নিয়ুক্ত আছেন।

বর্তমানে তিনি মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ দিঘুয়া দরবার শরিফ শাখা নং-৫৩৬ এর সম্মানিত সভাপতি। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রতিটি উরস শরিফ ও খোশরোজ শরিফ মাহফিলে গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ জেলার আশেক ভক্তগণকে নিয়ে যোগদান করে থাকেন। তার মাধ্যমে উক্ত জেলাগুলিতে মওলা হুজুরের অনুমতিক্রমে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার দাওয়াতী কার্যক্রম, মিলাদ মাহফিল, জিকির মাহফিল, সামা মাহফিল চালু রয়েছে।

এই আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময়ী উম্মুল আশেকীন মহীয়সী আম্মাজানের গুণকীর্তন কলমের মাধ্যমে লেখার মত যোগ্যতা অধম লেখকের নেই। পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে এই প্রার্থনা, "বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফ হতে যেমন সর্বদা রুহানী ফয়েজ জারী হয় তদ্রুপ তাঁর পাশেই সমাহিত আম্মাজানের নিকট হতে রুহানী ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে আশেক-ভক্তগণ যেন চিরকাল কৃতার্থ হয়"।

মহান মুনিব রাহ্‌বারে আলম মওলা হুজুর হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম.) নিকট সবিনয় নিবেদন, শোকাহত আশেক ভক্তগণের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের করুণ আকুতি ও ফরিয়াদ মওলা হুজুর যেন শাহানশাহ্ বাবাজান ও শ্রদ্ধাস্পদ আম্মাজানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল করিয়ে দেন। আমিন।

আবুবকর সিদ্দিক
উপদেষ্টা
মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ
দিঘুয়া দরবার শরিফ শাখা নং ৫৩৬
গ্রাম– দিঘুয়া, ডাকঘর– সাওরাইদ বাজার
উপজেলা– কালীগঞ্জ, জেলা– গাজীপুর

এটা রাখ, আমার পক্ষ থেকে দিলাম

আমি ২০১৪ সালে প্রথম শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর শাহী দরবারে খেদমতে হাজির হই। সেইদিন ১০ই পৌষ শাহানশাহ্ বাবাজান-এর খোশরোজ শরিফ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি ও আমার পরিবার অধিক আগ্রহ ও আনন্দের সাথে বাবাজানের খেদমতে আত্মোৎসর্গের লক্ষ্যে এসেছিলাম। আমরা হাদিয়া স্বরূপ কিছু খাবার পণ্য নিয়ে যাই। মাইজভাণ্ডার শাহী গেইট হতে পায়ে হেঁটে শাহানশাহ্ বাবাজানের দরবারে যাই এবং তাজিমি ভক্তিতে রত হই। হঠাৎ কিছুক্ষণ পর মনে পড়ে আমরা ভুলবশত আমাদের হাদিয়ার সবকিছুই সিএনজির পেছনে রেখে এসেছি। হতবিহ্বল হয়ে একে অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করি এবং গাড়িটির খোঁজ করি। যদিও তাকে অনেক আগেই বিদায় করেছি তবুও মনকে সান্ত্বনা দিতে গাড়িটির খোঁজ নিতে ছেলেকে পাঠাই।

মাইজভাণ্ডার দরবার আশেকানে ভরপুর। হাজারো ভক্তগণের মাঝে গাড়ি ভিতরে আসাও অসম্ভব। হতাশ হয়ে শাহানশাহ্ বাবাজান-এর রওজা মোবারকের বাইরে সিঁড়ির কোণায় বসে আরজি দিতে থাকি। বলেছিলাম, বাবাজান আমি খুবই অসহায়। ফয়েজ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসলাম। আপনার দরবারে আনা হাদিয়া আমি হারিয়ে ফেলেছি। হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় আবেগপ্রবণ হয়ে রওজার পানে তাকিয়ে রইলাম। এভাবেই ত্রিশ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর বারবার মনে সাড়া দিচ্ছিল বাহির থেকে ঘুরে আসার।

এরপর বের হয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে হযরত বাবাজানের রওজা শরিফ জিয়ারতে যাচ্ছিলাম। কিছুদূর যেতেই পেছন থেকে একটি গাড়ি বারবার হর্ণ দিচ্ছিল। পেছনে তাকিয়ে দেখি আমাদের দাঁড়াতে ইশারা করছে। কাছে আসার পর দেখলাম সেই ড্রাইভার যাকে এতক্ষণ খুঁজছিলাম। সে বলল, আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আমি আজাদি বাজার পর্যন্ত চলে যাই। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম গাড়িতে অনেককিছু পড়ে আছে। মাঝপথে আরো যাত্রী নিয়েছি। ভেবেছিলাম তাদের মধ্যে কেউ ভুলে রেখে গেছে। একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কেন যেন মন বলছিল এতসব খাবার আপনাদেরই হবে। দরবারের এতলোকের ভিড়ে আপনাদের পাওয়া অসম্ভব। তবুও ইচ্ছে হচ্ছিল আপনাদের খোঁজ করি। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বাড়ি থেকে ফিরে আসলাম। এতসহজে পেয়ে যাব ভাবিনি। এই বলে আমাদের সবকিছু দিয়ে লোকটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। মুহূর্তের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে সব ফিরে পাওয়া বিশ্বাস হচ্ছিল না। সাথে সাথেই বাবাজানের দরবারে হাজির হলাম। খেদমতের প্রথম দিনেই অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হলাম। শাহানশাহ্ বাবাজান অশেষ দয়ালু। ভক্তির সাথে তাঁর ঘেরা-বেড়াকে ও আরজি দিলে মুহূর্তেই কবুল হয়ে যায়। সেইদিনই আম্মাজান এর সঙ্গে প্রথম দেখা। আম্মাজান অসীম দয়ালু, প্রাণবন্ত মমতাময়ী ও স্নেহার্দ্য। তাঁর সাথে সাক্ষাত করে মনে হচ্ছিল যেন নিজের মাকে আবারও ফিরে পেয়েছি। আম্মাজান-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য হাজারো মহিলা ভিড় জমিয়েছে। সারারাত ধৈর্যের সাথে বসে এক এক করে সকলের দুঃখকষ্টের আরজি শুনছিলেন। মৃদুহাসি আর কোমল কণ্ঠে মাথায় হাত বুলিয়ে সবাইকে দোয়া করছিলেন।

সেইদিনের পর থেকেই সবসময় আম্মাজানের সাথে সাক্ষাত করতাম। একসময় আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। অনেক চিকিৎসার পরও সম্পুর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম না। একটু সুস্থ হতে না হতেই আবারো অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আম্মাজানের কাছে ছুটে যাই। আম্মাজান তাঁর খাওয়া ভাতের অবশিষ্ট কিছু আমাকে খেতে দেওয়ার জন্য ঝিলু আপাকে নির্দেশ দেন। আম্মাজানের তাবার্‌রুক খাওয়ার পর শাহানশাহ্ বাবাজানের মেহেরবানীতে আমি মুহুর্তেই কিছুটা সস্তির নিঃশ্বাস নিলাম এবং শারীরিক শান্তি অনুভব করেছিলাম।

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত ও আম্মাজানের দয়া-মেহেরবানীতে কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থতা লাভ করি। এভাবে যখনই কোন মসিবতের আশঙ্কা পাই আম্মাজান এর কাছে সব দুঃখ দূর্দশার কথা বলে আসতাম। আম্মাজান আমাকে ও আমার পরিবারকে অনেক ভালবাসতেন। প্রতিবারই সবার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। আমার স্বামী বিদেশে অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় আম্মাজানের দোয়া বরকতে সুস্থ হয়ে যায়। আম্মাজানের কাছে দেওয়া প্রত্যেক আরজি আল্লাহ্‌র রহমতে অনায়াসে সফল হয়ে যেত। একই আরজি কখনও দুবার দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

অনেকবার এমনটাও হয়েছে, আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগান্তির শিকার হয়ে আম্মাজান এর কাছে গিয়েছি তা মুখ থেকে বের করার আগেই তিনি বুঝে যেতেন। সেই বিষয়ের পেক্ষাপটে সান্তনা দিতেন। দোয়া করতেন। সবসময়ই আল্লাহ্‌র উপর ও শাহানশাহ্ বাবাজান এর উপর ভরসা রেখে ধৈর্য্য ধারনের নির্দেশ দিতেন।

আম্মাজান অন্তর্যামী ছিলেন। তাঁর গুণগান, দয়ামায়া, শান, মেহেরবানী অগণিত। যা আমাকে ও আমার পরিবারকে নতুন জীবনে উন্মেষিত করেছে।

পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্তের আগে আম্মাজানের দোয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে যেতাম। তাঁর পাক জবানের ওপর অন্ধবিশ্বাস ও দৃঢ় ভরসা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ্ প্রত্যেকটা কাজে সফলকাম হয়েছি।

আমার স্বামী অসুস্থ থাকাকালীন পারিবারিকভাবে দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিলাম। বিদেশে অসুস্থ স্বামীর চিন্তার মধ্যে অর্থের সংকট পরিবারের ভরণপোষণ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা নিবারনে আশেপাশের প্রতিবেশীর কাছ থেকে অনেক ধারকর্জও হয়ে গেছে। দিনের পর দিন একই ভোগান্তিতে রয়ে গেছি। দুঃখ কষ্টের করুণ পরিস্থিতি কিছুতেই কেটে উঠতে পারছিলাম না। ধৈর্য্যের সীমা হারিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আম্মাজানের কাছে ছুটে যাই। মেয়েরা তাদের বাবার সুস্থতার জন্য দোয়া চাইল। আর আমি অভাবজনিত সমস্যার কথাগুলো বলেছিলাম।

আম্মাজান আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন এবং আমার হাতের মুঠোয় একশত টাকা দিয়ে বললেন, "এটা রাখ। আমার পক্ষ থেকে দিলাম। ইনশাআল্লাহ্ সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখ।" আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় শাহানশাহ্ বাবাজানের মেহেরবানী ও আম্মাজানের দোয়া বরকতে সেদিনের পর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

এক পর্যায়ে সকল সমস্যার অবসান ঘটিয়ে সচ্ছলতা ফিরে আসে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শাহানশাহ্ বিশ্বঅলির দরবারে স্বপরিবারে শুকরিয়া আদায় করি এবং আম্মাজানের কাছে তাজিমি ভক্তিতে শুকরিয়া জানাই।

আম্মাজান অনেক সাংসারিক ছিলেন। পরিবারের প্রতি সর্বদা দায়িত্বশীল ছিলেন। অবসরে নাতি-নাতনিদের নিয়ে সময় কাটাতেন। মেহমানদের যথেষ্ট সমাদর করার নির্দেশ দিতেন। যে কোন আয়োজনের পর আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। আম্মাজান গৃহস্থালি কাজকর্মকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। আশেকানদেরও সেই জ্ঞানশিক্ষায় আলোকিত করতেন।

আশেকানদের প্রতি আম্মাজানের ভালবাসা অফুরন্ত। কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে কখনও আম্মাজানের কাছ থেকে ফিরে আসেনি। হিন্দু-মুসলিম, ধনী-গরীব সবাইকে সমান মর্যাদা দিতেন। সকলের দুঃখকষ্টের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

সবাইকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে ধৈর্য্যধারনের নির্দেশ দিতেন। হক মন্‌জিলে কর্মরত অনেক ছেলেমেয়েদের আম্মাজান নিজ দায়িত্বে সামাজিক আয়োজনের মাধ্যমে বিবাহ দিয়েছেন। এছাড়াও দেখেছি অনেক ভক্তগণের আরজি শুনে করুণ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্টের দরিদ্র তহবিল থেকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।
আম্মাজান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই মানব সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আশেকান ভক্তগণ ছিল আম্মাজানের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) সহধর্মিনী হয়ে বাবাজানের দেওয়া সকল দায়িত্ব অনায়াসে পালন করে গেছেন। তিনি হলেন আখেরি দুনিয়ার বেহেশ্‌তি নারীর সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ফাতেমা বেগম
দলইনগর, গহিরা
রাউজান, চট্টগ্রাম

“মহিয়ষী মা মুনাওয়ারা বেগম স্মরণে”

এই ধরনীর বুকে একখন্ড জান্নাতের টুকরো মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। যুগ যুগ ধরে স্ব মহিমায় মহিমান্বিত বাংলার জমিনে গাউসুল আযমের দরবার নামে খ্যাত এই পুতঃ পবিত্র পুণ্যভূমি।

আধ্যাত্মিক পুণ্যভূমি মাইজভাণ্ডারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার সেই শিশুকালে বাবা-মায়ের কোলে করে। ধীরে ধীরে আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সবকিছু চিনতে লাগলাম। দরবারের প্রতিটা অলিগলি, প্রতিটা মাজার এবং বাবাজানের পুরনো ভক্তদের চিনে ফেললাম খুব অল্পদিনেই।

আমার মরহুম আব্বা নুর ইসলাম সওদাগর ছিলেন প্রচন্ড বিনয়ী, নমনীয় এবং আদব আখলাক সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন মাইজভাণ্ডার দরবারে গেলে করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে।

যাই হোক আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমি যখন গাউসিয়া হক মন্‌জিলের অন্দর মহলে যাই তখন আমার বয়স ছিল ৪/৫ বছর। এর আগেও কিন্তু বহুবার গিয়েছিলাম। নিতান্ত ছোট ছিলাম বলে তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারিনি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে একদিন শহরের বাসা থেকে আমরা শাহানশাহ্ বাবাজানের নুরী কদম মোবারকে হাজিরা দিতে গেলাম। গ্রীস্মের খরতাপে চারদিকে খাঁ খাঁ করছে। এই সময় শাহানশাহ্ বাবাজান তাঁর হুজরা শরিফে পুরো দেহ মোবারককে কম্বল দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলেন। আমার আব্বা শাহানশাহ্ বাবাজানকে কদমবুচি ও তাজিম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময় বাবাজান খেদমতগার মজিবা খালাকে ডেকে বললেন ‘মেহমানদেরকে ভিতরের বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করুন এবং মা’জানকে বলুন ভাতের এন্তেজাম করতে’। তখন আমরা অন্দর মহলে গেলাম এবং রান্নাঘরের পাশে ডাইনিং রুমটাতে যত্ন সহকারে আমাদের বসানো হল। এর কিছুক্ষণ পর নানান পদের তরকারি দিয়ে আমাদের তাবার্‌রুক দেয়া হল।

খাবার শেষে আম্মাজানের রুমে গিয়ে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আম্মাজান ভক্ত অনুরক্তদের এত আদর আর মহব্বত করতেন যা হক মন্‌জিলের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যেদিন আম্মাজানকে প্রথম দেখি সেদিন আমার শিশুমনে এক অদ্ভুত দাগ কেটে যায়, আমি অবাক হয়ে যাই। শুভ্র বসনে, শ্বেত বদনে যেন নুরের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্বর্গীয় ঐশ্বরিক হাসি

মাখা, মায়া জড়ানো, মমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত আমাদের আম্মাজান। তিনি এত বেশি অতিথি পরায়ন ও নমনীয়, বিনয়ী ছিলেন যে দরবারে গেলে কখনো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করে আসতে মন চাইতো না। আর আম্মাজানের বদান্যতায় কত গরীব দুঃখী মাসের পর মাস, যুগের পর যুগ হক মন্‌জিলে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

বড় হওয়ার পর আমি যতবারই আম্মাজানের কদমে হাজিরা দিতে গিয়েছি ততবারই আম্মাজান জানতে চেয়েছেন খাবার খেয়েছি কিনা, নাস্তা করেছি কিনা, না খেলে খেদমতরত খাদেমাদের ডেকে বলতেন 'মেহমান ইবেরে চা-নাস্তা দেও, ভাত দেও' এবং বিদায় নিয়ে চলে আসতে বলতেন 'ইবের বাচ্চার লাই কিছু তবর্‌রুক দেও'। আম্মাজান এইভাবে অসংখ্যবার আমার বাচ্চাদের জন্য তাবার্‌রুক দিয়েছেন।

একবার আমি এক জটিল সমস্যা নিয়ে আম্মাজানের কাছে যাই, অথচ আম্মাজান দুইটা সহজ সরল বাক্যর মাধ্যমে সেই জটিল সমস্যা সমাধান করে দেন। এরপর আম্মাজানের সাথে যতবার সাক্ষাৎ হত ততবার আর কোন সমস্যা হয়েছে কিনা জানতে চাইতেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতাম। এতো এতো হাজারো সন্তানের সমস্যা তিনি একা কিভাবে মনে রাখতেন।

আম্মাজানের শরীর অসুস্থ হলে তিনি দুপুরে একটু বিশ্রাম নিতেন। এই সময় তাঁর সাথে ভক্ত অনুরক্ত মহিলারা দেখা করতে গেলে খেদমতে নিয়োজিত মহিলারা বলতেন এখন দেখা করা যাবে না, আপনারা এখন চলে যান। কথাগুলো মায়ের কর্ণগোচর হলে তিনি মায়াবী ও কোমল কণ্ঠে বলতেন এমন করিস না, তাদেরকে এদিকে ডাক, দেখা করে যাক, তারা অনেক দুর থেকে অনেক আশা নিয়ে কষ্ট করে এসেছে। তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে সকলের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

আমাদের এই মা অতিসাধারণ কোন মা নন। আমি তাঁর মাঝে খুঁজে পেয়েছি মা ফাতেমার বদান্যতা, বিবি আয়েশার মেহমানদারী, বিবি খাদিজার মনোবল, বিবি আছিয়ার ধৈর্য্যশক্তি, বিবি মরিয়মের বিশ্বাস, বিবি রহিমার মত সহিষ্ণুতা এবং রাবেয়া বসরীর মত পরিশ্রমী।

তিনি আসলেই মহিয়সী নারী বটেন। তিনি বিশ্বঅলি শাহানশাহ্‌ বাবাজানের পতিব্রতা স্ত্রী এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় রাহবার মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর

মমতাময়ী মা। গাউসিয়া হক মন্‌জিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আম্মাজানের ছিল কঠোর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ধৈর্য্যশক্তি, পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবলের এক অনন্য সমন্বয়। আমরা মানে মায়ের সন্তানেরা যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন মা আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় আলোর দ্বীপশিখা হয়ে জ্বলতে থাকবেন। আর আমি বিশ্বাস করি কেয়ামত পর্যন্ত মায়ের আশির্বাদের ছায়া সকল সন্তানের উপর থাকবে।

লুৎফুন্নেছা সিদ্দিকা
উত্তর সর্তা
রাউজান, চট্টগ্রাম

ধনী-গরীব ভেদাভেদ ছিল না

আমার মত একজন অযোগ্য মানুষের উম্মুল আশেকীনকে নিয়ে লিখার সাহস হচ্ছিল না। তাই পবিত্র কোরআন শরিফের সূরা আহযাব-এর ৩৫নং আয়াত "নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, পুরুষ ও মুমিন রানী, অনুগত পুরুষ অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী ও পুরুষ – এদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও প্রতিদান রেখেছেন"।

কোন নারী যদি পারিবারিক কষ্টের কথা বলতেন আম্মাজান অধিক মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং বলতেন তুমি তোমার স্বামী, শাশুড়ির আচরন পরিবর্তন করতে পারবেনা, তোমার সেই আচরন পরিবর্তন কর, যেই আচরনের জন্য তোমার উপর অসন্তুষ্টি। আরো বলতেন, প্রত্যেক নারীর ধৈর্য্য ধরে সংসার করতে হয়। তিনিও সংসারে সর্বোচ্চ ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

স্বামী-সংসারের খেদমতকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন এবং সবাইকে সংসারে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার তাগিদ করতে বলতেন, সংসারের অবহেলা করা যাবে না। আম্মাজান মাইজভাণ্ডারে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন। আম্মাজান মাইজভাণ্ডারের খেদমতবিহীন দুনিয়ার মশগুলে দিনাতিপাত করেন নি। ভক্ত মুরিদানের খোঁজখবর নিজেই নিতেন। আর প্রত্যেক ভক্ত-আশেক তাবার্‌রুক খেয়েছে কিনা খবরাখবর নিতেন। না খেয়ে কোন ভক্ত বাড়ি যেতে পারত না।

গরিব বড় লোক কোন ভেদাভেদ ছিল না। গরিবদের বেশি ভালবাসতেন। আর অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। মা'জানের ওফাতের আগে প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত মাইজভাণ্ডার দরবারে আসার জন্য আকুতি আমি দেখেছি। মাইজভাণ্ডারের কালাম শুনিয়ে শুনিয়ে মা'জানকে শান্ত করতে হতো, আর কালাম শুনে দু'চোখের পানি ছেড়ে দিতেন। আর বলতেন রমেশ শীল চিনতে পেরেছে আমরা চিনতে পারিনি, নাম ধরলে শরীর মোবারক শিহরিত হতো।

ঝিনুক যেমন প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা নিয়ে মুখ বন্ধ করে মুক্তায় পরিনত হয়। মা'জানও মাইজভাণ্ডারীর প্রেমে বিভোর হয়ে উম্মুল আশেকীনে পরিনত হয়েছেন।

উম্মুল আশেকীন আম্মাজানের ছিল উচ্চতর আকল যা আল্লাহ্ ভালবেসে আম্মাজানকে দান করেছেন। তাই উপরে উল্লেখিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে তিনি বিশ্বঅলির পবিত্র মাযার শরিফে মর্যাদার আসনে আসীন হন।

বীজ শস্য ক্ষেত্রে পড়লে ফসলে পরিনত হয়, তেমনি নাকেছ কামেলের সোহবতে কামেল হওয় যায়। মা'জানও কামেল হয়ে গেছেন। মা'জানের প্রত্যেক কালাম বাস্তবে রূপধারণ করে। আমাকে একবার বলেন, তোমার ঘরবাড়ি কি? আমি বললাম, আমার কোন ঘরবাড়ি নেই, ভাড়া বাসায় থাকি। মা'জান বলেন, কি বল ঘর একটা লাগে। আমার দু'মাসের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট হয় কোন ঋণ ছাড়া। লাখো নারী আশেক যেই আরজি নিয়ে আসত তা কবুল হতো।

দানশীলতা, আত্মীয়তায় মা'জানের অপরিসীম ভূমিকা। কাউকে খালি হাতে আসতে দিতেননা। আর কেউ না খেয়ে দরবার থেকে আসতে পারতেননা। এটি মা'জান মনেপ্রাণে এত গভীরভাবে নিয়েছেন। মা'জানকে হাসপাতালে দেখতে গেলে সবাইকে জনে জনে তাবার্‌রুক খেয়েছেন কিনা এবং খাবার দেবার জন্য অস্থিও হয়ে যেতেন।

মা'জান এত বিনয়ী ছিলেন, কখনো যদি অসুস্থ অবস্থায় জিজ্ঞেস করতেন, মা'জান কেমন আছেন? মা'জান বলতেন, ভালো আছি। আমার অসুখ, কষ্ট লাগছে এটা কখনো মুখে উচ্চারন করেননি।

আরেকটা বৈশিষ্ট্য– বদান্যতা আল্লাহ্ বিশেষ বান্দাকে দান করেন। মানুষের মনে যেন কোন কষ্ট না পায় তার জন্য চেষ্টায় থাকতেন। একবার আমাকে কিছু উপহার দিয়ে বলেন, কাউকে বলোনা, কেউ শুনলে মনে কষ্ট পাবে। তিনি সবাইকে সূর্যের মত ভালবাসতেন। সূর্য যেমন পৃথিবীকে সমানভাবে আলোকিত করে আম্মাজান আশেক-ভক্ত, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ভালবাসতেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানকে বাবাজান বলে সম্বোধন করতেন। মা'জান মাইজভাণ্ডারের গভীরতায় এতই ডুবে থাকতেন কালাম শুনে গভীর নিমগ্ন থাকতেন। আর মাঝে মাঝে কাঁদতেন।

মা'জানের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, মা'জান আমাকে একটু দোয়া করেন। মা'জান মাথায় হাত দিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌কে যেন রাখতে পারি। আমি চিন্তা করলাম এটা কি দোয়া! অনেক দিন পর বুঝলাম দোয়ার বরকত।

হযরত খাদিজাতুল ক্বোবরা (রা.) রূপে মা'জানকে দেখি। জীবনের সর্বসুখ উৎসর্গ করেন স্বামীর খেদমতে। ওফাতের আগে মা'জান প্রতিদিন মাইজভাণ্ডার যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। মাইজভাণ্ডার যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে দিন কাটাতেন।

যেদিন বুঝতে পেরেছেন তাঁর যাওয়া সম্ভব হবেনা সেইদিন পেরেশানিতে মুষড়ে পড়েন। মনে হয় তাঁর দেহ এক জায়গায় প্রাণ অন্য জায়গায়।

আম্মাজানের ওফাতের দিন বদু মামা স্বপ্না আপাকে বলছেন, তোমরা মা'জানকে এ্যাম্বুলেন্স থেকে ধরাধরি করে আনতে পারবে? আপা বলেন, ইনশাআল্লাহ্। আমি বলি, আমায় ক্ষমা করবেন। আম্মাজনকে যেভাবে করে আনলে ভালো হবে যেহেতু ভারী হবে, গোসল শরিফের পর আমি ও সেজ আপা দুজনে যখন খাটিয়াতে উঠাতে যাব দেখি ওজন এতই হালকা মনে হয় একটা গোলাপ ফুল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাখলাম – সুবহানাল্লাহ্। সেজ আপা (সৈয়দা কুমকুম হাবীবা) বলাতে তিনিও একই উপলব্ধি অনুভব করেছেন।

মা'জান নিজ শাশুড়িকে খুব ভালাবাসতেন। আমাকে শাশুড়ির সৌন্দর্যের গল্প করতেন। আর বলতেন, আমাকে বেশি ভালবাসতেন। আমি বলতাম দাদীজান কেমন ছিলেন, মা'জান বলতেন বাবা ভাণ্ডারীর মেয়ে অনেক সুন্দর ছিলেন। আমাদের ছোট মা'জানকে দেখতাম বড় মা'জানকে অধিক ভালবাসতেন, অতি আদরে যত্ন করতেন। নিজ হাতে গোসল করাতেন, খাইয়ে দিতেন। খুব খেয়াল রাখতেন। মা'জানের ওফাতের পর ছোট মা বলেন, আমি সত্যিকার মা হারিয়েছি। আমি একা হয়েছি।

মা'জানের সাথে যতবার দেখা হয় সব তারিখ দিয়ে লিখে রাখতাম। কি বলেছেন, আমি কি বলেছি সব আমার খাতায়ও আছে, অন্তরেও আছে।

মা'জান সুচারুরূপে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। কেউ যদি কারো আড়ালে কিছু বুঝাতেন, মা'জান বলতেন, তুমি কি করছ সেটা বল। সব তো ওর দোষ বলছ, তোমার কোন দোষ নেই, এমনভাবে বিচার করতেন, উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হতো।

মা'জানকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আজ কলমের কালি শেষ হয়। কিন্তু লেখা শেষ হয় না, চোখের জলে লিখা কষ্টকর তাই একেবারে শেষ তারিখে লিখতে পারা। মা'জান আমার আদর্শ। হাজারো নারী আশেক-ভক্তদের অনুকরণীয় হয়ে থাকবেন মা'জান। মা'জানের দক্ষতা ও সুদৃঢ় বিচার বিচক্ষনতা সত্যি শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে মানুষের জীবনে। আম্মাজান চলে যাওয়ার পর নারী আশেকের মনে হাহাকার উঠেছে। আর আগের মত কোন কিছুতে তৃপ্তি ভক্তরা পাবে না।

জান্নাতুল ফেরদৌস (রোকসানা)
আজিমপুর
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

তোমার দিকে আমার নজর আছে

১৯৯৭/১৯৯৮ সালের দিকে। আমার মেজ ছেলে পানিতে পড়ে মারা গেলে অনেক হতাশার পর সংকটময় মুহূর্ত কেটে উঠার লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলাম। তারপর একদিন সকাল ৮টার সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে হক মন্‌জিলে পৌঁছি।

দরবারে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজার খাদেম রুহুল আমিন সাহেবের বড় বোন আনোয়ারার নিকট আম্মা এক প্লেট খাবার দিয়ে বলেছিলেন, "লাকসাম থেকে একটা মেয়ে লোক দুইটা সন্তান নিয়ে এসেছে, তুমি তাকে খাবারগুলো দিয়ে আস"। আনোয়ারা ঘর থেকে বাইরে এসে সবাইকে জিজ্ঞেস করছিল, "লাকসাম থেকে কে এসেছ দুইটা সন্তান নিয়ে?" তখন আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না। বললাম, আমি লাকসামের। তখন আনোয়ারা আমাকে খাবারগুলো দিয়ে আম্মার কথাগুলো বললে আমি অবাক হয়েছিলাম। কেননা আমি আগে কোনদিন মাইজভাণ্ডার আসিনি, আম্মাকে দেখিনি, আম্মাও আমাকে দেখেন নি।

আবার সকাল ৯টার দিকে মাওলা বাবার সাথে দেখা করতে বড় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালে একজন মহিলা আমাকে গায়ে হাত দিয়ে তিনবার বলেছিল, "এই যে, তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ না কেন?" আম্মা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "তুমি বাবার (মাওলা বাবা) সাথে দেখা না করে যাবে না"।

আম্মাজান আনোয়ারাকে (রওজা শরিফের খাদেম রুহুল আমি এর বড় বোন) ডেকে বললেন, "আনোয়ারা, বল মেয়েটা বাবার সাথে দেখা করতে চায়"। (বাবাজান সেখানে ছিলেন) এরপর বাবাজান এসে সিড়িতে দাঁড়ান, আমি বাবাজানের নিকট আমার সব আর্জি পেশ করলে বাবাজান বলেন, "তোমার দিকে আমার নজর আছে, তুমি চিন্তা করো না"। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রহমতে আম্মাজান এবং বাবাজানের কৃপায় এখনো অনেক ভালো আছি। আম্মাজানের অপরিসীম দয়া আমাদের উপর বর্ষিত হোক, আমিন।

মরিয়ম বেগম

স্বামী– মিজানুর রহমান, মীর বাড়ি,

লাকসাম, কুমিল্লা

আম্মাজান ছাড়া কাউকে চিনি না

আমি ১৯৮৮ সালে প্রথম বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দরবারে যাই।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখে আমি শাহানশাহ্ বাবাজানের কাছে ফরিয়াদ করে তার সমাধান চাইতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। স্বপ্নের বিষয়টি নিয়ে পরের দিন সকালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ যেতে চাইলে আমাকে কেউ নিয়ে যাবে না। আমাদের চন্দনপুরা গ্রাম ছিলো শিবির অধ্যুসিত, আমার ছয় ভাইয়ের মধ্যে কেউ আমাকে নিয়ে যাবে না, আমার কোন কথা শুনবে না।

কেউ যখন আমার কথা শুনছিল না, তখন আমি ভাইদের অনুপস্থিতিতে লুকিয়ে আমার আম্মার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে আম্মাকে বলে বাড়ি থেকে দরবার শরিফের উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়ি। রিক্শা করে আমাদের পাশে বাস টার্মিনাল গেলাম। পথিমধ্যে আমার চাচার বয়সী একজনের সাথে দেখা হল, তিনি আমাকে বললেন, মা আপনি ছোট মানুষ একা একা এতদূরে কেমনে যাবেন, আপনিতো ঠিক মত গাড়িও চিনছেন না। আমি তাকে বললাম নানুপুর বলেছে, সেই বাসে কি আমি উঠব? তিনি বললেন হ্যাঁ, চল আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। লোকটা আমার পাশের সিটে বসলেন, তিনি আমাকে ছোট বলে একা না আসার জন্য পরামর্শ দিচ্ছিলেন, বলছিলেন যদি কোথাও হারিয়ে যাই, আমি তাকে বলেছিলাম ইনশাআল্লাহ্ আমি পথ হারাবো না, সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে স্বপ্নে দেখে যাচ্ছি, যেতে যেতে আমি ড্রাইভারকে বললাম দরবারের গেইটে নামিয়ে দিতে। ড্রাইভার আমাকে দরবারের গেইটে নামিয়ে দিলো, আমি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর হুজুরা শরিফে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য ভীড় প্রচুর, আমি রফিক নামে একজন ছেলেকে বললাম আমাকে যেতে দিন, আমি স্বপ্নে দেখে এসেছি। তিনি আমাকে যেতে দিতে আপত্তি জানাল, দেখছি আমার সাথে বাবাজানের দেখা হবে না। তখন আমি রফিককে অনুনয় করে বুঝিয়ে বললে সে আমাকে পৌঁছে দিলো। পৌঁছে দেওয়ার পর আমি বাবাজানকে সালাম দিলাম ও পায়ে ধরে সালাম করলাম, বাবাজানকে বললাম, আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখে আপনার কাছে এসেছি। বাবাজান অনেক দূরে সরে গিয়ে আমাকে বললেন ইয়াসিন সূরা পড়, আমি

ইয়াসিন সূরা এক মুবিন জানতাম সেটা পড়লাম, আমি দেখলাম বাবাজান অনেক জজ্‌বা হালতে আছেন।
গত রাতে নাকি একজন হিন্দু মহিলার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে কারা জানি, বাবাজানের কাছে মহিলা ও মহিলার স্বামী রাতে এসেছিলেন যুবতী মেয়ে উদ্ধারের সেই আর্জি নিয়ে। বাবাজান হিন্দু মহিলাকে গাছ থেকে সুন্দর একটি গোলাপ ফুল ছিঁড়ে হাতে দিলেন, বললেন তোর মেয়ে ফিরে আসলে রেস্তোরাঁ হতে আমার জন্য বিরিয়ানি ভাত, কোরমা, ডিম নিয়ে আসবি। দেখছি হিন্দু মহিলা মেয়েকেসহ হাজির হয়ে বাবাজানের কাছে শোরগোল করছে, বাবাজান কিন্তু আমার সাথে কথা বলতে উদ্যত হয়ে আছেন।
বাবাজান কিছুক্ষণ পর প্লেটে খাবারগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি যখন তাকিয়ে থাকি অর্ধেক ভাত, কোরমা, ডিম আমাকে দিলেন এবং বললেন, "খেয়ে চলে যান"। বাবাজান আপনি করে কথা বলতেন। তিনি আবার বলেন, "কেন চলে যাবেন জানেন? আপনি কিছু চিনেন না, ওই গাড়িটা আমি নষ্ট করে দিয়েছি, ওই গাড়িটা ঠিক করতে করতে আপনি গিয়ে পৌঁছালে আপনাকে টার্মিনাল নামিয়ে দিবে, সোজা রিক্‌শা নিয়ে যাবেন। আমি দেখে আছি, বাড়ি চলে যান"। ওইদিন কিন্তু মা'জানের সাথে আমার দেখা হয় নি। দরবারে মহব্বত পেয়ে আমি যাওয়া আসা করি। আরেকবার বাবাজান আমাকে বললেন, "এখানে আর আসিয়েন না, নিচে যান"। আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি। ইতিমধ্যে মাথায় আসলো নিচে যেতে বলতে মা'জানের কাছে যেতে বললেন, মা'জান এর কাছে গেলাম, মা'জান এর সাথে দেখা হওয়ার পর শহর থেকে গেছি শুনে আমাকে অনেক সম্মান ও ইজ্জত করলেন। যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দরবারে আমার গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম একসময়, আমার মা একটা মামলায় পড়েছিলেন। মামলায় পড়ার পর মা'জান বললেন আপনার মাকে আনলেন, আসামী কোথায়। আমি বললাম আসামী যাকে দিয়েছে তার কোন দোষ নাই।
মা'জানের কাছে কোন পুরুষ যাওয়া নিষেধ, তবুও কেন জানিনা মা'জান আমার ভাইকে ও আমাদের ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার তিন মাস পর আমরা মামলা থেকে মুক্তি পেলাম।
আমি দরবারে চন্দনপুরার সাজু বা শহরের সাজু নামে পরিচিত হয়ে গেলাম, ওখানে বিবিরহাটের আরেকজন সাজু ছিলেন, যার কারণে চন্দনপুরার সাজু বা

শহরের সাজু নামে আখ্যায়িত করেছেন। বাবাজানের মমতা মা'জানের আধ্যাত্মিকতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, মা'জানের সুমধুর আদর আপ্যায়নে আমি যদি গোসল করার কাপড় না নিয়ে যেতাম, নিজের কাপড় দিয়ে গোসল করে আসতে বলতেন।

একবার একজন খুব ধনী মহিলা আমাকে দেখিয়ে মা'জানকে বললেন, তিনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? মা'জান বললেন, যেখানে সুযোগ হয় থেকে চলে যাবেন। মা'জান ওই মহিলাকে রাগান্বিত স্বরে বললেন, তোমাদের মত এত আদর যত্ন করতে হয় না, তারপর আমাকে পিছ দেন নি। এগুলো বলে আমাকে উঁচু করলেন, এগুলো ভুলার মত না। মা'জানকে আমি দেখতে যেতে পারিনি তখন আমি বেশি অসুস্থ ছিলাম, মনে হয় ওমরাতে ছিলাম আমি। এখন আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, ৬৬ বছর বয়স হয়ে গেছে। আমি এবার হজে যেতে পারিনি ভিসা পাই নি। আমি খুব কান্না করছিলাম, মা'জান থাকলে তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে নিশ্চয় কাজটি হতো, কিন্তু মা'জানকে পাইনি। মা'জান ছাড়া তো আমি কাউকে চিনি না, আর কারো সাথে আমার যোগাযোগও নেই।

সাজেদা বেগম

চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম

বাবা, আপনি একটু আমাদের ঘরে আসেন

আমি বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজান কেবলার একনিষ্ঠ গোলাম ও খাদেম, বাবাজানের বেছাল শরিফ উপলক্ষে জানাযা শরিফের গোলামীখানা আমি অধমের দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছেন। বাবাজানের ৩৫ বছর পর আম্মাজান পর্দা করেছেন, আম্মাজানের গোলামীও আমি করেছি। এই হিসেবে আমি গুনাহ্গারের এই পরিচয় আমি মাইজভাণ্ডার শরিফের একনিষ্ঠ গোলাম ও খাদেম। গোলামী করি, দোয়া করবেন আমি যেনো গোলামীতে থাকতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ্!

শাহানশাহ্ বাবাজান কেবলা কাবার সহধর্মিনী উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম বাবাজানের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এমনকি শাহানশাহ্ বাবাজান যেটাই বলতেন আম্মাজান সেটাই করতেন। প্রথমত আম্মাজানের সাথে আমার কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। শাহানশাহ্ বাবাজানের দয়ায় আমি মাইজভাণ্ডার শাহী জামে মসজিদের ইমাম।

একদিন বাবাজান আমাকে বললেন, "বাবা, আপনি একটু আমাদের ঘরে আসেন, আমার শাহ্জাদীদের ও মিয়া হুজুর (মওলা হুজুর)কে সবক দিতে হবে"। অর্থাৎ, বাবাজানের কন্যাদের সবক দেওয়ার জন্য। কিন্তু মওলা হুজুরকে সবক দেওয়ার বিষয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবের রুমে শাহানশাহ্ বাবাজান নিজে গিয়ে আমাকে বললেন, "আমার শাহ্জাদাকে আপনার দ্বারে সবক দেওয়ার জন্য আমি খেয়াল করেছি"। ইমামের রুম মসজিদের পাশেই ছিল। তখনি আমি বাবাজানকে সালাম করে বললাম যে, বাবাজান আপনি ঘরে যান, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমপারা নিয়ে আসছি। এরপর আমি আমপারা নিয়ে গেলাম। বাবাজান আমাকে বললেন, প্রতিদিন আপনি এসে একটু আমার ছেলে-মেয়েকে পড়িয়ে যাবেন। সেদিন থেকে ভিতর বাড়ি যেতাম কিন্তু আম্মাজানের সাথে দেখা হয়নি।

আমি শাহ্জাদী ও মওলা হুজুরকে পড়াতাম। মন্জিলের সামনে আম গাছের নিচে যে ঘরটা ছিল, সেখানে পড়াতাম। নানুপুরের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ঘোষ বাবুও পড়াতেন। এই ঘরটা পড়াশোনার জন্য করা হয়েছিল।
একদিন হঠাৎ শাহানশাহ্ বাবাজান হাল অবস্থায় পড়ার রুমে প্রবেশ করে আমার সাথে গরম হয়ে কথা বলতে লাগলেন। আমি তখনও বাবাজানকে চিনি নি।

তখন আমরা চারিদিকে ওয়াজ-কালাম করতাম। বাবাজান যে, এতবড় মোকামের এটা আমি বুঝিনি। আমি মনে মনে খেয়াল করলাম, আর পড়াতে যাবোনা। আমি শিক্ষক মানুষ আমাকে বকাবকি করলেন, কিন্তু নাম-টাম ধরেন নি। হঠাৎ করে তারপর দিন বললেন, তাদেরকে পড়াতে যান। আমি বললাম, বাবাজান আমি আর না যাওয়ার জন্য খেয়াল করেছি। বাবাজান বললেন, "না না, একটা আম, আমটা পেকে গেছে, এই আমটা ধরার জন্য চেষ্টা করছি"। তখন আমি ভাবলাম, এটা আমাদের ব্যাপার না এটা তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপার। পরে খাদেমগণ বললেন, বাবাজান এই ঘরটাতে সবসময় যান। আম্মাজান আরেকটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। সেটা বেড়ার ঘর ছিল তখন পাকা দালান হয়নি।

পড়াবার সময় একদিন এক খাদেম না বলে বদনা নিয়ে গেছে। আম্মাজান সেটা জানতে পেরে খাদেমকে শাসন করেছিলেন। এতে শিক্ষকের প্রতি আম্মাজানের শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

একদিন একজন আশেক মালামাল ও দুই লক্ষ টাকা বাবাজানের জন্য হাদিয়া স্বরূপ এনে আমদানীখানায় রাখলেন। তৎকালীন ঢাকার শহীদুল্লাহ্ কেরানী শাহানশাহ্ বাবাজানের কাছে গেলেন হাদিয়া মালামাল ও টাকাগুলো কী করবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তখন শাহানশাহ্ বাবাজান বলেন, এই মালামাল ও টাকাগুলো অর্ধেক হযরত কেবলা আলমের, অর্ধেক বাবাজান কেবলার কাছে দিয়ে আসো"।

বাবাজানের সিদ্ধান্তের পরেও কেরানী শহীদুল্লাহ্ আম্মাজানের কাছে গেলেন। শহীদুল্লাহ্ কেরানী আম্মাজানের কাছে গেলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এই মালামাল এখানে কেন? শাহানশাহ্ বাবাজানের জন্য হলে তাঁর কাছে নিয়ে যাও। আম্মাজানকে শহীদুল্লাহ্ বললেন, আমি বাবাজানের কাছে গিয়েছি তারপরও আপনার কাছে আসলাম। কেরানীর এমন আচরনে আম্মাজান অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বাবাজান যা বলেছেন তা করেন"। পরবর্তীতে কেরানীর এমন কার্যকলাপে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করেন।

বাবাজানের হুকুম আম্মাজান খুব ভালোভাবে মেনে চলতেন। একদিন শাহানশাহ্ বাবাজান বললেন, চলেন শহরে যাবো, শহরে যাওয়ার পথে কাটিরহাটে হযরত

পানিশাহ্ (রহ.) মাজারস্থ মৌলানা আবদুল খালেকের বাড়ি গেলেন। সাথে আম্মাজান, মওলা হুজুর এবং আমি ছিলাম। আম্মাজান তেমন কোথাও যেতেন না, আম্মাজান বাবাজানের হুকুম মানতেন। শহরের রিয়াজউদ্দিন বাজার চৈতন্যগলিস্থ বাবাজানের বড় জামাতা রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী সাহেবের বাসায় আম্মাজানকে রেখে গেলেন। সেখান থেকে শহরের আলমাস সিনেমার পাশে বাবাজান সহ হালকা নাস্তা জাতীয় খাবার খেলাম। দোকানদারকে বাবাজান ৫০০ টাকা দিলেন, দোকানদার আমাকে বাকী অর্থ ফেরত দিচ্ছিলেন, আমি বললাম বাবাজানের টাকা আমি কিভাবে নেবো?

বাবাজান যখন আম্মাজানকে যা করতে বলতেন, আম্মাজান খুবই মনোযোগ সহকারে তা করতেন। নবী করিম (দ.)-এর প্রতি নিবেদিত উম্মুল মু'মিনীন মা খাদিজাতুল ক্বোবরা (রা.) যেমন ছিলেন তেমনি শাহানশাহ্ বাবাজানের প্রতিও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম। আম্মাজানের কথা শুরু করতে গেলে একটি পুঁথি হবে, কিন্তু শেষ হবে না। আম্মাজান সবাইকে স্নেহ করতেন। আম্মাজান আমাদের নাজাতের উসিলা হোন, আল্লাহুম্মা আমিন।

মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফোরকানী
সাবেক খতীব ও পেশ ইমাম
মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী জামে মসজিদ

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের স্নিগ্ধ অন্তর্দ্যুতিঃ শ্রদ্ধেয় আম্মাজান

ড. হাসনে আয়মুন

॥ ১ ॥

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

আমাদের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতার এই দুটো চরণে নারী সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রবর্তিত ইসলামের চেতনা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মানব জীবন, জগৎ ও সমাজে নারীর অন্তহীন সৃজনশীল ভূমিকাকে ইসলাম কখনো খাটো করে দেখেনি। মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত--এই মহান বাণীর মধ্যে মহানবী (দ.) নারীর মর্যাদা ও গৌরবকে শাশ্বত উচ্চাসনে সংস্থাপন করেছেন।

সৃষ্টি তত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবার সর্ব বিষয়ে নারীর ভূমিকা কোন অংশেই পুরুষের চেয়ে অপ্রধান নয়। বরং অত্যন্ত দৃঢ়তাসহকারে বলা যায় যে, জগতে-জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে পরিবারে নারী ও পুরুষের অবস্থান ও ভূমিকা সর্বাংশে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর ইতিহাস, মানব জাতির ইতিহাস, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে নারীর অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ গৌরবময় ভূমিকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে সবিস্তার ইতিহাসে না গিয়ে শুধু ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি নবী মাতা আমেনা (রা.), নবী পত্নী হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমার (রা.) কী গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে।

জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হযরত খাদিজা (রা.) যেন শিশু ইসলামের লালন কারিনী। তাঁর সুদৃঢ় মনোবল, হিমালয় সদৃশ অটল ব্যক্তিত্ব, সুগভীর প্রজ্ঞা, অন্তদৃষ্টি ও দূরদর্শিতা ছিল মহাসত্য সন্ধানী হযরত মুহাম্মদ (দ.) দৃশ্যমান বাস্তব জগতের জাহেরী সহায়ক শক্তি। মা হযরত আয়েশা (রা.) মহান, স্থিতধী ও সুগভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন একজন শিক্ষিকা হিসেবেই এখনো বরিতা। মা হযরত ফাতেমাকে (রা.) দেখা গেছে কখনো রণক্ষেত্রে সেবিকা হিসেবে, শৈশবে দেখা গেছে তাঁর পিতার উপর জুলুমকারীদের সামনে

দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাতে। এভাবে শুধু মহানবীর (দ.) জীবনে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রত্যেক সফল মহাপুরুষের জীবনে কখনো মা হিসেবে, কখনো পত্নী হিসেবে, কখনো বোন হিসেবে, কখনো কন্যা হিসেবে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। দার্শনিক, নেতা অলি দরবেশ, মহান গবেষক সবার জীবনে সাফল্যের পশ্চাতে আমরা দেখি নারীর ভূমিকা ও অবদান।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র মহান জীবনের প্রথম দিকের কথাই ধরা যাক। তিনিই ইসলাম ধর্ম এবং জীবন বিধানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দাঁড় করিয়ে গেছেন এবং এর পরিপূর্ণতা তাঁর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর ইসলাম ধর্মের প্রচারণায় যিনি অন্তঃপুরে থেকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন তিনি হযরত খাদিজা (রা.)। মহানবী (দ.) দীর্ঘ সময় হেরা পর্বতের গুহায় খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। ধ্যানরত অবস্থায় যেদিন প্রথম তাঁর উপর ওহী নাজিল হল সেদিন তিনি ঈষৎ সন্ত্রস্ত ছিলেন। গৃহে ফেরার পর হযরত খাদিজা (রা.) নবীজীর কাছে জানতে চাইলেন, কি হয়েছে? নবীজী (দ.) জবাবে সব ঘটনা খুলে বললেন এবং তিনি আরো বললেন যে, "কিছু একটা তাঁর উপর আছর করেছে। সে সময় খাদিজা (রা.) নবীজী (দ.)কে সান্তনা দিয়ে বলেন, "আপনি আমীন বা বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব। অপয়া কোন কিছু আপনার নিকট আসার সাহস করবে না" জাহেরীভাবে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, একেবারে একাকী, হযরত মুহম্মদের (দ.) পাশে সেদিন এই মহিয়সী নারী ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

॥ ২ ॥

একটু আগে পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে, অলি দরবেশ নেতাসহ প্রত্যেক সফল মহা মানবের সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে মহিয়সী নারীদের নীরব অথচ প্রবল ভূমিকা। তেমনি এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনে। তাঁর কঠোর অকল্পনীয় রিয়াজত-সাধনাকালে তাঁর পাশে মৌনা, স্নিগ্ধ, শুভ্র হিমালয়ের মতো অটলস্থৈর্য নিয়ে যাকে আমরা দেখি তিনি আজ লক্ষ মানুষের পরম শ্রদ্ধেয়া 'আম্মাজান'-- আমাদের মমতাময়ী 'দাদু'।

তিনিই আজকের এই নিবন্ধের উপজীব্য। আমাদের এই পার্থিব জীবনে অগণিত অনেক কিছুর প্রভাব বিদ্যমান। মহাজগতের এসব উপাদানের অনেক উৎস আমরা চোখে দেখি না। হয়তো সচেতনভাবে অনুভবও করি না। অথচ আমাদের সচল জীবনে এসবের প্রভাব সক্রিয়। তেমনি এক প্রভাবের অধিকারিনী এই মহিয়সী নারী। বার আউলিয়ার পুন্যভূমি এ চট্টগ্রাম। বহু সাধক অলি-আউলিয়ার আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে এ পুন্যভূমি। ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ মঙ্গলবার এ ভূমির কোলে জন্মগ্রহণ করেন এক শিশু। কালের বিবর্তনে এ শিশুই রূপ নেন একজন মহান সাধকে। তিনি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার মাইজভাণ্ডার গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর, তারুণ্যের দীর্ঘসময় তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। চৌদ্দই মাঘ, মঙ্গলবার; তাঁর ঘরনী হয়ে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে নববধূরূপে প্রবেশ করেন ফটিকছড়ি থানার দাঁতমারা ইউনিয়নের প্রখ্যাত জমিদার জনাব বদরুজ্জামান সাহেবের কনিষ্ঠা মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী (রহ.)।

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা দৈনিক আজাদীর সিনিয়র বার্তা সম্পাদক, বিশিষ্ট কলামিস্ট, সাংবাদিক মোঃ মাহ্‌বুব উল আলমসহ অনেকের মুখে শুনেছি, বইতে, পত্রিকায় পড়েছি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিয়ের আসর থেকে মাইজভাণ্ডার শরিফ ফিরে এসে প্রবেশ করেন রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর দিকে লবণের গুদামে। হিমশীতল সে গুদাম। সে গুদামে ঢুকলে সারা শরীর আপনা থেকেই মিইয়ে আসে। তখন এই এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সাপ-খোপের নিরাপদ আস্তানা। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) রত রিপু জয়ের সাধনায়, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া জয়ের সাধনায়, আত্মজয়ের সাধনায়। দুনিয়াবী বিচারে পরিস্থিতি-পরিবেশ অস্বাভাবিক। কিন্তু, আশ্চর্য। সে নিরুত্তাপ বিষন্ন পরিবেশে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না নববধূ মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী (রহ.)। জীবনের অমোঘ সত্য বলে সহজভাবে গ্রহণ করলেন সব কিছুকে। নিজেই নিজের জীবনের নির্বিকার দর্শক যেন!

মহৎ কিছুকে বুঝতে হলে দরকার মহৎ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মতো বড়ো মাপের মানুষকে জানতে

ও বুঝতে হলে দরকার সচেতন-সংবেদনশীল হৃদয়ের। সে হৃদয় যে অবশ্যই আম্মাজানের আছে, তা সমকালীন ঘটনা প্রবাহের পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার হয়ে উঠে। শুভ বিবাহের এগারো দিন পর নববধূকে বাপের বাড়িতে ফিরতি নাইয়র নেয়ার জন্য এলে স্বামী হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রথম দিন যেতে সম্মতি দেননি। পরদিন যেতে বলেন। তবুও রেওয়াজ মতো ফিরতি নাইয়র নিয়ে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করা হয়। কী আশ্চর্য। মাইজভাণ্ডার শরিফের পশ্চিমে বিনাজুরী খালের কুলে উঠতেই জীপের চাকা খুলে যায়। তবে অলৌকিকভাবে কোন বিপদ ঘটেনি। তাঁরা আবার ফিরে আসেন। পরদিন যান। এভাবেই বোধ হয় অধ্যাত্ম সাধক হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সাথে আজকের 'মোসাম্মাৎ মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী (রহ.)'র প্রথম প্রকৃত পরিচয়। তাঁদের প্রথম সন্তান কন্যা। সে সন্তানকে হযরত সৈয়দ জিয়াউল মাইজভাণ্ডারী (ক.) একদিনও কোলে নেননি। বলতেন, "পরের মেয়েকে কোলে নিয়ে কি লাভ? ওখানে ফেলে রাখুন। উইপোকায় খেয়ে ফেলবে।" সে সন্তান মারা যায় মাস দুয়েক সময়ের মধ্যে মামার বাড়িতে। মৃত্যু সংবাদ পিতার কাছে জাহেরীভাবে পৌঁছার পূর্বে পিতা শাহানশাহ্ (ক.) এবং হযরত সৈয়দ শামসুল হুদা মাইভাণ্ডারী (ক.) রওজা শরিফ মাঠে এক টুকরা কাঠের জানাযা পড়েন এবং গর্ত করে দাফন করেন। এই পুরো ঘটনায় প্রমাণিত হয় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর কাশ্‌ফ শক্তির। 'আম্মাজান' এ শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন জীবনের সূচনায়। এ শক্তিকে ধারণ করার শক্তি যে আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন পরবর্তী জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সে সাক্ষ্য বহন করে।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজেই আত্মজয়ের সাধনা করে ক্ষান্ত হননি। ঘটনা প্রবাহ দৃষ্টে মনে হয়, "আম্মাজান"কেও সেই কঠিন পথের অভিযাত্রী করেছিলেন এবং সেই দুস্তর পথ পারায়ে এনেছিলেন। এমনকি প্রচন্ড শীতকালে স্যাঁতস্যাঁতে নড়বড়ে বেড়ার ঘরেও রেখেছিলেন তাঁকে। এ ধরনের আরো বেশ কিছু ঘটনার কথা জানা যায়। যেগুলোতে প্রতীয়মান হয় প্রাকৃতিক, শারীরিক, মানসিক প্রতিকূলতা, কষ্ট সহ্য ও স্বীকার করার মতো করেই তাঁকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক। যিনি শীত-গ্রীষ্মতাপ সহ্য করে নিজের শরীর ও মনকে পোঁড়া সোনার মতো করে তুলেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সম্মানিতা সহধর্মিনীরও একই উত্তরণ ও বিকাশ কামনা করবেন। বলা বাহুল্য, "আম্মাজান" নিজেকে

সেভাবে গড়ে তোলার পথে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সফলভাবে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই মানসিক উত্তরণ-যাকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় উরুজ বলা হয়– শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আধ্যাত্মিক জীবনের চলার পথকে সুগম, মসৃন, নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও আলোকিত করেছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যান্য অনেক সফল মহাপুরুষের জীবনে সহধর্মিনীদের যে ইতিবাচক ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি এক ভূমিকায় আমরা পাই "আম্মাজান"কে, আমাদের 'দাদু' কে।

॥ ৩॥

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া হক মন্‌জিলের অন্দরে প্রবেশের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই ছোটবেলা থেকেই আব্বুর সাথে দরবার শরিফে যেতাম। আব্বু আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতেন। তখনও কিন্তু দাদুর চুলে পাক ধরেনি। শুভ্র শাড়ীতে তাঁকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা মহীয়সী মনে হতো। প্রথম বার আমি ভেতরে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম তিনি পত্রিকা পড়ছেন। আমাকে দেখে তিনি হাসলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আম্মা কেমন আছেন জানতে চাইলেন। আমি উত্তরে শুধু 'ভাল আছে' বললাম। এরপর তিনি আমাকে জিলাপী খেতে দিলেন। একটা শেষ হতে আরেকটা হাতে ধরিয়ে দেন। এভাবে তিন কি চারটি খাওয়ার পর বললাম, আর খাব না। তিনি বললেন, "ছোটদের বেশী করে খেতে হয়।" এরপর আব্বু আমাকে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কাছে নিয়ে গেলেন। অনেক লোক তাঁর দর্শন লাভের প্রত্যাশায় ব্যাকুল। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে তিনি আমার হাত থেকে সিগারেট ও দিয়াশালাই নিলেন এবং বললেন: ওম্মা, মেয়েকেও নিয়ে এসেছেন, মেয়েকেও নিয়ে এসেছেন। তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে শহরে চলে যান।"

'দাদু' অর্থাৎ লক্ষ নর-নারীর শ্রদ্ধেয়া 'আম্মাজান'কে আমি ছোট বেলায় যেমন দেখেছি এখনও ঠিক তেমনি আছেন। মুখে সব সময়ই হাসি লেগেই থাকে। প্রতিদিন শত শত মহিলা হক মন্‌জিলে যায়। তিনি সবার সাথেই হাসি মুখে কথা বলেন। সবার প্রশ্নের উত্তর দেন। কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। তিনি নিজেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। কাউকেই তিনি না খাইয়ে ছাড়েন না। প্রতিদিন শত শত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, রোগ বালাই, আকুতি-মিনতির কথা তিনি অত্যন্ত

ধৈর্য্যসহকারে শোনেন। তাদেরকে সুপরামর্শ দেন। দাদু যেন ধৈর্য্যের এক মূর্তপ্রতীক। তাকে কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি। বিরক্তির কোন ছায়াই দাদুর মধ্যে নেই। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই একটানা হাজার হাজার মানুষের আকুতি-মিনতি শোনা, তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় সুপরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। দাদু মহীয়সী বলেই তা পারেন।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করার পর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গিয়েছিলাম দাদুকে সালাম জানাতে। দাদুকে সালাম করে বললাম, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দেব, আমার জন্য দোয়া করবেন। দাদু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ওখানেতো সেশনজট। একবার ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। দাদুর এ কথা আমার জন্য আশীর্বাদ হয়েই রইল। এর কিছুদিন পরই ভার্সিটি নয় মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

॥ ৪ ॥

হক মন্‌জিলে প্রবেশের জন্য যে রাস্তাটি রয়েছে, তার এক পাশে ছোট ছোট গাছ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। দেখলে মনে হয়, গাছগুলো সবাইকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটি একেবারেই নিরব, নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। এ এক পিন পতন নিরবতা। যেখানে এক মনে ধ্যান করা যায়। হক মন্‌জিলের যে ঘরটিতে 'দাদু' থাকেন, তা অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো গুছানো। সব কিছুই ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। একপাশে একটি খাট, একপাশে ড্রেসিং টেবিল, আলনা, মাঝখানে কিছু ফাঁকা জায়গা। যখনই দরবারে যাই, এবাদতের সময় ছাড়া সর্বদা দাদুকে পাওয়া যায়। ভেতরের ঘরে খবর পৌঁছা মাত্র আস্তে আস্তে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে তিনি বৈঠকখানায় আসেন। বৈঠকখানার পূর্বদিকের কোণার চেয়ারটায় তিনি বসেন। দাদুর দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকালে বুঝা যায়, তিনি জিকিরে রত আছেন। দাদু সব সময়ই দোয়া করেন একটি বাক্য দ্বারা, আর তা হল: "আল্লাহ্ তোমার আশা পূরণ করুন।"

গত বছর আমরা সবাই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গিয়েছিলাম 'দাদু'র সাথে দেখা করতে। ঢুকতেই দেখলাম একটি পরিবার এসেছে তাদের ছোট বাচ্চাটিকে নিয়ে। আমাদের দেশের রেওয়াজ অনুযায়ী পাঁচ মাস বয়সে শিশুদের মুখে ভাতের লোকমা দেওয়া হয়। আর সেই পরিবারটি চায় তাদের ছোট শিশুটি 'দাদু'র হাতেই যেন প্রথম ভাত জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। 'দাদু' টিফিন কেরিয়ার

থেকে একটু পায়েস নিয়ে আদর করে শিশুটির মুখে তুলে দিলেন এবং হেসে সাদরে বললেন, "আমি না, আমি না। বরং আপনারা বাচ্চাকে নিয়ে মাজার শরিফে যান।" এরপর 'দাদু' আমাদেরকে নিয়ে বৈঠকখানায় গেলেন। সেখানে এক অতি প্রবীনা বৃদ্ধা তার প্রতিবেশীর দ্বারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তা 'দাদু' কে জানালেন। দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "দু'দিনের এই দুনিয়ায় মানুষ যে কেন ঝগড়া ফ্যাসাদ করে বুঝিনা।"

আমাদের পাড়ার এক অতি দরিদ্র মহিলা যিনি সব সময়ই মাইজভাণ্ডার শরিফে যান; তাঁকে 'দাদুর' কথা জিজ্ঞেস করলেই বলেন, "আম্মাজানের মত মানুষ হয় না। তিনি এত বড় হয়েও আমাদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলেন। খেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করেন। তাঁর কাছে অকপটে মনের কথা খুলে বলা যায়। তিনি শান্তি ও সান্ত্বনা দেন।" এভাবে দাদু পরিণত হয়েছেন হাজার হাজার লোকের প্রশান্তিপূর্ণ আশ্রয়ে।

হজে যাবার আগে দাদুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আম্মুকে নিয়ে শাহ্জাদা হুজুরের বাসায়। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম মাত্র কিছুক্ষণ আগে তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে এসেছেন। এটা শুনে নিজেরাই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে গেলাম। কারণ, তিনি এতদূর জার্নি করে এসেছেন। ক্লান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, আমাদেরকে বসতে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরই 'দাদু' হাসিমুখে এলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। তাঁর ক্লান্ত মুখখানা দেখে নিজেরই মায়া লাগছিল। টুকটাক কিছু কথাবার্তার পর তিনি হাসিমুখে দোয়া করলেন। তিনি আমাদের শুভ কামনা করলেন। আমরাও হজ থেকে তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করলাম।

॥ ৫ ॥

মানুষ মানুষের সাথে অন্তরের যে বাঁধনে আটকে পড়ে, সে বাঁধন এতোই মজবুত যে, তা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। 'দাদু' লক্ষ মানুষকে অন্তরের এই বাঁধনে বেঁধেছেন স্নেহ-মমতার মায়া ডোরে। আমরা তাঁর মায়া-মমতার বাঁধনে বন্দী। বড়ই শীতল, মধুর সেই বন্দীত্ব। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ লাখো কোটি মানুষের মতো আমাদেরও নিরাপদ আশ্রয়। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের প্রাণপুরুষ হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান

মাইজভাণ্ডারী (ক.), খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), মৌন সাধক হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ শামসুল হুদা মাইজভাণ্ডারী (ক.), বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রমুখ প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষের সহমর্মী, মদদগার, ছায়াদার হিসেবে বিরাজ করেছেন। মাইজভাণ্ডার শরিফমুখী কাফেলার শেষ নেই। কোন দিন শেষ হবে না। আমরাও সে কাফেলার পথিক। গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আজ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) নেই। কিন্তু এখনো 'আম্মাজান' আমাদের 'দাদু' আছেন। শুনেছি; শাহানশাহ্ হুজুর বলতেন 'আমাকে না পেলে আপনাদের আম্মাজানকে বলবেন। তিনি পেলে আমি পাবো। তিনি শুনলে আমি শুনবো।'

শাহানশাহ্ হুজুরের এই উক্তির মাঝে নিহিত "আম্মাজানে"র মর্যাদার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। আম্মাজান বা আমাদের দাদুকে আমি সচেতনভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁকে অনুভব করেছি। তিনি গাউসিয়া হক মন্‌জিলের এক অনুপম ঐশ্বর্য। শাহানশাহ্ হুজুরের মাজার শরিফের শুভ্রতার অভ্যন্তরে তিনি শুভ্রতর এক মুক্তা-যে মুক্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্যুতি বিকীরণ করে চলেছে। সে দ্যুতি অন্ধকারে আলো ছড়ায়। অশান্ত মনে প্রশান্তি ছড়ায়। বিরান হৃদয়ে ছড়ায় স্নিগ্ধ শীতল বারিধারা।

কবি নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতাকে একটু পাল্টিয়ে বলা যায়:

"হক মন্‌জিলের জলোয়া দেখেছ, দেখেছ কি তার শান?
অন্তরে তার 'মা-মুনাওয়ারা', বাহিরেতে 'বাবাজান''॥
আমরা সকলেই তাঁর দোয়া প্রার্থী।

হাসনে আয়মুন
এম. এস. এস (অর্থনীতি) শেষ বর্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ
প্রকাশকাল: মাসিক আলোকধারা, অক্টোবর, ২০০২ ইং

খাদেম-খাদেমা

মুনিবের খেদমত কর

আমি রুহুল আমিন। আমার বাড়ি কুমিল্লার লাকসাম থানার দুখাইয়া ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে। আমি ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম মাইজভাণ্ডার আগমন করি। তখন আমার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আমার এক চাচার সাথে আমি মাইজভাণ্ডার আসি। তিনি প্রথমত আমাকে আনতে নারাজ ছিলেন। পরে আমার আব্বা আম্মার অনুমতি পেয়ে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। ২২শে চৈত্র হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা এ কাবার উরস শরিফে লাখো আশেক-ভক্তদের জনস্রোতের মাঝে আমরাও অংশ নেই।

আমি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)এর নিকটে বায়াত গ্রহণ করি। এরপর থেকেই আমি নিয়মিত দরবারে হাজির হই। বাবাজানের খেদমত এ নিয়োজিত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করতাম। বাবাজানও আমাকে অনেক ভালবাসতেন। শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলে তিনিও আমাকে অনেক মায়া করতেন। বাবাজান এর আদরযত্ন আমাকে দরবারের প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট করে তোলে।

১৯৬৮ সালে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন বাবাজান 'আন্‌জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী' নামে একটি সংগঠন করেন এবং আমাকে উক্ত সংগঠনের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়। দরবারের খেদমতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আমি অনেক আনন্দিত হই।

বেশকিছুদিন পর হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর বড় শাহ্‌জাদা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)কে খেলাফত প্রদানের মাধ্যমে পীরের আসনে আসীন করেন।

আমি ঢাকায় এসে কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই শাহানশাহ্ বাবাজান এর কাছে কিছু হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হব। সেক্ষেত্রে আমরা পরামর্শ করেছিলাম যেহেতু আষাঢ় মাস সেহেতু ফজলি আম নিয়ে যাওয়াটাই যথাযোগ্য হবে। আমরা ঊনত্রিশ জন ছিলাম। সবার নজরানা একত্রিত করে কিছু আম ও হাদিয়া স্বরূপ কিছু টাকা নিয়ে দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

দরবারে এসে শুরুতেই হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন বাবাজান এর নিকটে যাচ্ছিলাম। কিন্ত মাইজভাণ্ডার জামে মসজিদের সামনে এসে আশেকানদের

ভিড়ের কারণে কিছুতেই সামনে আগাতে পারছিলাম না। অনেক চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে পিছনে ফিরে দেখি সেকান্দার সাহেব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম দাদা শাহানশাহ্ বাবাজান এর জন্যে কিছু হাদিয়া এনেছি তিনি কি আছেন? একথা বলামাত্র দূর থেকে শাহানশাহ্ বাবাজান ডাক দিয়ে বললেন, "রুহুল আমিন এসেছো? এদিকে আসো।" কাছে গিয়ে ভক্তি জানালাম। বাবাজান বললেন, "ফজলি আম এনেছো? তোমার আম্মাজানকে দিয়ে আসো"। আমি বাবাজান এর আদেশক্রমে আম্মাজানকে আম দিয়ে আসি।
এরপর বাবাজানকে হাদিয়ার টাকা দিতে গেলে তিনি অন্যান্য খামগুলো দেখছেন আর উপরের নামগুলো পড়ছিলেন। আমি হাদিয়াসমূহ হযরত বাবাভাণ্ডারী, হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন বাবাজান ও শাহানশাহ্ বাবাজান এর নামে চারভাগে ভাগ করে রেখেছিলাম।

মুহূর্তের মধ্যেই বাবাজান জজ্বাহালে উচ্চস্বরে বললেন, "আমি কে চিন তুমি? আমি গাউসুল আযম আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী, আমিই বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা, আমিই দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, আমিই শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী।" তৎক্ষণাৎ আমি ভয়ে কাতর হয়ে বাবাজান এর কদমে তাজিমে রত হয়ে গেলাম। বাবাজান নির্দিষ্ট একটি স্থান দেখিয়ে বসতে বলে বললেন, "কিছুদিন থাক, ঘোরাফেরা কর", এই বলে হাদিয়ার খামগুলো নিয়ে চলে গেলেন।

বাবাজান এর আদেশ অনুযায়ী সেই রাত হক মন্‌জিলে কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন বাবাজান ঘুরে আসার নির্দেশ দিলে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন বাবাজান এর সাক্ষাতে যাই। আমাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, "রুহুল আমিন তুমিতো গতকাল সকালে এসেছ"। আমি হতবাক হয়ে বাবাজান এর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবাজান আমার আমগুলো কবুল করলেন এবং তাবার্‌রুক এর ন্যায় আমাকেও একটি দিলেন। আমি তা রুমালে বেঁধে নিলাম।

দরবারে কিছুদিন থাকার পর বাড়ি ফিরে আসি। বেশ কিছুদিন পর আবার আব্বাকে বললাম, আমি মাইজভাণ্ডার যাব। সেখানে আমি দায়িত্বরত আছি। এই বলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আবারো দরবারে ছুটে আসি। তখন শাহানশাহ্ বাবাজান আমাকে চাকরি ছেড়ে আসার নির্দেশ দেন। আমি বিষয়টি দেলাওর হোসাইন বাবাজানকে বললে তিনি বলেন, "বড়মিয়া তোমাকে অনেক

ভালবাসে। তুমি বড়মিয়ার কাছে খেদমতে থাকো"। বাবাজান এর আদেশ পেয়ে আমি শাহানশাহ্ বাবাজান এর খেদমতে চলে আসি।
আম্মাজান আমাকে অনেক মায়া করতেন। তিনি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। সবসময়ই খোঁজখবর নিতেন। যখনই আম্মাজান এর কাছে যেতাম, খাবার খেয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। আশেকান ভক্তগণ থেকে শুরু করে খেদমতকারী সকলের প্রতি আম্মাজান এর অন্তরে অগাধ ভালবাসা ছিল।

১০ই মাঘ হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর উরস শরিফের নেয়াজ তাবার্‌রুক নিয়ে আমি পশ্চিমবাড়ি থেকে হক মন্‌জিল এ আসি। বাবাজান আম্মাজান এর কাছ থেকে খাবারের বাসন আনার নির্দেশ দেন। আম্মাজান ছোট একটি রুমের মধ্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন। আম্মাজানকে বললাম তাবার্‌রুক নিয়ে এসেছি। আম্মাজান মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে আশেকানদের মাঝে তাবার্‌রুক বিতরনে সহযোগিতা করলেন। তিনি অনেক পরিশ্রমী ছিলেন। আশেকানের প্রতি ভালবাসা নিজের সন্তানের ন্যায় ছিল। বাবাজানের আদেশক্রমে সবসময়ই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন।
শাহানশাহ্ বাবাজান পর্দা করার পর বাবাজান এর অবর্তমানে আম্মাজান হক মন্‌জিলের নেতৃত্বে ছিলেন। বাবাজান এর রওজা শরিফ এর এত সুন্দর নক্‌শা আম্মাজানের নির্দেশ অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়। এছাড়াও ভিতরবাড়ি থেকে শুরু করে, মেহমান খানা, হুজুরা শরীফ, মাজারের কাজ সকল কিছু আম্মাজান এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। হক মন্‌জিলের পূর্ণরূপ এর পেছনে আম্মাজান এর বিশাল অবদান রয়েছে।

সেই সময় মাইজভাণ্ডারে বিদ্যুৎ ছিল না। বিদ্যুৎ আনার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্নের পরও দায়িত্বরত ব্যক্তি কাজ করতে অনীহা জানায়। পাঁচ ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার, এখনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়নাই কেন? আম্মাজানকে বিস্তারিত বিষয়াদি জানানোর পর দেখলাম, পরের দিন সকালে লোকটি জিনিসপত্র নিয়ে দরবারে হাজির এবং সকলের সামনে বলতে লাগলেন, কাল রাতে বাবাজানকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বুকে চাপ দিয়ে ধমক দিলেন। অনেকটা প্রাণভিক্ষা নিয়ে বেঁচে আসার মতই অবস্থা, এই বলে বাবাজান এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করে বাড়ি চলে গেলেন। আম্মাজান জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়

ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। শাহানশাহ্ বাবাজান এর অভাব আমাদের কখনও বুঝতে দিতেন না।

বাবাজানের ওফাতের পর আম্মাজান এর কাছে গেলে তিনি বলেন, "তুমি থাক। কোথাও যেওনা। মুনিবের খেদমত কর। খেদমতকারীদের আম্মাজান অনেক গুরুত্ব দিতেন। তিনি নিজ দায়িত্বে অনেক মহিলা খেদমতকারীদের বিবাহ দেন। পুরো হক মন্‌জিল সাজিয়ে বিবাহের আয়োজন করতেন। সবার মনের ইচ্ছা পূরণের যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। বাবাজানের ওফাতের পর চাহ্‌রাম শরিফের একশজনের তাবার্‌রুক নিয়ে আমাকে শাহ্‌জাদা সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারীর কাছে পাঠিয়েছেন। দেখামাত্রই বাবাজান বললেন, "শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী আমার ভাগিনা ছিল না। তিনি ছিলেন আমার আব্বাজান শাহ্ সুফি গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী" – আল্লাহু আকবর।
উর্ধ্বস্তরের ক্ষমতাসীন আল্লাহ্‌র অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) এর সম্মানিতা সহধর্মিনী আমাদের প্রাণপ্রিয় আম্মাজান যার জীবনাদর্শ ছিল খুব সহজ সরল, মানবিক গুণসম্পন্ন, কর্মঠ, দক্ষ ও প্রেমাগ্নি। আল্লাহ্‌র অলিগণ মানবতার লক্ষ্যে কতটা কষ্টধারণ ও ধৈর্য্য ক্ষমতার অধিকারী হয়, আম্মাজানের জীবনপ্রণালীই আমার দেখা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

রুহুল আমিন
প্রাক্তন খাদেম
রওজা-ই-শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী

জ্যোতির্ময় কিংবদন্তী নারী সূফি 'আম্মাজান মাইজভাণ্ডারী (রহ.)'

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর বংশীয় ও আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী ইমামুল আওলিয়া খাতেমুল আওলিয়া হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) প্রবর্তিত এবং তাঁরই হাতে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার আদর্শের কিংবদন্তী পরিচর্যা কেন্দ্র 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল'। এই মন্‌জিল গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পারিবারিক বাসস্থানের বর্ধিতাংশ হিসেবে সুপরিচিত। এই মন্‌জিলের কর্ণধার কিংবদন্তী সুফি ব্যক্তিত্ব আওলাদে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক অফিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই মন্‌জিল পরিচালনায় পর্দার অন্তরাল হতে যিনি আজীবন নিরলসভাবে কাজ করেছেন তিনি একজন কিংবদন্তী নারী সুফি। আমাদের সমাজে সুফি বলতে অধিকাংশই পুরুষ অলিদের বুঝে থাকেন। অর্থাৎ নারীদের মাঝেও অনেক সুফি রয়েছেন। তাপসী রাবিয়া বসরী (রহ.) তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আমরা আজ সুফি হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি নারী সুফির অবস্থান, মর্যাদা ও শান সম্পর্কে জানব। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিনী আশেকানদের আম্মাজান মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর শান-মান এবং জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব।

আশেকানদের আম্মাজান হযরত মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর মধ্যস্থতায় এই ত্বরিকার নিসবত গ্রহনের মাধ্যমে কঠোর ও নিরলস সাধনা এবং সামাজিক-পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অনুসরণীয়-অনুকরণীয় এক উজ্জ্বল আদর্শ সকলের জন্য। বংশীয় পুরো নাম মুনাওয়ারা বেগম। মুনাওয়ারা শব্দের একটি অর্থ হল জ্যোতির্ময়। তিনি নারী জাতির গৌরবময় আলো হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর এই গৌরবমণ্ডিত জীবন সাধনা আরও মূল্যবান হয়েছে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার উজ্জ্বল নক্ষত্রের সহধর্মিনী হিসেবে। এ যেন আলোর সাথে আলোর ঝলকানি! আম্মাজান তাঁর

সাধনা ও কর্ম দিয়ে পৃথিবীর নারী সুফিদের জীবন কথায় অন্যতম এক উদাহরণ হয়ে থাকবেন।

তিনি 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' যুগের একজন নারী সুফি। তিনি উন্মুক্তভাবে সকল ধর্মের মানুষকে ভালবাসা বিলিয়েছেন, আদব শিখিয়েছেন, সাধনার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর পরম আদর স্নেহ ভালাবাসায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল আশ্রিতজন 'আম্মাজান' নামে তাঁকে স্মরণ করেন সুখে-দুঃখে-আরাধনায়। আম্মাজানের নামের স্মরণ যেন এক দুঃখহারিনী নাম, সাধনার বিষয়, আরাধনার বাক্য।

আম্মাজান অবস্থান করেছেন সকলের অন্তরের মণিকোঠায়, শ্রদ্ধার সর্বোচ্চ অবস্থানে। দিশেহারাদের আশ্রয়কেন্দ্র হক মন্‌জিলে আশ্রিত নারীদের পাশপাশি পুরুষদেরও পর্দার অন্তরাল হতে খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সংসারে জ্যেষ্ঠ সন্তানের পুত্রবধূ হিসেবে আগমনের পর হতে নিজেকে ত্বরিকতের ও দরবারের খাদেমা হিসেবে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আম্মাজানের কালাম, "দরবারের হুকুম মানতে হয়"। আম্মাজানের দয়ায় আমি দরবারে পাকের খেদমতের সুযোগ পেয়েছি। আমার দরবারে আসা ২০০৪ সালে। তখন আমার বয়স ৭ বছর। এই বছর হঠাৎ আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। নাজিরহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমাকে ভর্তি করা হয়। ঐ সময় আমার বাবা পরপর ৩ দিন দরবারে পাকে জিয়ারতে আসেন আমার সুস্থতার জন্যে ফরিয়াদ পেশ করতে। নাজিরহাট হতে ৮ দিন পর ডাক্তারের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৭ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার কোন রোগ না পেয়ে ছাড়পত্র দিয়ে দেন। তখন শারীরিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, ঠিকমত দাঁড়াতে পারছিলাম না, কথা বলতে পারছিলাম না।

আমার বাবার বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় নানা কবিরাজের কাছে। এমন সময় আমার বাবা একদিন কাঞ্চনপুর দায়রা শরিফে সামা মাহ্‌ফিলে গিয়ে আহমদ ছফা ফকিরকে আমার অসুস্থতার কথা জানান। ঐদিন রাতেই আমার বাবা স্বপ্নে দেখেন, শাহানশাহ্ বাবাজান আমাদের বাসায় তশরিফ এনেছেন এবং আমার কপালে চুমু দিচ্ছেন।

পরের দিন ২৬ আশ্বিন উরস শরিফ পরবর্তী চাহ্‌রাম শরিফের দিন সকাল ১০টায় ১টি ছাগল হাদিয়া নিয়ে আমার মা, বাবা ও আহমদ ছফা ফকির দরবার পাকে হাজির হন। ছাগলটি প্রাণপ্রতিম মুর্শিদ মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর কাছে পেশ করি, তিনি দয়াবশত হাদিয়াটি কবুল করে নেন এবং আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

বাবাজানকে আমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে সুস্থতার জন্য দোয়ার আরজি পেশ করলে আমাকে কিছুদিন দরবারে খেদমতের জন্য আদেশ দেন। এরপর শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফ জিয়ারত শেষে আম্মাজানের সাথে সাক্ষাতে গেলে আম্মাজানও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন এবং আমাকে দরবারে কিছুদিন খেদমতের জন্য আদেশ দেন।

খেদমতে থাকার ১৫ দিন পর আমার মা কাউকে না জানিয়ে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। ঐ রাতেই আমার মা স্বপ্নে দেখেন, আমার মাকে জ্যোতির্ময় এক ব্যক্তি চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। সকালে আমার মায়ের মাথায় খুব বেশি ব্যথা অনুভব হয় এবং প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকেন। উল্লেখ্য, আমাকে দরবার থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর হতে আমি আবার অসুস্থতা অনুভব করি, ভাল করে কথাও বলতে পারছিলাম না।
আমার মা-বাবা আহমদ ছফা ফকিরকে এই ঘটনা বলার পর কাঞ্চনপুর দায়রা শরিফে রক্ষিত শাহানশাহ্ বাবাজানের ছবি মোবারক আমার মাকে দেখান। আমার মা বলেন, হ্যাঁ ইনিই তো, যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। তখনই আহমদ ছফা ফকিরের পরামর্শক্রমে আমাকে আবার দরবারে খেদমতের জন্য নিয়ে আসা হয়। দরবারের গেইটে আসার সাথে সাথে আমি স্পষ্ট করে কথা বলতে থাকি, সুস্থতা অনুভব করতে থাকি। আমার মা আমাকে নিয়ে আম্মাজানের কাছে গেলেন, আম্মাজানের কদম মোবারক ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আম্মাজান কালাম করলেন, “দরবারের হুকুম মানতে হয়। না মানলে এমন হবেই”।

দীর্ঘ আড়াই মাস পর আমার মা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসলে আম্মাজান কালাম করলেন, “আপনার তো আরও তিনজন সন্তান রয়েছে। এই সন্তানকে দরবারের গোলামীতে দিয়ে দেন। দরবারে থেকে গোলামী করবে”। আলহামদুলিল্লাহ্, আম্মাজানের দয়ায় অদ্যাবধি দরবারে পাকের খেদমতে নিয়োজিত আছি।

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের খাদেমগণের প্রতি আম্মাজানের দয়া, মমতা, ভালবাসা বর্ণনাতীত। তিনি খাদেমদের মমতার ছায়ায় আগলে রেখেছিলেন, যেন কেউ বুঝতে না পারে যে সে নিজ পরিবার হতে দূরে আছে। হক মন্‌জিলের খাদেমগণ কোন সমস্যায় পড়লে নিঃসঙ্কোচে ভরসার জায়গা হতে বলতেন, আম্মাজান আছেন তো।

আমরা খাদেমরা আম্মাজানের কাছে গর্ভধারিনী মায়ের ন্যায় আদর ভালবাসা পেয়েছি। আম্মাজান খাদেমদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন। খাদেমেরা মন্‌জিলে নিয়মিত খেদমতে থাকতেন বিধায় পরিবারের ভালবাসার অভাব আম্মাজান খাদেমদের বুঝতে দিতেন না। এমনি একটি ঘটনা:

২০১৭ সাল। একদিন শাহানশাহ্ বাবাজানের বড় জামাতা জনাব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী দরবারে আসলেন। সকালে তাঁর জন্য নাস্তা আনতে মহিলা মহলের রান্না ঘরে গিয়ে দেখি আম্মাজান খাদেমাদের সাথে শীত পিঠা বানানোর ব্যাপারে কথা বলছিলেন। (উল্লেখ্য আম্মাজান আদর করে আমাকে তুই করে বলতেন)। আমাকে দেখে বললেন, এখানে চাল আছে, চাল গুড়া করে দিতে পারবি? বললাম, ইনশাআল্লাহ্ আপনি দয়া করলে পারব। আম্মাজান জানতে চাইলেন, অফিসে ছেলে কে কে আছে? বললাম, আসিফ, আমি, আরো দুইজন। আম্মাজান আদেশ করলেন, এদেরকে নিয়ে চালগুলো গুড়ো করে দিও। আম্মাজানের আদেশ মত আমরা দুপুর ১২টার দিকে চালগুলো গুড়ো করে দেই। দুপুর আড়াইটা হতে পিঠা বানানোর কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা। বিকাল ৩টায় রান্না ঘরে গিয়ে দেখি আম্মাজান সেখানে উপস্থিত। তিনি খাদেমাদের উদ্দেশ্যে বলছেন, "দরবার পাকে যারা খেদমত করছে তাদেরও তো পরিবার পরিজন আছে। যদি তারা আজ পরিবারের সাথে থাকত তবে তাদের প্রাপ্য পেত। যদি তারা তোমার ভাই হয় তবে কি তোমরা তাদের জন্য কাজ করতে না? তারা নিজেদের পরিবার, পরিজন, ঘরবাড়ি ছেড়ে দরবারে খেদমত গোলামী করছে। তাদের খাওয়া দাওয়া আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করি তাহলে শাহানশাহ্ বাবাজান আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করবেন"। এরপর আমি সেখান থেকে চলে আসি। খাদেমারা বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা পিঠা বানিয়েছেন সকলের জন্য। অন্যান্য সময় যেভাবে নতুন কিছু রান্না হলে হযরত কেবলা, বাবাজান কেবলা ও অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফে পাঠাতেন অনুরূপভাবে পাঠালেন।

পরের দিন সকালে মন্‌জিলের সকল খাদেমদের জন্য পিঠা পাঠালেন, এমন কি কৃষি কাজে যারা জমিতে কাজ করছেন তাদের জন্যও পাঠালেন। আম্মাজান বিকালে এসে খবর নিচ্ছিলেন সকলে পিঠা পেয়েছেন কিনা। নিজ সন্তানের ন্যায় দায়িত্বের জায়গা হতে আম্মাজান খাদেমদের মমতার চাদরে আগলে রেখেছিলেন।

আম্মাজানের আচার আচরণে বড়দের প্রতি সম্মান, ছোটদের জন্য স্নেহ প্রদর্শনের পাশাপাশি দরবারের আদব রক্ষায় সজাগ থাকা আমাদের জন্য একটি শিক্ষাগ্রহণের বিষয় ছিল। দরবারে অবস্থানকালীন আমাদের আচরণ কেমন হওয়া প্রয়োজন আম্মাজান আমাদের সেটি নিজে পালন করে শিখিয়েছেন। তিনি শাহানশাহ্ বাবাজানের সহধর্মিনী হিসেবে শাহানশাহ্ বাবাজানের পরবর্তীতে মন্‌জিলে সর্বেসর্বা হয়েও সকলের সম্মুখে আদব রক্ষার ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। এমনকি শারীরিক অসুস্থতার মাঝেও তিনি আদবের বরখেলাপ হয় এমন কাজ হতে বিরত ছিলেন।

আম্মাজান পর্দা করার ৪ মাস পূর্বে একদিন শহরের বাসা থেকে দরবারে আসেন। আম্মাজান তখন শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ ছিলেন। আম্মাজানের খাদেমা ঝিলু আকতার মাজারে এসে জানালেন আম্মা এখন মাজার শরিফে আসবেন। এ কথা শুনে তাড়াতাড়ি আম্মাজান বসে জিয়ারত করার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে আসলাম। আম্মাজান খাদেমা স্বপ্না ও ঝিলুকে ধরে মাজার শরিফে আসলেন। চেয়ার দেখে আমাকে বলেন, "অবুক আঁই চেয়ারত কেনে বইস্‌সুম, আঁর যদি ভুল অয়, বা'জান যদি ভুল ধরে" (আমি চেয়ারে কেমনে বসব, আমার যদি কোন ভুল হয়ে যায়, বাবাজান যদি ভুল ধরেন)। তখন আমি আরজ করলাম, আম্মাজান আপনি তো অসুস্থ তাই চেয়ার দিয়েছি। এরপর আম্মাজান চেয়ারটা মাজার শরিফের বাইরে (পশ্চিম দিকে আম্মাজান যেই দরজা দিয়ে আসতেন সেই দরজার বাইরে) নিয়ে যেতে বললেন। আমি চেয়ারটি সেখানে রেখে আসি। আম্মাজান রওজা শরিফের বাইরে চেয়ারে বসে জিয়ারত করলেন। এরপর শাহানশাহ্ বাবাজানের মাজার শরিফের দিকে দীর্ঘক্ষণ থাকিয়ে থাকেন।

আম্মাজান ছিলেন এক উদার মনের মানুষ। অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে পিছ পা হতেন না। তিনি দরবারে আশ্রিতদের সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যদি কোনো দরিদ্র-অসহায় স্বামীহারা, সহায় স্বম্বলহীন

মহিলা এসে আম্মাজানের নিকট ফরিয়াদ করতেন, আম্মাজান তখন খোঁজ খবর নিয়ে তাকে থাকার অনুমতি দিতেন এবং তাদের কোন সন্তান থাকলে তাকে দরবারের মাদ্‌রাসায় (মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী) ভর্তি করিয়ে দিতেন।

দরবারে আগত অসহায়, সহায় সম্বলহীন বিবাহযোগ্য মেয়েদের নিজ দায়িত্বে দরবার পাকের পক্ষ হতে বিয়ে দিতেন। অনেককে বিয়ের খরচের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। যেমন, দাঁতমারা নিবাসী মুজিবা, নুরুনি, পরানি, শ্যামলা, কমলা, শরিফা, নানুপুর সৈয়দপাড়া নিবাসী সাহেদা, সামিম আফাজ উল্লার বোন, খিরাম নিবাসী রুবি, রুজি, ভূজপুর নিবাসী সুনিক্যা, কিপাইত নগর নিবাসী জানু, ঝর্ণা, পশ্চিম পাড়া নিবাসী মিন্নাত, কাঞ্চনপুর নিবাসী আনু, কাঞ্চনা, শেলী, নিলু, তানজু, তাহমিনা, রেশমী, রোসাংগিরি নিবাসী নারু, নাঈমা, ধর্মপুর নিবাসী কাজল, মন্দাকিনী নিবাসী রোকসানা, নাজিরহাট নিবাসী ফেরদৌস, কাজিরহাট নিবাসী মনি, রাঙামাটিয়া নিবাসী খালেদা, রোকসানা সহ নীলু (শ্বশুর বাড়ি নানুপুর), চম্পা, শিরু, শামিম, মনির মা'র মেয়ে রুজিকে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম ছাড়া বি. বাড়িয়া জেলার সরাইল নিবাসী সাজু, কুমিল্লা জেলার লাকসাম নিবাসী কোহিনুর, স্বপ্না, শিল্পী, মর্জিনা, শানুকেও বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া আরও অসংখ্যজনকে উম্মুল আশেকীন আম্মাজান মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) বিবাহ সহায়তা প্রদান করেছেন।

আম্মাজানের কারামত

অলিআল্লাহ্‌গণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁদের কারামত শক্তি দান করেন। আমাদের আম্মাজান উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) ছিলেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন অলিআল্লাহ্। তিনি দরবারে আগত আশেক-ভক্তদের মনের কথা জানতেন, বুঝতে পারতেন। নিম্নে আম্মাজান মাইজভাণ্ডারীর কিছু কারামতের কথা বর্ণনাকারীরা যে ভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে তুলে ধরা হল:

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আম্মাজান

ফটিকছড়ি কাঞ্চনপুরের বড় দিঘির পাড়া নিবাসী নবীদ ফকির ১৯৮৯ সালে একদিন কাঞ্চনপুর হতে মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলে হাদিয়া স্বরূপ একটি দই নিয়ে পায়ে হেঁটে আসছিলেন। পথিমধ্যে শাহ্‌নগর গ্রামের এক

ভদ্রলোক বললেন, দইটি আমার কাছে বিক্রি করো। দাম কত টাকা দিব? সেসময়ে দইয়ের মূল্য আনুমানিক ৫/৬ টাকা হবে। তখন নবীদ ফকির দই বিক্রি না করার উদ্দেশ্যে এটির দাম বললো ৫০ টাকা। কিন্তু ক্রেতা দর কষাকষি করে বললেন ৩৫ টাকাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য। তবুও নবীদ ফকির দইটি বিক্রি না করে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে নিয়ে আসেন। শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফের উত্তর-পূর্ব দিকে মহিলাদের ভিতর বাড়ি হতে আম্মাজান বললেন, "দরবারে পাকের মানতি দইটি পথের মধ্যে বেচাকেনা চলতেছে নাকি?" তখন নবীদ ফকির অবাক হয়ে বললেন, আম্মাজান আমি দইটি বিক্রি না করার জন্য এটির মূল্য ৫০ টাকা বলেছি। অতঃপর নবিদ ফকির ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আম্মাজানের দোয়ার বরকতে সন্তান লাভ

আম্মাজানের দোয়ার বরকতে সন্তান লাভ করেছেন এমন পরিবারের সংখ্যা অগণিত। মাইজভাণ্ডার শরিফে আগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মহিলা মেহমানগণ আম্মাজানের কাছে দোয়া প্রার্থনা করতেন সন্তান লাভের আশায়। তারা আর্জি পেশ করে বলতেন, আমার অনেক বছর হয়েছে বিয়ের কিন্তু আমি এখনো নিঃসন্তান। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক চিকিৎসা করিয়েছি; কোনো ফল পাচ্ছি না। আম্মাজান, আপনি দোয়া করেন। আপনি তাবার্‌রুক দেন, যে তাবার্‌রুকের উসিলায় আগামীবার যেন আমি সন্তানসহ মাইজভাণ্ডার শরিফে আসতে পারি। আম্মাজান দয়াবশতঃ তাদের তাবার্‌রুক দিতেন, দোয়া করতেন।

(ক) বর্ণনাকারীঃ স্বপ্না, পিতা– আবদুল মতিন, গ্রাম– লাকসাম, দোখাইয়া

তিনি বলেন, আমি যখন ৫ মাসের গর্ভবতী, তখন এক সপ্তাহ ধরে আমার পেটে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করি। তখন আমি আম্মাজানকে আমার ব্যাথার কথা জানালে, আম্মাজান ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেন। অতঃপর আমি ডাক্তারের কাছে গেলে, ডাক্তার আমাকে আলট্রাসনোগ্রাফি করাতে বলে। আলট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্ট দেখে ডাক্তার আমাকে জানায়, সন্তানের অবস্থা ভালো না, যে কোনো সময় সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন আমি মেডিকেলে ভর্তি না হয়ে আম্মাজানের কাছে চলে আসি এবং সবকিছু খুলে বলি। আমি যখন আম্মাজানের পবিত্র চরণে কান্না করছিলাম, তখন তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, "আল্লাহ্ রহমত করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তারপর তিনি আমাকে

ডাক্তার দেখানোর জন্য ৭ হাজার টাকা দেন। টাকা নিয়ে আম্মাজান থেকে অনুমতি নিয়ে অন্য একজন ডাক্তারের কাছে যাই। তখন ডাক্তার আমাকে আবার আলট্রাসনোগ্রাফি করান। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার জানান, বাচ্চা ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই।

(খ) বর্ণনাকারী: ইয়াসমিন, পিতা– জানে আলম, ফটিকছড়ি

তিনি বলেন, আমার বিয়ে হয়েছিল ২০১৬ সালে। বিয়ের ৫ বছর পর্যন্ত আমি নিঃসন্তান ছিলাম। সন্তানের আশায় আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, অনেক হুজুরের কাছে দোয়া চেয়েছি। কিন্তু ফলাফল শূন্য। একদিন আমি আমার মায়ের সাথে মাইজভাণ্ডার আসি এবং আম্মাজানের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমার মা তখন ৬ মাসের গর্ভবতী। আমি আম্মাজানের নিকট আর্জি জানালে, আম্মাজান আমাকে বলেন, "তোমার মা তো গর্ভবতী। এতে তুমি কি নারাজ হয়েছ? তোমাকেও সন্তান দিবে আল্লাহ্।" আম্মাজান আমাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন ২০১৯ সালে। আম্মাজানের দোয়ার উসিলায় ২০২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর আমার একটি ছেলে সন্তান হয়। এর পূর্বে আমার মায়ের একটি ছেলে সন্তান হয় ২০১৯ সালে। আমরা তিন বোন, এক ভাই। আমি বড়। আমার মেজ বোনের বয়স ১৬ বছর, ছোট বোনের বয়স ১২ বছর। ছোট বোনের ১২ বছর পর আমার ভাইয়ের জন্ম হয়। আমার মা আমাকে ছোট বেলা থেকেই দরবারে নিয়ে আসতেন। আজ যা কিছু সব আম্মাজানের দোয়ার বরকতে, আল্লাহ্র রহমতে হয়েছে।

(গ) বর্ণনাকারী: ইয়াসমিন আকতার, পিতা– মরহুম মৌলানা শফিউল বশর, গ্রাম– দক্ষিণ সর্ত্তা, রাউজান

তিনি বলেন, রাউজানের বাসিন্দা সাদিয়া আক্তারের বিয়ের তিন বছর যাবত বারবার সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় আমি তার জন্য আম্মাজানের কদমে আর্জি পেশ করি। আম্মাজানের দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তাকে সন্তান দান করেন।

(ঘ) বর্ণনাকারী: মোহসেনা, পিতা– মরহুম মৌলানা দিল মোহাম্মদ, জয়নাল সিকদার বাড়ি, গ্রাম– রায়পুর, ফটিকছড়ি

তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ ৭ বছর যাবত সন্তান না হওয়ায় আম্মাজানের নিকট আর্জি নিয়ে আসি। আম্মাজান সন্তানের জন্য দোয়া করেন এবং আমাকে

দরবারের খেদমতে নিযুক্ত করেন। অতঃপর আম্মাজানের দোয়ার বরকতে আমার সন্তান হয়।

(ঙ) বর্ণনাকারী: মরিয়ম বেগম, চন্দনাইশ

তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ ১৭ বছর নিঃসন্তান ছিলাম। এরপর আমি আম্মাজানের নিকট আর্জি পেশ করলে তাঁর দোয়ার বরকতে আমি সন্তানের মা হই।

আম্মাজানের দোয়ায় সংসারে শান্তি

বর্ণনাকারী: ফরিদা বেগম, ওবায়দুর রহমান মুন্সির বাড়ি, গ্রাম– উত্তর ধুরুং, ফটিকছড়ি। তিনি বলেন, আমার বিবাহের কিছু মাস পরে আমাদের বৈবাহিক জীবনে অনেক ঝামেলা হয়। সংসার প্রায় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। তখন আমি উপায়হীন হয়ে দরবার শরিফে আম্মাজানের নিকট এসে সকল সমস্যার কথা বলি। আম্মাজান আমাকে সান্তনা ও সাহস দেন। আম্মাজান দোয়া করেন সমস্যা সমাধানের জন্য, পরিবারের শান্তির জন্য। ধীরে ধীরে আমার পরিবারের সমস্যার সমাধান হয় এবং সংসারে শান্তি ফিরে আসে।

আম্মাজানের দোয়ার উসিলায় অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ

বর্ণনাকারী: মনি আকতার, মিস্ত্রি বাড়ি, পাইন্দং, ফটিকছড়ি। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। দরবার শরিফ এসে আম্মাজানকে অসুস্থতার কথা খুলে বলি ও দোয়া প্রার্থনা করি। আম্মাজান আমার সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। তখন আমি আম্মাজানের নিকট কিছুদিন দরবারে থাকার জন্য আর্জি পেশ করি। আম্মাজান আমাকে দরবারের খেদমতে থাকার অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহ্‌র রহমতে ধীরে ধীরে আমি সুস্থ হয়ে উঠি।

আম্মাজানের দোয়ায় বিয়ে সম্পন্ন

ক) বর্ণনাকারী: নাজমা আক্তার, মিরসরাই

তিনি বলেন, আমার বিয়ের বয়স অতিক্রম হয়ে গেলেও বিয়ে হচ্ছিল না। একদিন আমি দরবারে আম্মাজানের নিকট আর্জি জানালে আম্মাজান আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "দরবারে কিছুদিন খেদমত কর।" অতঃপর আমি দরবারে খেদমতে নিযুক্ত হই এবং দরবারে থাকাকালীন সময়েই আমার বিয়ে সম্পন্ন হয়।

খ) বর্ণনাকারীঃ ইয়াসমিন আকতার, ধর্মপুর, ফটিকছড়ি

তিনি বলেন, পুতুল ফটিকছড়ি ধর্মপুরের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন যাবত তার বিয়ে না হওয়ায় আম্মাজানের নিকট এসে তিনি ফরিয়াদ করেন। আম্মাজান তাকে একটি শাড়ি দান করেন এবং পরের সপ্তাহে তার বিয়ে হয়।

আম্মাজানের দোয়ায় সরকারি চাকরি লাভ

বর্ণনাকারীঃ ইয়াসমিন আকতার, দক্ষিণ সর্ত্তা, রাউজান

তিনি বলেন, রাউজানের দক্ষিণ সর্ত্তা নিবাসী কাজী শাহেদ উদ্দীন। দীর্ঘ ৭ বছর সরকারি চাকরির জন্য অপেক্ষা করেন। বিফল মনোরথ নিয়ে আম্মাজানের নিকট আর্জি পেশ করেন সরকারি চাকরি প্রাপ্তির জন্য। আম্মাজান দোয়া করেন। অতঃপর আম্মাজানের দোয়ার উসিলায় চাকরি পেয়ে সফল হন।

আম্মাজানের দোয়ায় পরীক্ষায় ভাল ফলাফল

বর্ণনাকারীঃ জেসমিন আকতার, গ্রাম– ডিঙ্গল লোঙ্গা, বেতাগী, রাঙ্গুনিয়া

আমি ২০১৪ সালের এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলাম। পরীক্ষার আগে আমার মায়ের সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জিয়ারতে আসি। জিয়ারতের শেষ পর্যায়ে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসলে আম্মাজান উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম (রহ.)'র সাথে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয় আমার। আমার মা আরজি পেশ করে বলেন, আম্মাজান, মেয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী আপনার কাছে এসেছি দোয়ার জন্য। সে যাতে পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পায়। আম্মাজান বলেন, "সুযোগ যখন আছে চেষ্টা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ্ আমি দোয়া করছি"। আম্মাজানের এই দোয়ার বরকতে আমি এসএসসি পরিক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছি। আম্মাজানের দোয়ার বরকতে বর্তমানে আমি রাঙামাটি সরকারি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়ছি। আম্মজানের দোয়ার পরশ আমার সাথে আছে, আম্মজানের সুন্দর ব্যবহার, আতিথেয়তা ও পবিত্র বাণীগুলো জীবন যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তে পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁর পবিত্র চরণে আমার অগণিত সালাম।

পরিশেষে, আশেকানদের আশ্রয়স্থলে আম্মাজানের আরামগাহ্

এশিয়া মহাদেশের অতুলনীয় স্থাপনা শাপলা ফুলের নক্শায় নির্মিত শাহানশাহ্ বাবাজানের আরামগাহে আম্মাজান আরাম করছেন। নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় সকলের মান্যবর দুইজন (একজন পুরুষ ও একজন নারী) সুফির পাশাপাশি মাযার শরিফে অবস্থান যেন ফয়ুজাতের দুই রেখার এক মিলিত কেন্দ্র। এ যেন শাহানশাহ্ বাবাজানকে স্মরণের মাঝে আম্মাজানকে স্মরণের এক মহাকৌশল। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের উপর শাহানশাহ্ বাবাজান ও আম্মাজান মাইজভাণ্ডারীর ফয়ুজাত বর্ষণ করুন। আমিন।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্
খাদেম
রওজা-ই-শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী

সকাল-সন্ধ্যা সব কিছুর খবরা খবর রাখতেন

আমি ১৯৮৯ সালে দরবার শরিফ এসেছিলাম। সে সময় হতে খেদমত আনজাম দিতাম। তখন দৌলা দাদা, আবু মামা, ওবাইদুল আকবর এ তিনজনও কর্মরত ছিলেন।

১৯৮৯ সাল মা'জানের (উম্মুল আশেকীন) সাথে পরিচয় হয় ছৈয়দুর রহমানের ছেলে হিসেবে। সেই থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘসময়ে মা'জানের সমীপে বিভিন্ন পরামর্শ-উপদেশ, আদেশ-নির্দেশ, পরিচালনা কার্য সকলের সন্তুষ্টি মোতাবেক করার জন্য তিনি তাগিদ দিতেন।

তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীর কোন ভেদাভেদ দেখতেন না। ভেদাভেদহীন নিজ সন্তানের মতো সর্বক্ষেত্রে তদারকি করতেন। কীভাবে মন্‌জিল কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করা যাবে তা জনাব জামাল আহমদ শিকদার সাহেবের সমন্বয়ে পরিচালনা করতেন। তাঁর কার্যক্রমের সচেতনতা ও যত্নশীলতা আমি পূর্বে কখনো দেখিনি এবং আমার নিজের 'মা'-এর মতো করে আমাদের যত্ন নিয়েছেন এবং স্নেহ করেছেন। আমাদের যত্নের পরও আশেক-ভক্ত, পুরুষ-মহিলাদের যত্ন নিতেন এবং স্নেহ করতেন। যদিওবা পুরুষ ভিতরে যেতে পারতেন না।

আম্মাজানের মতো অতিথিপরায়ন মাইজভাণ্ডার শরিফে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। কর্মচারীদের প্রত্যেক বিষয়ে নিয়মিত খবরাখবর নিতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিসপত্র যা যা দরকার তার যোগান দিতেন। বৈষম্যতা নয়, সাম্যতার চোখে সকলকে দেখতেন। তৎসময়ে দৌলা দাদা, আবু নানা, রুহুল আমিন ও সিকদার সাহেব ছিলেন। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাক্ষাতে মা'জানের সাথে তাঁরা কথা বলতেন।

আম্মাজান মন্‌জিল পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে সমন্বয়ের পরামর্শ-নির্দেশনা দিতেন। জায়গাজমিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা, সমন্বয়ের মাধ্যমে এককভাবে গড়ে তুলেছেন এই মন্‌জিল। তাঁর প্রতিটি কাজ অতুলনীয় ও প্রশংসনীয়। আমার জানা ও দেখামতে মা'জান মন্‌জিলের কার্যক্রমে মেধা-পরিশ্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন। আম্মাজানের মতো অদ্বিতীয় মহিয়সীর দেখা আমরা আর পাবোনা।

তিনি মন্‌জিলে কর্মরত কর্মচারীরা খাবার গ্রহণ করেছেন কিনা তা তদারকি করতেন এবং প্রয়োজনে যার যার খাবার তার তার জন্য আলাদা করে রাখতেন। সকাল হতে সন্ধ্যা সবকিছুর খবরাখবর রাখতেন।

আমি ১৯৮৯/৯০ সালে কৃষি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৮৯ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত আমি কর্মরত ছিলাম। আম্মাজান পরামর্শ দিতেন, সুন্দর ব্যবহারের সাথে কথা বলার জন্য, ঝগড়া-বিবাদে না জড়ানোর জন্য, সুশৃংখল কাজের তাগিদ দিতেন। দৌলা দাদা, আবু মামা ছিলেন– তাদের সাথে আম্মাজানের নিকট গিয়ে আমরা সাক্ষাতে সকল বিষয়ে সমন্বয় করতাম। তিনি সবক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা ও পরিচালনা করতেন। মা'জান সিকদার সাহেব ও বখতেয়ার দাদার সঙ্গে সমন্বয় করে শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফের কাজের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আমার জানামতে।

আম্মাজানের সাহসিকতা ও ধৈর্য্য অতুলনীয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার পরেও আম্মাজান নিজ দায়িত্বে বহু মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। যার সব আনজাম মন্‌জিল থেকে বহন করেছেন, খাবার-দাবার, উপহার সামগ্রী, শ্বশুর বাড়িতে আসা যাওয়া সবই বহন করা হতো।

একদিন আম্মাজান মওলা হুজুরকে (তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান) পূর্ববাড়িতে খাবার পরিবেশন ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য বা তদারকির জন্য পাঠিয়েছেন। সেদিন মওলা হুজুর কর্মরতদের সাথে বসে খাবার গ্রহণ করেন। ভিতরবাড়ির খাবারের বিষয়ে আম্মাজান তদারকি করতেন।

আম্মাজান হচ্ছেন আম্মাজান!! এতবড় মন্‌জিল সবকিছু তদারকি ও পরিচালনা করতেন। জায়গা-জমি কেনার ক্ষেত্রে আম্মাজান সিকদার সাহেবের সাথে পরামর্শ করতেন। সিকদার সাহেব আমাকে নির্দেশনা দিতেন, মাঠপর্যায়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্য। আবু মামা, সিকদার সাহেব মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দরদাম করতেন এবং রেজিস্ট্রি কাজ সম্পন্ন করতেন। আম্মাজানের প্রতিটি কাজের ধারা অতুলনীয়, ভোলার মতো নয়, আসলে যা ভাষায় বলে শেষ করা যাবে না ... এটিই আমার অনুভূতি।

আম্মাজান সর্বস্তরের মানুষকে সাম্যতার চোখে দেখেছেন। সে সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল, এখন তো মওলার মন্‌জিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তখন মানুষ খুব কম ছিল, প্রচার-প্রসারে ভক্তবৃন্দ বাড়তে থাকে। সে সময় উরস শরিফসমূহ আম্মাজানের নির্দেশনাক্রমে সভাপতি-সেক্রেটারি সাহেব সমন্বয়ে পরিচালনা করতেন।

মোহাম্মদ জাফর
খাদেম
গাউসিয়া হক মন্‌জিল (১৯৮৯–২০২১)
মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ

শুধু সেবা নয় : হৃদয় দিয়ে দেখা

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের একদিনের ঘটনা। আমি সেখানে গৃহাভ্যন্তরে কর্মরত ছিলাম। আম্মাজান আমাকে তাঁর মেজ কন্যাকে ডেকে আনতে নির্দেশ দেন। আমি যথারীতি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললাম, "মেজ আপা, মেজ আপা, আপনাকে আপনার আম্মা ডাকছেন"। অত:পর মেজ আপা আম্মার সঙ্গে দেখা করলেন। আম্মা আমাকে আবারো ডাকলেন। বললেন, "নাজিম এদিকে এসো"। আমি গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, "আমি তোমার কি?" আমি বললাম, "আপনি আমারও আম্মা।" তখন তিনি হেসে বললেন, "তাই-তো"। আমি চিন্তা করলাম, আমার আব্বা-আম্মা নেই। আম্মাজান আমাকে হৃদয় দিয়ে দেখেছেন। এতিম ছিলাম। কখনো অমর্যাদাকর শব্দ অথবা বাক্য তাঁর নিকট থেকে শুনিনি। সন্তান হিসেবে আমাকে দেখেছেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একবার শাহানশাহ্ বাবাজান, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস এবং ড্রাইভার হিসেবে আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। চট্টগ্রামে ফিরে আসার পথে কুমিল্লায় বিরতিকালীন সময়ে হঠাৎ মাওলানা আবদুল কুদ্দুস শাহানশাহ্ বাবাজানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বাবাজান আপনি এই ছেলে কার পোলা চিনেন কি? এ ধরণের প্রশ্ন তিনবার করার পর শাহানশাহ্ বাবাজান বলে ওঠেন, 'এতো আমার পোলা'। এ ধরণের অমিয় বাণী আমার মনে বারংবার দোলা দেয়। এ যে বাবাজান এবং আম্মাজানের চিন্তাজগতের অপূর্ব মিল।

মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর মুখে শুনলাম উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা নাম থেকে 'এতিম' শব্দের পরিবর্তে একটি মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তখন আমি ভাবলাম আম্মাজান যেভাবে এতিমদের হৃদয় দিয়ে দেখতেন, ঠিক আম্মার মতোই রাহ্‌বারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ)'র জবান মোবারকে এক হৃদয়ের কথা শুনে কৃতজ্ঞ হলাম।

কাজী নাজিম উদ্দীন

শাহানশাহ্ বাবাজান-এর গাড়িচালক

আম্মাজান : যিনি আমাদেরকে ডাকতেন অ-পুত বলে

মা'জান আমাকে কখনো নাম ধরে ডাকেন নি। সবসময় 'অ' পুত', 'অ' বা' এভাবেই ডাকতেন। ২০০৯ সাল থেকে মা'জানের পরিবারের গাড়ি চালিয়ে আসছি। মা'জানের কাছে যে স্নেহ পেয়েছি, আমার মনে হয় আমার কাছে তা প্রত্যাশার চেয়ে অধিক।

দরবারের আশেক-ভক্তের মধ্যে আমার সাথে পরিচয় আছে এমন দেশ-বিদেশের অনেকেই বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে আমাকে মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর কদমে পেশ করে দোয়ার জন্যে বলতে বলেন। মওলা হুজুর ব্যস্ত থাকার কারণে আমি অনেক সময় দোয়ার জন্যে মা'জানকে বলতাম। পরে দোয়াপ্রার্থীদের কারো সাথে যোগাযোগ হলে তারা বলতেন যে, তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

মা'জান তাঁর আত্মীয়-স্বজন এমনকি অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছেও উরসের তাবার্রুক পাঠাতেন আমাকে দিয়ে। তাবার্রুক পাঠাতে গিয়ে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছেন যারা সম্পর্ক পর্যন্ত ভুলে গেছেন। অথচ আম্মাজানের তাদের কথা ঠিকই স্মরণে আছে।

তিনি কখনো খাদেমাদের ধমক দিয়ে কিছু বলতেন না। খাদেমাদের মধ্যে কেউ বিয়ের উপযুক্ত হলে তাদের সব খরচ বহন করে বিয়ে দিতেন। এমন কি করোনা চলাকালে সাত/আট লক্ষ টাকা খরচ করে এক খাদেমাকে বিয়ে দিয়েছেন।

কোন কোন মহিলার পুত্র সন্তান না হওয়ায় তার সংসার ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হতো। মা'জানের কাছে দোয়ার আর্জি জানাবার পর তারা পুত্র সন্তান লাভ করেন।

বয়স্ক মানুষ রোদের তেজ সইতে পারেন না। মা'জানকে গাড়িতে করে দিন-দুপুরে কখনো বের হলে রোদ থেকে বাঁচার জন্য গাড়ির জানালায় একটা পর্দা লাগাতাম। ২০২০ সালে ডিসেম্বর মাসের কোন এক শনিবার গাড়ি নিয়ে দরবার থেকে মওলা হুজুর সহ মা'জানকে নিয়ে শহরের বাসায় আসছিলাম, মা'জানের পাশে খাদেমা নিলু আক্তারও ছিলেন। তখন দুপুর প্রায় ১২টা। আমি ভুল করে জানালায় দেওয়ার জন্য কাপড় নিতে পারিনি। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর নিজের ভুলের কথা মা'জানকে বললে, মা'জান বলেন সূর্য যদি এভাবে মাথার

উপরে থাকে তাহলে কোন সমস্যা হবে না। সেদিন হাটহাজারীর যানজট পেরিয়ে বাসায় পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট লেগে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার বাসায় পৌঁছেও দেখলাম সূর্য সে অবস্থায় স্থির ছিল। সুবহানাল্লাহ্।

মোহাম্মদ স্বপন
উম্মুল আশেকীন-এর পরিবারের গাড়িচালক

সব দুঃখ-কষ্ট খুলে বলতাম

আমি সুনিক্যা বেগম। আমি ৭ বছর বয়সে প্রথম দরবারে হাজির হই। আমার মায়ের ছেলে সন্তান না থাকার কারণে আমার আব্বা পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় আরেকটি বিবাহ করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় আশেপাশের অনেকে আম্মাকে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দরবারে আসার পরামর্শ দেয়। শাহানশাহ্ বাবাজানের দরবারে আসলে অসাধ্যও সাধ্য হয়ে যায়। সেই বিশ্বাস ভক্তি ও ভালবাসা থেকে দরবারে আসি। শাহানশাহ্ বাবাজান আধ্যাত্মিক জজ্‌বায় উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। এক পর্যায়ে আমার মা বাবাজানকে দুঃখকষ্টের আরজি পেশ করে। বাড়িতে যাওয়ার সময় অগাধ বিশ্বাসের সাথে বাবাজানের দরবার থেকে একটি তেলের বোতল নিয়ে যাই। বাড়িতে গিয়ে মায়ের পুরো শরীরে তেল মালিশ করে দিই। এরপর আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত ও শাহানশাহ্ জিয়া বাবাজানের দয়া মেহেরবানীতে কিছুদিন পর আম্মা গর্ভধারণ করে। তখন থেকে আমরা প্রায় দরবারে ছুটে আসি। পরবর্তীতে আমার মায়ের পুত্র সন্তান হলে সেইদিন আমি আউয়াল আখেরে শাহানশাহ্ বাবাজান-এর খেদমতে হক মন্‌জিলের গোলামিতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করি। বাবাজানও আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যে কবুল করে নিয়েছেন। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খেদমতের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করি।

একদিন বাবাজান আমাকে একটি চেয়ারের দিকে ইশারা করে উঠোনের মাঝে রাখতে বললেন। আমি কিছুতেই টেনে নিতে পারছিলাম না। বাবাজান নিজেই উঠোনে নিয়ে আসলেন। আমি বাবাজানের কদমে বসে পা চেপে দিচ্ছিলাম। অনেক ভয়ও পাচ্ছি। আতঙ্কে হাত কাঁপছিল। বাবাজান বললেন, মা ভয় পাবেন না। আপনার কি লাগবে আমাকে বলেন। টাকা পয়সা বাড়ি ঘর কি লাগবে? আমি মনে মনে ভাবছিলাম বহুবার স্বচক্ষে দেখেছি বাবাজান মানুষের টাকা পয়সায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, পুকুরের পানিতে নামিদামী জিনিসপত্র টাকা পয়সা ভাসিয়ে দিয়েছেন। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিলাম, বাবাজান আমার কিছুই লাগবে না। আপনার দয়া মেহেরবানীতে আমাকে দুনিয়া ও আখিরাত দু'জাহানে ত্বরান্বিত করে নিয়েন। বাবাজান মৃদুহাসি দিয়ে আমাকে দোয়া করে দিলেন।

আল্লাহ্‌র অশেষ কুদরতের খনি বেলায়েতের বাদশাহ্‌ শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সহধর্মিনী উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম ছিলেন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন, দায়িত্ববান, প্রেমমগ্ন, মায়া-মমতাবোধে পরিপূর্ণ মা জননী। কখনও তাঁর মুখে আফসোসের আভাস বিরক্তির ছাপ দেখিনি। সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। খেদমতকারীদের নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন। কখনো পৃথক চোখে দেখতেন না। অনেকবারই আপুদের সাথে একই বিছানার বসে খেয়েছি।

দরবারের আশেকভক্ত ও খেদমতকারীর প্রতি আম্মাজানের অগাধ ভালবাসা ছিল। দরবারের খেদমতে আমার দায়িত্ব ছিল রান্নার কাজ। আম্মাজান আমাকে সবসময় সহযোগিতা করতেন। আমি যেভাবেই রান্না করতাম কবুল করে নিতেন। কোনরূপ আপত্তি করতেন না।

মেহমান আসলে আম্মাজান নিজ দায়িত্বে তদারকি করতেন। সাথে আমাকেও শিখিয়ে দিতেন, মেহমানদের কিভাবে আপ্যায়ন করব। আম্মাজান নিজ হাতে আমাকে অনেক কাজ শিখিয়েছেন। প্রতিটি কাজকর্মে খুবই পারদর্শী ছিলেন। একদিন কাজ করতে গিয়ে আমি হঠাৎ গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আম্মাজান নিজেই আমার সেবাযত্ন করেছেন। অত্যন্ত মহৎ হৃদয়বান কোমল মনের মানুষ ছিলেন। আশেকানদের খুব মায়া করতেন। কিছুক্ষণ পর পর এসে ভাল-মন্দ দেখে যেতেন। খাবার খেয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করার নির্দেশ দিয়ে যেতেন। আমাদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে অনেক চিন্তিত থাকতেন। নিজ পরিবারের ন্যায় আমাদের প্রতিপালন করতেন। আম্মাজানের সাথে আমাকে শহরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। আপুদের বাসায় নিয়ে যেতেন। আম্মাজানের মাতৃছায়াই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল।

আমাকে দরবার থেকে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের যাবতীয় বিষয়াদি ও খরচ দরবার থেকে বহন করা হয়। আমার সন্তান হওয়ার পর আম্মাজান আমার জন্য রান্না করে ভাত তরকারি, দেশি মুরগি আরো অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন। এছাড়াও দরবার থেকে মানুষ পাঠিয়ে আমার ভাল-মন্দ খোঁজখবর নিতেন। এসব ছিল আম্মাজানের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ভালোবাসার স্রোতে আমি আমার পরিবারকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী আমাকে পরিবারের দেখাশোনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে সংসার নিয়ে আছি। শ্বশুর বাড়িতে পারিবারিক

কোনরূপ সমস্যায় জর্জরিত হলে আত্মার টানে আম্মাজানের কাছে দৌঁড়ে আসতাম। আম্মাজানকে মনের সব দুঃখ-কষ্ট খুলে বলতাম। আম্মাজানের মত আপন তাঁর মত কাছের মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে আর কেউ হবে না। আম্মাজান আমাকে সান্তনা দিতেন। পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিতেন। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দিতেন। আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় ভরসা রাখতে মনোবল জাগ্রত করতেন।

আম্মাজানের ছায়ায় আমার সারাটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে আসলে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। আদর-যত্ন করতেন। যাওয়ার সময় বিভিন্ন নাস্তা, পিঠা, অন্যান্য খাবার নিজেই প্রস্তুত করে দিতেন। আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন আর উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম আমার জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন।

আমি আমার সন্তানদেরও শাহানশাহ্ বাবাজানের কদমে সঁপে দিয়েছি। দুই জাহানের ত্বরানেওয়ালা আমার শাহানশাহ্ বাবাজান।

আমার ছেলে দুর্ঘটনাবশত ৭ তলা থেকে নিচে পড়ে যায়। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপা ও শাহানশাহ্ বাবাজানের নজর করমে, বাবাজানের মেহেরবানীতে মৃত্যুর মুখ থেকে নতুন জীবন ফিরে পায়। সেই আনন্দের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে আম্মাজানের কাছে ছুটে আসি। আম্মাজান তখন অসুস্থ ছিলেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হন। আমি আম্মাজানকে ছেলের বিষয়টি জানাই। আম্মাজান সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, বাবাজানের ছেলেকে বাবাজান নতুন জীবন দিয়েছেন।

এভাবেই কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর আলমারি থেকে আম্মাজানের একটি সাদা শাড়ি আমার হাতে তুলে দেন এবং বলেন, আমাকে আর দেখবে না। এই শাড়িটি পরিধান করে নামায পড়ে দোয়া করিও। আমি সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। পুরো পৃথিবী যেন মুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে গেল। সেটি ছিল আম্মাজানের সাথে আমার শেষ দেখা। আম্মাজান পর্দার অন্তরালে চলে গেছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মাঝে এখনো বিরাজ করছেন।

নূর খাতুন (সুনিক্যা)
উম্মুল আশেকীন-এর খাদেমা
নুরুল হক হাজির বাড়ি
কাজিরহাট, আমতলী
ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

তুমি মন ছোট করিও না

আমি ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে প্রথম মাইজভাণ্ডার শরিফ আসি। আমার বাবার বাড়ি উত্তর দক্ষিণ ধুরুং খোরশের বাড়ি বিবিরহাট ফটিকছড়ি এবং আমার শশুর বাড়ি উত্তর ধুরুং ওবাইদুর রহমান বাড়ি বিবিরহাট ফটিকছড়ি। আমার বাবার বাড়ির লোকজন ওহাবী পন্থার অনুসারী। তাই কখনও মাইজভাণ্ডার আসা হয়নি। শশুরবাড়ির সবাই শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর আশেকান ছিলেন। আমার স্বামী ও শাশুড়ি মিলে আমাকে দরবারে নিয়ে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ্ দরবারে এসে অনেক কিছু শিখেছি। আম্মাজানের সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয়েছে। আম্মাজান অনেক উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে যখন যে বিষয়ে আরজি দিতাম তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে যেত।

২০১২ সালে আমি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ি। লিভারের সমস্যা ও ভাইরাস আক্রান্ত ছিলাম। দেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসার পর আমাকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। আম্মাজানের কাছে দোয়া চাইতে এসেছিলাম। আল্লাহ্র অশেষ রহমত শাহানশাহ্ বাবাজান-এর দয়া-মেহেরবানী ও আম্মাজানের দোয়া-বরকতে নতুন জীবন ফিরে পাই।

এরপর ২০১৯ সালে আমি শারীরিক দুর্বলতার জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। চেকআপের পর জানতে পারি আমি কনসিভ করেছি তিনমাস হয়ে গেছে। আমরা সবাই মানসিকভাবে ভেঙে পরি। তিনটা মেয়ে সন্তানের জন্মের সময় সিজার হয়েছে তার মধ্যে একবার লিভার অপারেশন, এতকিছুর পর সন্তান নেওয়া আর সম্ভব না। তবে একটা পুত্র সন্তানের আশা ছিল। আমার মেয়েদের ভাই না থাকায় তারা অনেক আফসোস করত।

ভয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় বড় মেয়েকে নিয়ে আম্মাজানের কাছে চলে আসি। আম্মাজানকে সবকিছু খুলে বললাম। আম্মাজান আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেছেন। আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি মন ছোট করিও না আল্লাহ্ তোমাকেও দেবেন। আম্মাজানের পাক জবানের পবিত্র কালাম আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছে। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে কান্না করছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল এইবার আমার মেয়েও সন্তানের মুখ দেখবে। বিয়ের ৪ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে কোনকিছুই হয়নি। অনেক চিকিৎসা করা হয়েছিল। অনেকে নানা কুসংস্কারমূলক কথা বলত। সবসময়ই মন দূর্বল হয়ে থাকত।

আল্লাহ্‌র রহমতে শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর দয়া-মেহেরবানীতে ও আম্মাজানের পাক কালামের ফযিলতে আমারও পুত্র সন্তান হয়েছে এবং আম্মাজানের দোয়া-বরকতে নাতি পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্‌। এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যখন যা চেয়েছি তাই হয়েছে।

আমার বাপের বাড়ির সবাই দরবারে আসা নিয়ে বিভিন্ন কটুকথা বলত। আমি সবকিছুকে উপেক্ষা করে আম্মাজানের খেদমতে ছুটে আসতাম। সবসময়ই আম্মাজানের খেদমতের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম। যখনই কোন সুযোগ পেতাম নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করতাম। আম্মাজান অনেক দানশীল, উদার, সহনশীল মানবপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে সাক্ষাত করা থেকে বিরত রাখলে তিনি বলতেন, "কে বলেছে আমার খারাপ লাগছে? আমি সুস্থ আছি। সবার সাথে সাক্ষাত করব। তারা আমার কাছে এসেছে"। এই বলে আশেকানদের মাঝে চলে আসতেন। তাঁর মত দরদী আমি আর কাউকে দেখিনি। নিজের দূর্বলতা উপেক্ষা করে ধৈর্য্য ধরে সবার আরজি শুনতেন। অসুস্থতা আশেকানদের বুঝতে দিতেন না। আম্মাজানের আরেকটি নীতি ছিল দরবার থেকে কাউকে না খেয়ে যেতে দিতেন না। যখন যা কিছু থাকত সবাইকে বন্টনের নির্দেশ দিতেন। অনেক আশেক-ভক্তদের গোপনে সাহায্য করতেন।

তাঁর দয়ামায়া ভালবাসা জাগতিকভাবে যা পেয়েছি পরকালেও যেন সেই ছায়া পাই এই বিশ্বাস নিয়ে দরবারের খেদমতে নিয়োজিত আছি।

সাহেদা বেগম
উম্মুল আশেকীন-এর খাদেমা
ওবায়দুর রহমান মুন্সির বাড়ি, উত্তর ধুরুং,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

মুজিবা'কেও তা খেতে দিবেন

উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম দাঁতমারা তাঁর বাপের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সেখানে আমাকে দেখেন। আমার বয়স তখন চার বছর। তাঁর বড় ভাবীর কাছে জিজ্ঞেস করেন, এই মেয়ে কার? চেয়ারম্যান শাহীনের মা বলেন, ও হচ্ছে সোলাইমানের নাতনী।

আম্মাজান আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসার কথা বলেন। পরে আম্মাজানের সাথে আমি দরবারে চলে আসি। আমার শৈশবকাল দরবারেই কাটে। আম্মাজান তাঁর মেয়েদের সাথে আমাকেও মাতৃছায়া দিয়ে বড় করেছেন। আপুদের সাথে গোসল করাতেন, খাবার খাওয়াতেন, মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতেন অনেক আদরযত্নে লালন করেছেন। কখনো কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে আপুদের নির্দেশ দিতেন আমাকে গোসল করিয়ে দিতে। আমি আম্মাজানের খাটের নিচে শুয়ে থাকতাম সবসময়ই। আম্মাজান এসে মাথায় বালিশ দিয়ে দিতেন, গায়ে কাঁথা চাপিয়ে দিতেন। না খেয়ে ঘুমালে ঘুম থেকে তুলে ভাত খাইয়ে দিতেন। শাহানশাহ্ বাবাজানও আমাকে অনেক আদর করতেন।

আমাকে আংগুর ফল খাওয়াতেন সবসময়। আম্মাজানকে বলতেন "ওয়া জেবুর মা মুজিবা খালারে জামা সেলাই দিও"। আমি প্রায়সময় খালি গায়ে থাকতাম। আম্মাজান সেলাই কাজ জানতেন। নিজ হাতে আমার ও আপুদের জন্য জামা বানাতেন। আপুদের বলতেন মুজিবাকে তোমরা তোমাদের বোনের মত করে রাখবে, সে যেন পরিবারের জন্য কান্না না করে সবকিছুই যেন ভুলে যায়।

আমি আম্মাজানের অনেক আদরের ছিলাম। এত যে ভালবাসতেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। তাঁর মায়া-মমতা আমাকে সবকিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে। এভাবেই বেড়ে উঠার পর থেকে আমি অনেক কিছু বুঝলাম কাজকর্মেও অনেক অগ্রসর হলাম। তারপর থেকে আম্মাজানের কাজ আমি করতাম। তাঁর সেবাযত্ন, পা চেপে দেওয়া, মাথা আঁচড়ানো, কাপড় ধোয়া, কাপড় আয়রন করা, চা বানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

আম্মাজান আমাকে নিজের মেয়ের মত করে সব কাজ শিখিয়েছেন। তিনি যেখানে বেড়াতে যেতেন আমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন। যাদের বাসায় যেতেন তাদের বলতেন, "আমাকে যা খেতে দিবে আমার মেয়ে মুজিবাকেও তা দিবে"।

মাঝেমধ্যে নিজে উঠে তালাশ করতেন খেয়েছি কিনা। তিনি অনেক দয়ালু ছিলেন।

তখনকার সময় অনেক দূর্বিষহ অবস্থা ছিল। হক মন্‌জিলের চারপাশে জঙ্গলে ঘেরা ছিল, বিদ্যুৎ ছিল না, তেমন জিনিসপত্র ছিল না। বেড়ার দুটি কামরা ছিল আর একটি ছোট অফিস রুম ছিল। আমি সন্ধ্যা হলে শাহানশাহ্ বাবাজান ও আম্মাজানের রুমে হারিকেন জ্বালিয়ে দিতাম। আহমদিয়া মন্‌জিল থেকে স্বল্প পরিমান খাবার আসত। আমরা সবাই ভাগ করে খেতাম। অনেক সময় আম্মাজান নিজে না খেয়ে আমাদের ভাগ করে দিতেন। খুবই করুণ পরিস্থিতি।

মাঝে মাঝে আম্মাজান বাবাজানের কাছে টাকা চাইতেন। বাবাজান হেসে হেসে বলতেন, "অনরতে টেঁয়া লাগেরধে ধরন লই যন। এই বলে দুই–তিন হাজার টাকা বের করে দিতেন। আম্মাজান লোক পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খাবারের পণ্য সামগ্রী কিনে আনতেন। জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কখনো কিছু খেতে মন চাইলেও ইচ্ছাকে মাটি চাপা দিয়ে দিতেন। তবে নিজের ভাগটুকুও অন্যকে খাওয়ানোতে যথেষ্ট তৃপ্তি পেতেন।

আম্মাজান অনেক দানশীল ছিলেন। আমাকে নিজ তাগিদে বিবাহ দেন। আমার বিয়ের সকল খরচ আম্মাজান বহন করেন। এছাড়াও আমার প্রত্যেক সন্তানদের জন্মও দরবারেই হয়েছে। প্রতিবারই আমার চিকিৎসার খরচ ও অন্যান্য খরচ আম্মাজানের কাছ থেকে দেন। আমার সন্তানদের জন্য নিজ হাতে কাঁথা সেলাই করেছেন। তাঁর শাড়ি দিয়ে জামা সেলাই করে দেন। আমার প্রথম ডেলিভারির সময় দ্রুত হসপিটালে নেওয়ার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার অবস্থাও খারাপ ছিল। সে সময়ে আম্মাজান শাহানশাহ্ বাবাজানের গাড়ি করে আমাকে হসপিটাল পাঠান। শাহানশাহ্ বাবাজানের গাড়িতে কখনো কেউ উঠার সাহসও করেননি। অথচ আম্মাজান আমাকে বাঁচানোর জন্য সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আম্মাজান এর স্মৃতি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই জড়িয়ে আছে।

তাঁর মায়া-মমতায় আকৃষ্ট হয়ে আমি আমার পরিবারকে ভুলে গেছি। আমার ইহকাল ও পরকাল সর্বক্ষণ যেন আম্মাজানের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাই এটিই একমাত্র প্রত্যাশা।

আম্মাজান আশেকানদের বেশি গুরুত্ব দিতেন। আপ্যায়নে কখনো অবহেলা করতেন না। আমদেরও শিখিয়েছেন কোন মেহমানদের কিভাবে সমাদর করতে

হয়। আমার দায়িত্ব ছিল নাস্তার কাজ। মেহমানদের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আমি আম্মাজানের নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু সাজিয়ে দিতাম। আম্মাজান বলতেন, “মুজিবা আমার হাতের সব কাজ বুঝে নিয়েছে। সে থাকলে আমার আর চিন্তা করতে হয় না। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন পাড়ি দিয়ে আজ আমাদের কাছ থেকে লুকায়িত হয়ে আছেন। এখন সবকিছুই আছে তবে আম্মাজান-এর সেই মধুর ডাকটি আর শুনতে পাইনা। অনুভব করি কিন্তু দেখতে পারছি না। বর্তমানের এই মনোরঞ্জন পরিবেশ পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যে ভরপুর সব কিছুই আম্মাজান এর আত্মত্যাগ এর অবদান।

মুজিবা আকতার
উম্মুল আশেকীন-এর খাদেমা
শাহীন চেয়াম্যানের বাড়ি
দাঁতমারা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

আম্মাজানের সঙ্গে অনেক স্মৃতি

আমি বহুদিন যাবত হক মন্‌জিলের খেদমতে দায়িত্বরত আছি। আম্মাজান-এর বিবাহের সময় আমি ছোট ছিলাম। আমার মা আহমদিয়া মন্‌জিলের খেদমতে ছিলেন। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাবাজান বদরুজ্জামান সিকদার সাহেবকে ডেকে বলেন, হযরত বাবাজানের হুকুমে আপনার মেয়েকে আমার বড়মিয়ার সহধর্মিনী রূপে দরবারে আনতে চাই। তখন বদরুজ্জামান সাহেব মাথা নিচু করে রইলেন কোন জবাব দেননি।

বাড়িতে গিয়ে আম্মাজানের মতামত নিয়ে প্রস্তাবে রাজি হয়ে দাদা হুজুরের কাছে আসলেন। এরপর দুই পরিবারের সহমতে বিবাহের সকল রীতিনীতি পালন করে গরুর গাড়ি সাজিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আম্মাজানকে বধূ বেশে বাড়িতে আনেন। শাহানশাহ্ বাবাজান ও মেজ বাবাজান-এর বিবাহ প্রায় একই সাথে হয়েছিল।

আমি মেজ আপু, সেজ আপু সবার সাথে খেলাধুলা করতাম। আম্মাজান আমাদের সবাইকে আদর করে বিস্কুট দিতেন। তখনকার সময়ে এত দালান, আসবাব পত্র, টাকাপয়সা ছিল না। আম্মাজান একটা রুমে চৌকির উপর বসে থাকতেন। আমি আম্মাজানের আশেপাশে থাকতাম সবসময়।

শাহানশাহ্ বাবাজান আধ্যাত্মিক ধ্যানে জজ্‌বায় উত্তেজিত হয়ে উঠলে সবাই ভয় পেত। আম্মাজান ঘরের এক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দাদীজান আমার মাকে আম্মাজান এর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমার মা আম্মাজানকে পানি খেতে দিতেন। ভয় না পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কথা বলতেন। আম্মাজান চুপচাপ সব শুনতেন। যতবার পানি দিতেন অবুঝের মত ততবার পান করতেন। এভাবে সকলের সঙ্গে তিন বছর কুরবান পালনের পর চতুর্থ কুরবানে শাহানশাহ্ বাবাজানকে পরিবার সহ হক মন্‌জিলে আলাদা করে দেওয়া হয়। সেইদিন থেকে নিজের সংসারের দায়িত্বের চাপ বহন করেন।

হক মন্‌জিলের আশেকানদের মানতের হাদিয়ার মুরগী লালন পালনে জতুন খালা দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি মুরগীর দায়িত্বে একটানা বার বছর খেদমত করি। আম্মাজানের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ইসলামের মহীয়সী নারীর মতই সংগ্রামী। আম্মাজান তাঁর শাড়ি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়েছিলেন। আমার স্বামীর জন্যও লুঙ্গি দিয়ে লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেন। অন্যান্য খেদমতকারী আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে চিন্তা করে

যা কিছু দিতেন লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে বলতেন। এভাবে গোপনে সবাইকে সাহায্য করতেন। যার বিষয় তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। অন্যদের বুঝতে দিতেন না। বহুবার আমার হাতের মুঠিতে টাকা গুঁজে দিতেন। তাঁর অনেক সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি।

আমি বাড়ি যাওয়ার পর আম্মাজান অসুস্থ হয়ে যান। সবসময় চিন্তিত থাকতাম আম্মাজানের সাথে শেষ দেখা করতে পারব কিনা। আমার বড় ননদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর ননদের মেয়ে বলছিল, ফুপু আপনি দরবারে যাবেন না? দরবারের আম্মাজান ইন্তেকাল করেছেন। অনেক মানুষের সমাগম চলছে। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। নিশ্চয় আমার আম্মাজান-এর কিছু হয়েছে। আবেগপ্রবণ হয়ে পাগলের বেশে দৌঁড়ে চলে আসি। এসে দেখি লাখো মানুষের সমাগম। ছুটে গেলাম বৌমার কাছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে বৌমাকে জানাই আম্মাজানকে না দেখলে মনকে বুঝাতে পারব না। বৌমা কান্নায় অর্ধমৃত অবস্থা, তবুও আমাকে সান্তনা দিচ্ছিলেন। এরপর আম্মাজানের গোসলের স্থানে পাঠালেন। সৌভাগ্যক্রমে আম্মাজানের আখেরি গোসল মোবারকে খেদমতের সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

রানু বেগম
উম্মুল আশেকীন-এর খাদেমা

আত্মীয়-নিকটাত্মীয়

আব্বা বড় ভাবীকে খুবই স্নেহ করতেন

শহরে থেকে পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকাতে বড় ভাবীর (উম্মুল আশেকীন) সাথে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। যে কারণে তাঁর সম্পর্কে আমার বেশি স্মৃতি নেই। ১৯৬৩ সালে আমি পড়ালেখার জন্যে শহরে চলে আসি। বয়স কম হবার কারণে আমার স্মৃতিতে তেমন কিছু নেই। আমার মা সংসারের সবকিছু সামলাতেন। ভাবীরা তাঁর কাজে সহযোগিতা করতেন। বড়ভাবী আমার মায়ের সাথে ছিলেন ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। এ বছর আমার মা ইন্তেকাল করেন।

এরপর আমি বাড়ি যেতাম গরমের ছুটিতে, রোজার ছুটিতে, ঈদে-পর্বে, বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলোতে ও প্রয়োজনবোধে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আমি শহরে ছিলাম। আমার পিতার ওফাতের পর থেকে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের কর্মযজ্ঞে আমি যুক্ত হয়েছি। তখন যোগযোগ ব্যবস্থাও তেমন উন্নত না থাকায় দিন পনের অন্তর দরবারে যেতাম।

একবার আমি শহর থেকে গিয়েছি, তিনি আমাকে নাস্তা খেতে দিলেন। আমি নাস্তা খেতে সংকোচবোধ করছিলাম এবং একটু একটু খাচ্ছিলাম। আমি লজ্জা পাচ্ছি এটা তিনি বুঝতে পেরে বলেন, "আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, আপনি খেয়ে নেন"। আমার মনে হচ্ছে তিনি সাইকোলজি খুব ভালো বুঝতেন এবং এ বিষয়টি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে।

ভাবীর যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স চার বছর। আমি তাঁর দেবর হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনদিন আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করে কোনদিন কথা বলেন নি বা নাম ধরেও ডাকেন নি। এমনকি আমার অন্যান্য ভাইদেরও নাম ধরে ডাকেন নি এবং তুমি সম্বোধন করেন নি। বড় দাদাও (শাহানশাহ্ হুজুর) সবার সাথে 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলতেন। বড় ভাবী খুবই অতিথিপরায়ন ছিলেন।

আমার বাবা অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর সাথে আমি পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকতাম। পরিবারের দায়িত্ব পালনের জন্যে নয়। আমার উপরে আরো চার ভাই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে বড়জনই দায়িত্ব পালন করেন। তবে তিনি স্বাভাবিক কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না বলে আমার বাবা মেজ দাদাকে (শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল

হক মাইজভাণ্ডারী) দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমি পঞ্চম সন্তান অর্থাৎ সবার ছোট হওয়াতে আদরযত্নে আমার দিন চলে গেছে।

বড় ভাবীর বাবা দরবারের খেদমত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকাতে দরবারের আবহটা তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না। তাঁর বাবার দরবারের সংস্কৃতি চর্চা দেখে অভ্যস্ত হওয়ায় আম্মার সাথে থেকে দরবারের কাজকর্ম তিনি খুব সহজেই বুঝে নিতে পারতেন। যে কোন বিষয় তিনি ভালোভাবেই খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্বে নিতে পারতেন।

তাঁর সঙ্গে যে-ই কথা বলেছেন সবাই সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেছেন। কারো প্রতি কোন রুষ্ট আচরন করেছেন এমনটি আমি শুনিনি এবং আমিও দেখিনি।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক, খাদেমুল ফোক্বারা, অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর সবচেয়ে বড়ো সম্পদ ছিলো নৈতিকতা। যে কোন প্রলোভনকে তিনি পরিত্যাগ করে নীতি-নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি একবার বাঁশখালী গিয়েছিলেন, এলাকার এক বয়স্ক মহিলা মুরিদ তাঁর বাড়িতে যেতে অনুরোধ করলে তিনি গেলেন। মহিলা বাবাকে একটি প্যাকেট দিয়ে বলেন, আমার তো কোন সম্পদ নেই, আমার যতো অলংকার আছে সবই আপনাকে দিয়ে দিলাম। বাবা তা নিয়ে চিন্তা করলেন, এজন্যেই কি মানুষ সায়ের পীরি করে এভাবেই মানুষকে ঠকায়? ভক্ত আবেগে তার সর্বস্ব পীরকে দিয়ে দিচ্ছে। তিনি মহিলাকে অলংকারের প্যাকেটটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি পেয়েছি, বুঝে নিয়েছি, তবে আপনি এটা রেখে দিন" – এই বলে তিনি চলে আসলেন।

তিনি দরবার শরিফ আসার পরে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নির্দেশ পেয়ে 'দরবার শরিফ স্টোর'-এর ম্যানেজার খায়রুল বশর মাস্টার সাহেবেক বললেন, পাঁচটি গরু বিক্রেতা যে দাম বলবে সেই দামে কিনে নিতে। দুয়েকদিন পর এক বিক্রেতা বাজারে বিক্রির জন্যে সাতটি গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন। খায়রুল বশর মাস্টার একদামে পাঁচটি গরু কিনে নিয়ে দরবারে আনলেন। তিনি এরপর অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশ মতো পাঁচটি গরু জবাই করে গোশ্‌ত বিলিয়ে দেন। এরপর তিনি জীবনে কোনদিন আর সায়েরও করেননি এবং দরবার হতে বাইরেও যান নি।

'আমার পিতা বড় ভাবীকে খুবই স্নেহ করতেন। নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন। বড় ভাবী মূলতঃ আমার পিতার উপর্যুক্ত আদর্শ এবং নীতি-নৈতিকতা কার্যকর অর্থে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থেকেছেন।

আলহাজ্ব শাহ্ সুফি সৈয়দ সহিদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মা.জি.আ)
অসিয়তনামা মূলে দরবার পরিচালনায় মনোনীত খেদমতগার জিম্মাদার,
মোন্তাজেম আওলাদ
গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

স্মৃতিতে ভাস্বর : বড় ভাবী

উম্মুল আশেকীন আমার বড় জা। শ্বশুরবাড়িতে চার জা-র সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক সম্পর্ক আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জলভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অকৃত্রিম সম্মানে ও পরম শ্রদ্ধায়। বড় ভাবীকে (আমার বড় জা) নিয়ে লিখবো এমনটা কখনোই ভাবনায় ছিলো না। সম্প্রতি একদিন ভাগ্নি স্বপ্না (ছোট বুবুর মেয়ে) ফোনে জানালো বড় ভাবীর প্রথম মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বড় ভাবীর প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লেখার জন্য তার অনুরোধে এবং জেসমিনের (উম্মুল আশেকীন-এর পুত্রবধূ) আগ্রহের সুবাদে পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিনির্ভর এবং অনুভবের কিছু কথা উপস্থাপনের এই প্রয়াস।

বিবাহসূত্রে এই পরিবারে আমার যুক্ত হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে যখন আমার বড় জা বউ হিসাবে এই পরিবারে এসেছিলেন তখন আমার জন্মও হয়নি। বয়সের এই পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সাথে তাঁর আচার ও ব্যবহারে তিনি বয়সের তারতম্যকে কখনোই আমলে রাখেননি। দীর্ঘ সাড়ে তিন যুগের সময়কাল ধরে পারস্পরিক আলাপে একবারের জন্যও তিনি আমাকে 'তুমি' কিংবা আমার নাম ধরে সম্বোধন করেননি, ছোট দেবরের সহধর্মিনী হওয়া সত্ত্বেও বরাবরই 'আপনি' বা 'ভাবী' বলেই সম্বোধন করতেন। তাঁর অপার স্নেহ আর মমতায় ভরা সম্পর্কের উষ্ণতাকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি প্রতিনিয়ত। মেজ ভাবী, সেজ ভাবী ও ডাক্তার ভাবীসহ সকল দেবর ও ননদদেরকেও তিনি ভাবী, বদ্দা আর বুবু ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে এসেছেন অবলীলায়।

বলাই বাহুল্য, আমি এই পরিবারে পুত্রবধূ হিসাবে (১৯৮০) যুক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই আমার বড় ভাসুর হুজুর সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্বতন্ত্রভাবে বর্তমানের গাউসিয়া হক মন্‌জিলে বসবাস করতেন। আমরা পুরোনো বাড়ি (গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল) থেকে সদলবলে ঈদের সালাম জানাতে বা অন্য যে কোনো সময়ে হক মন্‌জিলে গেলে তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন অতিসত্ত্বর উপস্থিত হয়ে গল্পে মেতে উঠতেন। অসুস্থ অবস্থায় অধিকাংশ সময়ে তাঁর শোয়ার ঘরেই ডেকে নিয়ে কথা বলতেন। মেজ মেয়ে হুমায়রা ও পুত্রবধূ জেসমিন প্রায়শঃ বলতো আপনাদেরকে দেখলে আম্মা (বড় ভাবী) অন্যরকম খুশি ও আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন।

বিনয়ী থাকার অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধতর হওয়া একজন মহীয়সী নারী হিসাবে গণ্য হওয়ার যাবতীয় গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিলো। রাগ, হিংসা, ক্রোধের কোন প্রতিফলন তাঁর আচার এবং আচরণে আমি কখনোই দেখতে পাইনি। এই পৃথিবীতে অনেক মহীয়সী নারী রয়েছেন। আমার মা এবং বড় ভাবী এই দুই জনের সাহচর্য আমাকে মহীয়সী দর্শনের অবারিত অবকাশ দান করেছে। পারিবারিক সম্পর্কে বড় ভাসুরের সহধর্মিনী 'জা' হলেও তিনি আমার কাছে মাতৃসম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিয়ের আগে থেকেই আমাদের এবং বড় ভাবীর পরিবারের মধ্যে এক ধরনের জ্ঞাতি আত্মীয়তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। ফলে আমার মা ভাবীকে পারস্পরিক ভাবে তখন থেকেই ভালোভাবেই জানতেন এবং চিনতেন। সম্ভবত এই কারণে তিনি আমাকে অতিরিক্ত মাত্রায় স্নেহ ও আলাদাভাবে ভালোবাসতেন। ফলে প্রায়শঃ খাওয়ার টেবিলে তাঁর পাশের চেয়ারে আমাকে ডেকে বসাতেন এবং এটা সেটা পাতে তুলে দিতেন।

ভাবীর রন্ধন শৈলীর হাত ছিল দক্ষ, রান্না যথেষ্ট সুস্বাদু ও উপাদেয় ছিলো। নানান ধরনের নাস্তা তৈরিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শাশুড়ির কাছেও তিনি বিভিন্ন রান্না শিখেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক পদের রান্না আমিও শিখেছি।

মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে তিনি পছন্দ করতেন ব্যাপকভাবে। ডায়াবেটিসের কারণে মিষ্টান্ন জাতীয় খাদ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিলো তাঁর প্রবল অনীহা। একবার তাঁর খাদেমাকে সঙ্গে নিয়ে মেহেদীবাগে হঠাৎ আমার বাসায় আসলে তাৎক্ষণিকভাবে ঝাল নাস্তার সাথে ঘরে তৈরি করা কাস্টার্ড টেবিলে দিলে তিনি নিজে থেকেই ঝাল খাবারগুলো বাদ দিয়ে মিষ্টি কাস্টার্ড নিয়ে খেতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে সঙ্গে আসা মেয়েটা ভয়ে কোনকিছু বলতে না পারলেও তার অস্বস্তি দেখে আমি সবিনয়ে মিষ্টি জাতীয় খাবারের বদলে ঝাল নাস্তা খাওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি হেসে বললেন, 'কিছু হবে না ঘরে গিয়ে ঔষধ খেয়ে নিব'। আরেকবার আমার বড় নাতি নামির হোসাইনের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিশেষভাবে তৈরি করা ছোট ছোট সাইজের রসগোল্লায় তাঁর আগ্রহের সুবাদে সুগারের সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে রস বের করে তাঁকে খেতে দেয়া হলে তিনি হেসে হেসে বললেন, 'এইভাবে মিষ্টি খাওয়ার কোনো অর্থ নেই, রসছাড়া মিষ্টিতো প্লাস্টিকের মতো মনে হবে। এই মিষ্টগুলোতো

ছোট সাইজের আমাকে চার পাঁচটা দিন।' অনেক সময় তিনি অবাক হয়ে বলতেন "আপনারা মিষ্টি না খেয়ে থাকেন কিভাবে?"

তাঁর মমতা মেশানো অনেক কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা পরিবারের সবাই আনন্দচিত্তে উপভোগ করতো। আতিথেয়তায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ সতর্ক। যখনই আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য যেতাম টেবিল ভর্তি খাওয়া দাওয়া এবং ফলাদিতে ভরা থাকতো। সবার দিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখে খাওয়াতে তিনি পছন্দ করতেন। ঈদের পরে পরিবারের পুরুষ সদস্য ভাসুররাসহ সকল ভাইদের ছেলে এবং মেয়ে জামাইরা আগে ভাগে এবং তারা ফিরে আসার পরে ঐদিনে কিংবা তার পরের দিনে পরিবারের মেয়ে সদস্যরা একযোগে তার সাথে দেখা ও সালাম করতে যাওয়াটা অনেকাংশে রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার পূর্বে পরিবারের সকল অনুষ্ঠানাদিতে তিনি উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত হতেন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের নাস্তা বানিয়ে পাঠানোর প্রাচীন ঐতিহ্যকে তিনি গভীরভাবে ধারণ ও লালন করে এসেছেন।

আমার সাথে ৪২ বছরের সম্পর্কের সময়কালে তিনি এক মহিমামণ্ডিত আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আপন মাধুর্যে, স্নেহ ও মমতার অবারিত ফল্গুধারায়। মেজ দাদা; সেজ দাদা এবং ডা. দাদার মেয়েরা সবাই একসাথে হলে তাদের দুলাভাইদেরকে নিয়ে শালা-শালীরা অনেক হাসি-ঠাট্টা করে মজা করতো। ভাবী এইসব বিষয়গুলো খুবই উপভোগ করতেন।

হাসানের বিয়ে উপলক্ষ্যে ঘরোয়াভাবে গহনা বাছাইয়ের বিষয়ে কেউ কেউ নাকি বলেছেন, কেউ হীরার সেট তৈরির কথা বললে কেউ একজন নাকি জানালো যে আসল হীরা তেমন চকচকে বা উজ্জ্বল হয় না। ইতোমধ্যে ভাবীর সাথে দেখা করতে যাওয়ার পর বড় ভাবী এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে জিজ্ঞাসার সূত্রে হাসতে হাসতে বললেন 'নকল হীরে বেশি উজ্জ্বল আর আসল হীরে কম উজ্জ্বল' এ কথা কি সত্যি নাকি? আমি হেসে বললাম এ রকম তো বলতে শুনেছি। আবার হাসতে হাসতে তিনি বললেন, যাক আমরা তাহলে আসল হীরে। পারিবারিকভাবে এরকম অনেক কৌতুকপূর্ণ কথাও বলতেন।

আমার বিয়ের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনে সাফল্যের জন্য তিনি আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। প্রতিবারেই তার বুদ্ধিদীপ্ত কথা এবং নানান উপমায় বক্তব্য উপস্থাপনে তার

সহজাত পদ্ধতির কথায় আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, একজন সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীও তাঁর কাছে হার মানবে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার জ্ঞান ছিলো প্রখর এবং সুদূরপ্রসারী।

সামগ্রিকভাবে তিনি স্বমহিমায় পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল আমার হৃদয়ের মণিকোঠায়। দিন যাবে, মাস যাবে, বছরের পর বছরও কেটে যাবে। স্মৃতির প্রাচীন প্রাসাদে সংরক্ষিত অতীতের খেরো খাতায় চিরজাগরুক, ভাস্বর বড় ভাবী ফিরে ফিরে আসবেন তার স্নেহ, মমতা আর আন্তরিকতাপূর্ণ সহজাত বৈশিষ্ট্যে। আল্লাহ্ তার রফে-ই দরজাতে বুলন্দি আতা করুন।

জাহিদা শিরিন
[উম্মুল আশেকীন-এর ছোট জা
(শাহ্ সুফি সৈয়দ সহিদুল হক মাইজভাণ্ডারী'র সহধর্মিনী)]

স্মৃতিতে বড় ভাবী

আমি বাগে-হোসাইনী শাহ্ সুফি হযরত অছি-এ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা নাজমুন্নেসা বেগম। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই। আমি তাঁকে দাদা বলেই সম্বোধন করতাম। আমাদের ভাইবোনের মধ্যে দাদা ভিন্ন স্বভাবের ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল খোদায়ী জগতের রহস্যে ঘেরা। খোদায়ী কুদরত ও গাউসিয়াতের ক্ষমতাবান আধ্যাত্মিক জগতের অলি ছিলেন তিনি। তাঁর মধ্যে গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী ও গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী কেবলায়ে কাবা বিদ্যমান ছিলেন।

দাদা জন্মের পর অসুস্থ ছিলেন। তাঁর মুখে ঘা ছিল তাই জন্মের পর থেকে কিছুই খাওয়ানো যায় নি। একদিন আম্মাজান দাদাকে নিয়ে আমার নানুজানের কাছে যান। নানুজান দাদাকে কোলে নিয়ে নানুজানের সামনে রাখেন। নানাজান ভাত খাচ্ছিলেন। আধখাওয়া ভাতে পানি ঢেলে ভাতকে ভর্তা বানিয়ে, সে ভাতের পানি দাদার মুখে ঢুকিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদা সুস্থ হয়ে যান এবং প্রথম মাতৃদুগ্ধ পান করেন।

দাদাজানের জীবন প্রণালী দিনের পর দিন জটিলতা ধারণ করছিল। এরই মধ্যে ভাবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাড়িতে আনার পর ভাবীকে প্রথম দেখলাম। ভাবীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি। দাদার অবস্থা জানা সত্ত্বেও ভাবী বিবাহে সম্মত হয়েছেন সেই কৃতজ্ঞতায় আম্মাজান ভাবীকে অনেক ভালবাসতেন। তাঁর প্রয়োজনীয়তার দিকে সবসময়ই খেয়াল রাখতেন। ভাবীও অনেক গুণসম্মত, সহনশীল, সাংসারিক রমণী ছিলেন। আমাদের নিজের ভাইবোনের ন্যায় ভালবাসতেন। ছোটবেলায় গোসল করানো, খাওয়ানো, স্কুলের জন্য প্রস্তুত করানো সকল ক্ষেত্রে মায়ের মতো মমতা দিয়ে আমাকে বড় করেছেন। তাঁর অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও কখনও নাম ধরে ডাকতেন না। বুবু ডাকে সম্বোধন করতেন। কখনো কোন বিষয়ে হতাশ হতে দেখিনি তাঁকে। হয়ত, আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিনী হবেন সেই ভিত্তিতে অধিক গুণে গুণান্বিত, অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

দাদা আধ্যাত্মিক হালে অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলতেন। তাঁর কাছে আশেকান ভক্তগণ ছাড়াও অদৃশ্যের জীনজাতি, ফকির দরবেশ ও নানাজাতীয় প্রাণীর আনাগোনা হত। উচ্চকন্ঠে তাদের বকাঝকাও করতেন। দাদার আচরণে আমরা এসব অনুভব করতে পারতাম। দিনের পর দিন দাদার অবস্থা অনেক রহস্যময় হয়ে উঠে। পরে আব্বাজান সিদ্ধান্ত নেন তাঁকে 'হাসান ভিলা' অর্থাৎ বর্তমান 'হক মন্‌জিল'এ পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর প্রকাশের লক্ষ্যে আলাদা করে দেওয়া খুবই জরুরি ছিল। দাদার অলৌকিক কর্মকান্ড প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। কিন্তু আম্মাজান কিছুতেই সহমত হচ্ছেন না।

দাদা যেহেতু সাংসারিক ছিলেন না, তাই আম্মা ভাবীকে নিয়ে অনেক চিন্তিত থাকতেন। আম্মাজান বলতেন, বাগান বাড়িতে কেউ থাকেনা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড়বৌ একা কি করে থাকবে!! পরিবারের ভরনপোষণ কি করে করবে? আব্বাজান বলতেন, বড়মিয়ার সবকিছু খোদার কুদরতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তবুও আম্মাজান নারাজ ছিলেন। আব্বাজান বলেন, হতাশ হয়ো না। আমারাও সেখানে চলে যাব।

এর বেশকিছুদিন পর আম্মাজান পর্দার অন্তরালে চলে যান। বর্তমান অছিএ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মাজার শরিফের জায়গাটি কিনে আম্মাজানের কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় সময় দাদা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে খালি গায়ে অধিক সময় ধরে আম্মাজানের রওজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পরে আব্বাজান সিদ্ধান্ত নিয়ে দাদা ও তাঁর স্বপরিবার 'হাসান ভিলা'তে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই ভাবী একক সংসারের শুরু করেন। মাত্র দুইটি রুম ও একটি রান্নাঘর ছিল। ভাবীর দীর্ঘ সংগ্রামে সেই ছোট্ট কুঠিরটি আজ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা মাঝেমধ্যে দেখতে যেতাম। আমাদের দেখলে ভাবী খুবই আনন্দিত হতেন।

একদিন আমাকে ও মেজ আপাকে পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে ভাবী একাকীত্বের কথা বলেছিলেন। অনেক অসহায় অনুভব করতেন। ভরাবাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত। সবাইকে ছেড়ে একা হয়ে গেছেন। হঠাৎ দাদা শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে ভাবীকে বললেন, তওবা কর। এরকম কখনো বলবে না আব্বাজান যা করেন বুঝে চিন্তে করেন। যা করেছেন আমাদের ভালোর জন্যই করেছেন। ভাবী চুপ হয়ে যান। মেজআপা দাদাকে সান্ত্বনা দিয়ে থামিয়ে দেন।

আমার বিবাহ হয় দাদার সহপাঠী চৌধুরী এন.জি. মাহমুদ কামাল সাহেবের সাথে। বিবাহের পর দাদাকে দেখতে গেলাম। ভাবী আছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আছে ত। জেবুর মা আছে ত। জেবুর মা ওয়া বেহেশ্তি মহিলা" পরপর তিনবার কথাটি উল্লেখ করেছেন। আমিও হেসে বললাম, বেহেশ্তি মহিলা তাইতো আপনার জীবনসঙ্গী হয়েছেন। আমাকে পাশে বসিয়ে পা চেপে দিতে বললেন। আমি অনেক সংকোচ করছিলাম। কখনো দাদার পাশে বসা হয়নি। সবসময়ই তাঁর পায়ের নিচে বসতাম। আম্মাজান বলতেন, বড়মিয়া তোমার অন্য ভাইদের মত না। তাকে সম্মান করবে। আদবে যেন ভুল না হয়। এক পা শেষে অন্য পা বাড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়লে ভাবী আমার হাত টেনে নাস্তা খেতে নিয়ে যান।
একদিন দাদা আমার বাসায় গিয়ে ভাত দিতে বলেন। আমি তাড়াতাড়ি টেবিলে সবকিছু সাজিয়ে দেই। দাদা বললেন একটা প্লেটে অল্প পরিমাণ ভাত আর তরকারি দিতে। দাদার পেছনে আশেকানেরাও ঘরের ভিতর ভিড় করে। দাদা সবাইকে বাহির করে ভিতর রুম থেকে আমাকে ডেকে এনে ভাত খাইয়ে দিতে বলেন। একই ঘটনা আমার অন্য বোনদের সাথেও হয়েছে। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি সেটাই দাদার সঙ্গে শেষ দেখা হবে। ওফাতের পর তিনি স্বয়ং আমাদের মাঝে নেই, তবুও আশেপাশে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারতাম।

দাদার ভালবাসা ও ভাবীর ভালবাসার মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। ভাবীজানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলামের বিখ্যাত নারীগণের সমতুল্য। তাঁর গুণ, ধৈর্য্য, প্রেম ভালবাসা অতুলনীয়। নিশ্চুপ অবস্থায় থেকে সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। সংসার জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ত্যাগ স্বীকারের প্রেক্ষাপটে ভাবীজানের আত্মকাহিনী সকল কিছুর উর্ধ্বে। আদর্শ মহিয়সী নারী ছিলেন তিনি।

সৈয়দা নাজমুন্নেসা বেগম
উম্মুল আশেকীন-এর ছোট ননদ
(অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ছোট শাহ্জাদী)

একটু প্রশান্তির আশায় মহিলারা ছুটে যেতেন তাঁর কাছে

আমার অত্যন্ত প্রিয় বেয়াইন উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। আমাকে এতো ভালবাসতেন যে, ছোট বোনের মতো জানতেন। আমাকে দেখলে সবসময় এমন একটি মিষ্টি হাসি দিতেন যে সেই হাসিটা আমার সবসময় মনে থাকবে।

আমি তাঁর কাছে মাঝে মাঝে দরবারে, শহরে বেড়াতে আসতাম, আমরা দু'জন একসাথে হলে অনেক গল্প করতাম।

আমরা একসাথে সিলেট, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী, সী বীচে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে পছন্দ করতেন।
তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ন ছিলেন, তাঁর কাছে বেড়াতে আসলে তিনি আমাকে অনেক আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করতেন, অনেক মজার মজার পিঠাও খাইয়েছেন। তাঁর আন্তরিক আতিথেয়তা আমাকে ও আমার পরিবারকে মুগ্ধ করেছে, তাঁর দয়া, মায়া, আন্তরিকতা কখনোই ভোলার মতো নয়।

আমার ছেলেমেয়ে, ছেলেবউ, মেয়ে জামাই নাতি-নাতনিসহ সবাই তাঁকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসেন। তিনি তাঁর ছেলে মেয়ে নাতি নাতনিসহ পরিবারের সবাইকে এতো সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন যা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে ও সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।
তাঁর এই শিক্ষার কারণে তাঁর পরিবারের সবাই পরস্পর মায়ার বাঁধনে একসূত্রে বাঁধা।
শাশুড়ি হিসেবেও তিনি অনেক আধুনিক ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। আমার মেয়ে জেসমিন তাঁর কাছে মায়ের মতো আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছে। আমার মেয়ের মুখে সবসময়ই তাঁর প্রশংসা ও অনেক গুণের কথা শুনেছি।
আমিও তাঁর অনেক আদর ও ভালোবাসা পেয়েছি। আমি ও আমার পরিবার অনেক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর ছেলে হাসান বাবাজানের সাথে আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাঁদের সাথে সম্বন্ধ করে দরবারে পাকের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি। এজন্য পরম করুণাময়ের দরবারে লাখো কোটি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ্।

তিনি সারাজীবন দরবারের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। যতবার তাঁর সাথে থেকেছি, দেখেছি তিনি দরবারের আশেক-ভক্তদের কত দয়া, মায়া করতেন, অসীম ধৈর্য্যের সাথে তাদের আর্জি ফরিয়াদগুলো শুনতেন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতেন, তাদের দুঃখে দুখী হতেন, সুখে আনন্দিত হতেন। তাদের জন্য হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে দোয়া করতেন।

অনেক অসহায় মেয়েদের তিনি খাবার দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর কাছে রেখে আদব-আখলাক, লেখাপড়া ও সাংসারিক কাজকর্ম শিখিয়েছেন এবং যথাসময়ে বিয়ের ব্যবস্থাও করেছেন।

তিনি এতো দয়ালু ছিলেন যে, সবাই তাঁর কাছে দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও শান্তি পেতেন। একটুখানি শান্তির জন্য দূর দূরান্ত থেকে হাজারো আশেক-ভক্তরা প্রতিদিন তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতেন।

তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর অসংখ্য স্মৃতি রেখে গেছেন, দরবারে গেলে তাঁকে ছাড়া চারিদিক শূন্য লাগে।

আমি আমার বেয়াই সাহেব সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ও আমার বেয়াইন সাহেবা মুনাওয়ারা বেগমের জন্য দোয়া করছি।

গুলশান আরা বেগম
স্বামী– জনাব সেকান্দর হোসেন মিয়া
রোড নং– ০৬, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম
(উম্মুল আশেকীন-এর পুত্র সন্তান
মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী'র শাশুড়ি)

আমার ছোট ফুপু

উম্মুল আশেকীন আমার রক্তের সম্পর্ক হিসেবে শ্রদ্ধেয় ছোট ফুপু। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ স্তরের একজন মহিয়সী নারী। আমি সবসময় তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতাম। আধ্যাত্মিক জগতের একজন অলি বাবা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সাথে তাঁর সম্পর্ক। সেই হিসেবে তাঁকে মায়ের চোখে দেখেছি।

সর্বদা আমার মায়ের আসনে সম্বোধন করি ও সম্মান জানাই। ছোটবেলা থেকেই সবসময় তাঁর সন্তানদের আমার আপন ভাইবোনের মতো মনে করেছি। তারাও একসময় আমাকে ভাইয়া বলে ডাকতো। এতে আমি খুবই আনন্দ অনুভব করি এবং আমিও তাদের সাথে সহজভাবেই চলেছি। শৈশবকাল থেকেই আম্মাজান এর সাথে স্মৃতি বিজড়িত অনেক কিছু চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সবগুলো হয়তো এ মুহূর্তে বলতে পারবোনা। তবে দু-একটা কথা আমার মনে আছে। তিনি যখন পশ্চিমের বাড়িতে ছিলেন তখন তাঁর কোন আলাদা অস্তিত্ব বা আলাদা স্বকীয় রুম, নিজের থাকার জায়গা এসব নিয়ে তাঁর কোন চিন্তাভাবনা বা ঐ ধরনের ব্যবস্থা তিনি করেননি। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে অবস্থানকালে সবার সাথে, একসাথে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে থেকে এবং তাঁদের সকলের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করে যেতে দেখেছি। বিশেষ করে দাদাজান অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর প্রতি আম্মাজানের আন্তরিকতা ছিল সর্বাধিক। দাদাজানকে অনেক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। এসব নিয়ে আম্মাজানের কোন আলস্য ছিল না। যথেষ্ট সন্তুষ্টির সাথে হাসিমুখে সবসময়ই তিনি কর্মরত থাকতেন। পরিবারের সকলের জন্য দায়িত্ব নিয়ে যথাসাধ্য কাজ করে যেতেন। আম্মাজান গৃহের কার্যে অনেক পারদর্শী ছিলেন। শাহানশাহ্ বাবাজান প্রায় সময়েই আধ্যাত্মিকতায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একটি রুমের মধ্যে বন্দি হয়ে জজ্‌বা হালে একাকীত্বে সিগারেট পান করতেন। জাগতিক কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, কোনরূপ আপত্তিও ছিলনা। এমতাবস্থায় আম্মাজান একাই পরিবার, সন্তানদের লালন পালন, আত্মীয়তা রক্ষা, আশেকান ভক্তদের সমাদর সকল কিছুর ভরনপোষণ করতেন। এতসব দায়িত্ব পালন আম্মাজান এর পক্ষে কিভাবে সম্ভব ছিল, তা এখনও চিন্তা করে আমি হতবাক হই। যখন আম্মাজান ও তাঁর ছেলেমেয়েদের আলাদা হয়ে একটি নির্জন জনশূন্য

পরিবেশে চলে আসতে হয়। কুটিরটিতে মাত্র দুটি কামরা ছিল। একটিতে শাহানশাহ্ বাবাজান থাকতেন, অপর একটি আশেকান-ভক্তগণ বাবাজানের সাক্ষাতে আসলে তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। আর রান্নাঘরের পাশে আলাদা একটি ছোট কামরায় আম্মাজান তাঁর সন্তানদের নিয়ে থাকতেন। এসবের মধ্যদিয়েও তিনি সবসময়ই হাসিমুখে থাকতেন। আশেকান ভক্তগণদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সকলের খাওয়া-দাওয়া, ভালোমন্দ সকলকিছুর খেয়াল রাখতেন। বাবাজানকে বলতে না পারার মনোবাসনাগুলো ভক্তগণ আম্মাজানকে বলে যেতেন। আম্মাজান ধৈর্য্যের সাথে সকল কিছু উপলব্ধি করতেন। সঠিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সকলের আরজি কবুল করতেন। মাঝেমধ্যে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতেন। আওলাদে রাসূল শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.)-এর সম্মানিতা সহধর্মিনী আমার শ্রদ্ধেয় ফুপু হিসেবে ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করতাম। দরবারের আওলাদে-পাক হিসেবে ভক্তি শ্রদ্ধার যেন কমতি না হয় সেই ভয়ভীতি মনের মধ্যে সবসময় বিরাজ করত।

একসময় শাহানশাহ্ বাবাজান তাঁর ছেলেমেয়েদের ও আম্মাজানকে আমাদের শহরের বাসায় দীর্ঘদিন যাবত রেখে যান। সবাইকে কাছে পেয়ে, আমরা খুব আনন্দিত হই। বাবাজান মাঝেমধ্যে এসে খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। বাসায় স্বল্প পরিসরে সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকতাম। সমাদরের প্রতি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম, তবুও একপর্যায়ে এসে হয়ত যথাযথ আদরযত্ন করতে পারিনি। আম্মাজান প্রত্যেকটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। আন্তরিকতার সাথে মিলেমিশে ছিলেন। একখণ্ড স্বর্ণকে যেমনটা জ্বলন্ত আগুনে পোড়াতে পোড়াতে খাঁটি সোনায় রূপান্তর করা হয়, ঠিক তেমনই আম্মাজান দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে, সকল কিছুকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামিক অনুভূতি ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে একজন সাধক হয়ে উঠলেন।

ভক্তগণ বিশেষ করে মহিলারা আম্মাজান এর কাছে দোয়া প্রাপ্তিতে সফলকাম হয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপনের লক্ষ্যে দরবারে হাজির হত। প্রথমত তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পরিচালক। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়ে আজকের হক মন্‌জিল এতবড় একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। দক্ষ পরিচালক হিসেবে আম্মাজান তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীকে আদর্শ মহাপুরুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। জাগতিক সুখ আরাম আয়েশ উপেক্ষা

করে মানুষের জন্য নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দেওয়া এইসব কিছুর পেছনে আম্মাজানের বিশেষ অবদান রয়েছে। রাহ্বারে আলম হাসান মিয়া মওলা মাইজভাণ্ডারী পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠার আগমুহূর্ত পর্যন্ত আম্মাজান সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনের মধ্যদিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মগুলো পরিচালনা করতেন। একপর্যায়ে মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া শুরু করলে, আম্মাজান ধীরে ধীরে নিজেকে অন্দরমহলে গুটিয়ে মহিলাদের নিয়ে নিজের আরেকটি জগৎ সাজিয়ে তুলেছেন। শাহানশাহ্ জিয়া বাবাজানের অভাব মহিলারা আম্মাজানের মধ্যদিয়ে মিটিয়ে নিতে সক্ষম হন। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তবুও সকলের মনের মধ্যস্থলে ভালবাসার এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

তাঁর ইন্তেকালের সময় মাইজভাণ্ডারের বিশাল জনস্রোত, গোটা দরবার লোকারণ্যে ভরপুর হয়ে উঠা, আশেকান ভক্তগণের ঢল, জিকিরের উচ্চধ্বনি এসকল কিছু তাঁর আধ্যাত্মিকতার পুর্ণসার্থকতা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার নিদর্শন বহন করে। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন আম্মাজানকে বেহেশ্তের উচ্চস্থান নসিব করুন। তাঁর যাবতীয় ত্যাগ, সাধনা ও দীনের কর্মকাণ্ডগুলো কবুল করুন। আমিন।

আহমেদ আবু নাসের চৌধুরী (শামু)
ভুজপূর থানার ২নং দাঁতমারা ইউনিয়নের সিকদার বাড়ি নিবাসী
মরহুম আবু তালেব চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে

কে আমাকে এতো স্নেহ করবে

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম আমার বড় মামী শ্বাশুড়ি। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর স্নেহ করতেন। এত সীমাহীন নজিরবিহীন আদর-মহব্বতের কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ভরা কণ্ঠে "শাহজাহানের বউ" বলে ডাকতেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করতেন। আমাকে জিজ্ঞেস করতেন "আমার শাহজাহান মিয়া" কেমন আছে?

তিনি আমাকে সবসময় ধৈর্য্য ধারনের জন্য উপদেশ দিতেন। ভক্তবৃন্দ দরবারে গেলে আমার কথা, আমার ছেলেদের কথা জিজ্ঞেস করতেন। এখন তো আমার বড় মামী নেই, কে আমাকে 'শাহজাহানের বউ' বলে স্নেহভরে ডাকবে? কে আমাকে এত স্নেহ করবে?

মামী যে আমাকে কতটা মহব্বত করতেন সেটা এত ছোট্ট পরিসরে বলা সম্ভব নয়। আমি শুধুমাত্র একটা ঘটনার কথা তুলে ধরছি:

বড় মামীর ওফাতের বেশ কিছুদিন আগের কথা। একবার আমি দরবারে গিয়ে ভেতর বাড়িতে মামীজানের কাছে যথারীতি দোয়াপ্রার্থী হই। ফেরার সময় ভুল করে হ্যান্ডব্যাগটি ডাইনিং টেবিলে ফেলে আসি। (মামী সেটা খেয়াল করেছিলেন)।

ইতোমধ্যে আমি আমার ব্যাগের কথা ভুলে গেছি। এর মাসখানেক পর যখন মামীজানের কাছে দোয়া নিতে গেলাম তিনি তখন আলমারি থেকে ব্যাগটা এনে আমার হাতে দিলেন। আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্যাগটি রেখে দিয়েছেন, আবার আমি যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি মনে করি এটি একটি ছোট্ট ঘটনা হলেও এর মধ্যে আমানতদারীতার একটি মহান শিক্ষা তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ্।

নাসরিন আক্তার

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বড় বোনের বড় সন্তান হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী মাইজভাণ্ডারী (ম.)-এর স্ত্রী

ভক্তদেরকে তিনি মেহমান বলতেন

উম্মুল আশেকীন আমার গুন্নি আম্মা। (ছোট ফুপু) আমার দাদা বদরুজ্জামান চৌধুরী (বদন সিকদার), দাদী বেগম আজিজা খাতুন চৌধুরীর তিন পুত্র ও পাঁচ মেয়ে ছিলেন।

১৯৫৫ ইংরেজি, ২৮ জানুয়ারি রোজ মঙ্গলবার, আমার গুন্নিফুআম্মার সাথে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সাথে বিবাহ হয়। সেই সুবাদে আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি। গুন্নিফুআম্মার ৬ মেয়ে ১ পুত্র সন্তান।

১। সৈয়দা শিরীন আখতার বেগম (২ মাস বয়সে আমাদের বাড়িতে ইন্তেকাল করেন) আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
২। শাহ্জাদী সৈয়দা জেবউন নাহার বেগম
৩। শাহ্জাদী সৈয়দা হুমায়রা বেগম
৪। শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)
৫। শাহ্জাদী সৈয়দা কুমকুম হাবিবা
৬। শাহ্জাদী সৈয়দা মুনমুন হাবিবা
৭। শাহজাদী সৈয়দা কানিজ ফাতেমা।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আমি ছোট বেলায় কোনদিন যাইনি। গুন্নিফুআম্মা আমাদের বাড়িতে নাইওর (বেড়াতে) আসলে দেখা হত।

মায়ের কাছে শুনেছি গুন্নিফুআম্মার যখন ৭/৮ মাসের বাচ্চা, তখন একদিন সকালে ঐ বয়সের একটি মেয়ে কে বা কারা সামনের পুকুরের ঘাটে রেখে যায়। তখন ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে মারা যাচ্ছিল। ঐ এতিম ছোট মেয়েটিকে আমার দাদা বদরুজ্জামান চৌধুরী দাদী বেগম আজিজা খাতুন চৌধুরীর কাছে নিয়ে হাতে তুলে দিলেন লালন-পালনের জন্য। একদিন আমার বাবা দেখলেন, আমার দাদী গুন্নিফুআম্মাকে পিঠের দিকে এবং ঐ এতিম মেয়েটিকে বুকে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন। সেই ছোট মেয়েটির নাম রেখেছিলেন 'ছেয়রনি'।

আমার বাবা আমার মেজ ফুপুকে বলেছেন 'অ'জামাল দেখছ আমার মায়ের কান্ড। আমার ছোট বোনটিকে পিঠের দিকে ফেলে রেখে ছেয়রনিকে বুকে নিয়ে

ঘুমাচ্ছে। আমার দাদী 'ছেয়রনি'কে নিজের মেয়ের থেকে বেশি আদর দিয়ে লালন পালন করেছেন। তার প্রতিদানে গুন্নি আম্মার জীবনে লক্ষ লক্ষ মান মর্যাদার প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করি। আমার দাদী এ রকম আরও শত শত এতিম শিশুকে পালন করে বড় করে ঘর দিয়ে জমি দিয়ে গৃহস্থ করে দিয়েছেন। সবার রূহের দোয়ায় আল্লাহ্ আমার গুন্নিফুআম্মাকে এত বড় আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমার গুন্নিফুআম্মার নতুন বাড়িতে দুই কামড়ার একটি বাড়ি, একটি শষ্যগোলা ও একটি টিউব ওয়েল বসিয়ে কুয়ার পার বাড়িতে আলাদা বসতি করে দেওয়া হয়। নতুন ঘরে তেমন কোন আসবাবপত্র ছিল না। তবে গুন্নিফুআম্মা তাঁর ঘর ধীরে ধীরে এক কামড়া দুই কামড়ার ঘর থেকে অগণিত ভবন সম্বলিত 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল'এ রূপ দেওয়ার পেছনে অনেক অবদান রেখেছেন। যারা পুরানো লোক আছেন তারাই বুঝবেন এবং বিশ্বাস করবেন।

কুলাল বাড়ির জানু সওদাগর থেকে প্রথমে তার বাড়ির ভিটা ক্রয় করেন। ঐখানে যখন ভাণ্ডারখানা আরম্ভ করলেন 'মা'জানের (গুন্নিফুআম্মার) খুশির সীমা ছিল না। তার পরে গুন্নিফুআম্মার পরিকল্পনা মতে ঐ ভাণ্ডারখানার নাম দেওয়া হয় 'পূর্ববাড়ি ভাণ্ডারখানা'। গভীর রাতে ২/৪ জন খাদেমাকে নিয়ে গুন্নিফুআম্মা বোরকা পরে একটি ল্যাম্প (হারিকেন) নিয়ে পুরা মন্‌জিল ঘুরে দেখতেন এমনকি গরু মহিষের ঘর ও পূর্ববাড়ি ভাণ্ডারখানা পর্যন্ত। কোন ভুল দেখলে সকালে ওবাইদুল আকবর ও সেক্রেটারী জামাল সিকদার সাহেবকে ডেকে ভুল সংশোধনের কথা বলতেন।

গুন্নিফুআম্মার কাছে শুনেছি তখনতো অত টাকা ছিল না যে বিল্ডিং করবেন। তবুও তাঁর পরিকল্পনামত নুরুল বখতয়োর শাহ্ ও জামাল আহমদ সিকদার সাহেব বর্তমান শান্তিকুন্‌জ ছয় তলা বিল্ডিং করার সাহস করেছিলেন এবং পুরা বিল্ডিংও করেছিলেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফের মত বড় প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন গুন্নিফুআম্মা নিজে। কারণ তখনও হাসান মিয়াকে (মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী) মন্‌জিলের কোন কাজকর্মের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়নি। (গুন্নি ফুআম্মা) তাঁরই আদেশ ও নির্দেশে হাজার আশেক ভক্তদের স্বেচ্ছাশ্রমে

রওজা শরিফের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ১৫ ফুট গভীর পুকুর খোদাই ও ভরাট করা হয়েছিল। দিনমজুর থেকে আরম্ভ করে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যক্ষ, মৌলানা, কেরানী, ম্যানেজার সবাই স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করে মাটি ভরাট করেছেন মাথায় নিয়েছেন। কোদালী দ্বারা মাটি কেটে সবাই রওজা শরিফ নির্মাণে শরিক হয়েছেন। আজ তাদের ছেলে-সন্তান-নাতি-নাতনি সবাই বলতে পারছে আমার বাবা দাদারা সবাই রওজা শরিফ নির্মাণের খেদমতে শরিক হতে পেরেছে। এটা কিন্তু একটা আশেক ভক্তদের গৌরবের বিষয় বলে মনে হচ্ছে। এইভাবেই ধাপে ধাপে আমার গুন্নিফুআম্মা মন্‌জিলের পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন।

আমার মায়ের কাছেও শুনেছি গুন্নিফুআম্মা আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ছেড়ে বাবাজানের খেদমত করেছেন। ১৯৭৩ সালে আমার বিয়ের পর থেকে নিজের চোখে দেখেছি, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতে বললে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। বাবাজান বলতেন, 'ও জেবুর মা এক কাপ চা দ'ন'। গুন্নিফুআম্মা চা নিয়ে এসেছেন। বাবাজান আবার কম্বল মুড়িয়ে জিকিরে মগ্ন হয়ে গিয়েছেন। গুন্নিফুআম্মা নিজে কোনদিন জিকির থেকে চা পান করার জন্য ডাকেননি। জিকির শেষ করে কম্বল উঠিয়ে দেখেন গুন্নিফুআম্মা চা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বাবাজান বললেন 'অ'নে এখনও চা লই থিয়াই রইয়োন যে না' আঁরে দ'ন যে আঁরে দন'। বাবাজান ঐ ঠাণ্ডা চা পান করেন। তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে বলেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ্।
একজন আদর্শ জননী হিসেবে গুন্নিফুআম্মাকে শুধু রত্নগর্ভা বললেও শেষ হবে না। তাঁর স্থান আরও অনেক উপরে, কারণ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উত্তরসূরী গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন মোজাদ্দেদে জামান আওলাদে গাউসুল আযম রাহ্‌বারে আলম শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র জন্মদাতা মা আমার গুন্নিফুআম্মা এমন মা যে কোনদিন কোন ছেলে মেয়েকে তুমি ছাড়া তুই বলেন নাই।

গুন্নিফুআম্মার ছেলেও এতবড় ইংরেজি শিক্ষিত ও মস্তবড় অলি এবং মোজাদ্দেদে জমান হয়েও মায়ের উপরে কোন কথা বলতেন না। গুন্নিফুআম্মার সন্তষ্টিই ছিল তাঁর সন্তুষ্টি।

ফুআম্মা পুত্রবধূকেও নিজের মেয়ের মত স্নেহ দিয়ে তাঁর কাজের সমস্ত ধারাবাহিকতা শিখিয়ে দিয়েছেন। গুন্নিফুআম্মার পর্দা করার পরে দেখছি, ফুআম্মার মতই সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করছেন। কোনদিকে কমতি নাই।
বাবাজানের কাছে মহিলারা যেতে পারতেন না। তাই সবাই আর্জি আবেদন গুন্নিফুআম্মার কাছেই দিতেন। তিনি সবাইকে হাসিমুখে সবকিছুর সমাধান দিতেন। উরস শরিফের সময় হাজার হাজার আশেক ভক্ত আর্জি আবেদন দিতেন তিনি কোনদিন কারো সাথে মুখ ভার করে কথা বলেননি। সবার সাথে একইরকম হাসিমুখে কথা বলেছেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া দিয়েছেন। আজ গাউসিয়া হক মন্‌জিলে এত বেশি মহিলা আশেক ভক্ত শুধু গুন্নিফুআম্মার মধুর ব্যবহারের জন্য। তিনি ধনী দরিদ্র্য সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। সবার সাথে সমভাবে সাক্ষাৎ দিতেন।
গুন্নিফুআম্মার দিল অনেক বড় ছিল। কাউকে কোন জিনিস কম করে দিতেন না। অনেক বেশি করে দিতেন। দেখেছি আমার সামনে যদি কেউ কোন কিছুর জন্য বলতেন। দেখতাম অনেক বেশি করেই দিতেন। কম জিনিস দিতেন না।

শাহানশাহ্ বাবাজানের অনেক আত্মীয়-স্বজন গুন্নিফুআম্মার কাছ থেকে মাসিক অনুদান নিয়ে যেতেন। পরে আমাকে বলেছেন তাঁরা সাবই গাউসুল আযমের আওলাদ। তাই তাঁদেরকে সবসময় দেখতে হবে। কোনদিন খালি হাতে ফেরানো যাবে না। আমাদের সামনে ফুআম্মা খাদেমাদেরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আশেক-ভক্তদের মেহমান হিসেবে দেখবে। তারা যদি কোন সময় টাকা পয়সার জন্য চিন্তায় পড়ে আমাকে জানাবে। আমি তাদের যতদূর সম্ভব চাহিদা পূরণ করে দেব।

২০২১ সালে রোজার ঈদের পরের দিন দরবারে ফুপু আম্মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা বসার ঘরে না বসে সরাসরি গুন্নিফুআম্মার শোবার ঘরেই চলে যাই। দেখি গুন্নিফুআম্মা সবাইকে ৫ হাজার টাকা করে ঈদি দিচ্ছেন। আমরা দুইজনকেও ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার দিলেন। আমরা নিতে না চাইলে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ হিসেবে বলে টাকাগুলো দিয়ে দিলেন।
কোভিডের সময় তাঁর শহরের বাসায় গুন্নিফুআম্মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কেউ এখানে আসে না, কাউকে দেখতে পাইনা। গুন্নিফুআম্মাকে বললাম এখন দেশের পরিস্থিতি ভাল নয়, তাই সরকার

একজনকে অন্যজনের বাসায় যেতে দেয় না। আজ আমরা অনুমতি নিয়েই আপনাকে দেখতে আসলাম। আসার সময় ছোট শিশুর মত শাড়ি ধরে রেখেছেন তাঁর সাথে বাসায় থাকার জন্য, কিন্তু থাকি কি করে? নিষ্ঠুরের মত তাঁর সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে চলে এসেছি। দেশের পরিস্থিতির কথা ভেবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে তাঁকে লোকের কাছ থেকে দূরে রাখতে হয়। তাই চলে এসেছি।
মা'জানের জন্য অনেক আশেক ভক্ত দামী-দামী রঙ্গীন শাড়ি নিয়ে আসতেন। গুন্নিফুআম্মা কিন্তু রঙ্গীন শাড়ি পড়েন না। তাই অতীব দামী হলেও শাড়িগুলো আমাকেই ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দিতেন। দরবারের কেউ সেন্ট ব্যবহার করেন না। তাই ডজন ডজন সেন্ট জমা হয়ে থাকতো। আমি গেলে গুন্নিফুআম্মা আমাকে ৫/৬টি একসাথে দিয়ে দিতেন। বলতেন তোমার ছেলেমেয়েরা ব্যবহার করতে পারবে নিয়ে যাও। গুন্নিফুআম্মার দানশীলতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। বেশিরভাগ দান কেউ না জানে মতো গোপনে ডেকে টাকা, কাপড়, জিনিসপত্র চাহিদা মত দিতেন।

দরবারের আশেক ভক্তদেরকে তিনি মেহমান হিসাবে সেবাযত্ন দিতে খাদেমদেরকে নির্দেশ দিতেন। গুন্নিফুআম্মা বলতেন, 'তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিয়ে এনেছি, তারা আমাদের মেহমান। সেবাযত্নে কোন ত্রুটি যেন না হয়। মেহমানদারীতে কোন ত্রুটি থাকলে ভাণ্ডারীর কাছে দায়ী থাকবো।

শীতের দিনে উরস শরিফের রাতে সবাই কম্বল-বালিশ পেয়েছে কিনা তদারক করার জন্য লোক পাঠাতেন। কেউ যেন শীতে কষ্ট না পায় তা বলে দিতেন। আবার যাওয়ার বিদায়ী সাক্ষাতে জিজ্ঞেস করতেন কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা? আমার গুন্নিফুআম্মার এই রকম সেবা-যত্নের কথা কোন আশেক ভক্ত ভুলতে পারবে না।
গুন্নিফুআম্মার দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরে জানাযার সময় লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল দেখে মনে হয়েছে শত বৎসরের মধ্যে কোন মহিলার জানাযায় এত মানুষের সমাগম হবে না। জানাযার পর শাহী ময়দান থেকে যেন মানুষের সমুদ্রের উপর একটি ফুলের বাগান ভাসতে ভাসতে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে প্রবেশ করে শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফের দরজা খুলে বাবাজানের পূর্ব পাশে ঐ ছোট বাগানটিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়লেন।

আর কোনদিন গুন্নিফুআম্মার সাথে দেখা হবে না। ঢাকা নেয়ার পূর্বে গিয়েছিলাম আমরা দুজন এক সাথে। আমার ফুপাতো বোন ইসমত গুন্নিফুআম্মার সেবায় ছিলেন। গুন্নিফুআম্মা আমাদের সাথে অনেক কথা বলেছিলেন। আর ইসমতকে বলেছিলেন কামাল ও আরজুমনকে ভাল করে ভাত খাইয়ে দাও। মাছ, মাংস দুইটাই দেবে। ভাত খাওয়ার পর আরজুমন আমার সাথে ঘুমাবে। কামাল বাইরে ঘুমাবে। আরজুমন তুমি কি বল? আমি বলেছি ফুআম্মা ঠিক আছে। কিছুক্ষণ পর আবার বলেছেন, অ ইছমত আরজুমন আর কামালকে ভাত দাও। ভাত খাইয়ে আরজুমন আমার কাছে ঘুমাবে। কামাল ঘুমাবে কিছুক্ষণ পর। ফুআম্মার তন্দ্রা আসলে ইছমতকে বলে আমরা শেষবারের মত দেখে হাসপাতাল থেকে চলে আসলাম।

গুন্নিফুআম্মার সাথে এইদিনই শেষবারের মত দেখা হয়েছিল। আর কোনদিন বলবে না আরজুমন আমার সাথে ঘুমাবে। যদি জানতাম যে, গুন্নিফুআম্মা এক সপ্তাহ পরে আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যাবেন, তাহলে আমি গুন্নিফুআম্মার সাথে ঐ রাতে হাসপাতালে থেকে যেতাম। এখন তো আপনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন। চিরনিদ্রায় শাহানশাহ্ বাবাজনের পাশে ঘুমিয়ে আছেন। এখন তো আর আপনাকে সরাসরি দেখবো না। দেখবো শুধু রওজা শরিফের বাইরে থেকে আপনার পুষ্পাবৃত সমাধি। গুন্নিফুআম্মা আপনার আবদারটা রাখতে পারিনি বলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না।

আরজুমন আক্তার চৌধুরানী
উম্মুল আশেকীনের বড় ভাইয়ের বড় মেয়ে
পিতাঃ আবদুল মালেক চৌধুরী
প্রযত্নে: বদরুজ্জামান চৌধুরীর বাড়ি, গ্রাম: নিচিন্তা দাঁতমারা উপজেলা:
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

নিজ হাতে মেহমানের বিছানা করে দিতেন

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম আমার শ্রদ্ধেয় ফুপু শাশুড়ি। আম্মাজান এর সঙ্গে সেই সুত্র ধরে আত্মীয়তার বন্ধনে সম্পৃক্ত। ১৯৭২ সালে আমার বিবাহের প্রথম দিন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে স্বচক্ষে দেখেছি। তিনি একটি বিছানায় শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন এবং সেদিন নিজ হাতে আমাকে দুই গ্রাস ভাত খাইয়ে দেন। আমার বিবাহের ঢোল-বাজনা বাবাজান তিন দিন যাবত রেখে দেন। প্রথম দেখাতেই আমি বাবাজানের প্রেমে মগ্ন হয়ে যাই। তিনিও আমাকে মেয়ে বলে সম্বোধন করতেন। দিনের পর দিন বাবাজান ও আম্মাজানের ভালোবাসায় আমি মাতোয়ারা হয়ে উঠি। তাঁরা হলেন স্বর্গীয় পিতা মাতা। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁদের দুনিয়াতে পেয়ে গেছি। বাবাজানের রূহের টানে আমি পায়ে হেঁটে দরবারে গিয়েছি। আমাকে দুজনেই খুব ভালবাসতেন।

আমার জীবনকে সুসজ্জিত করতে আম্মাজানের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর দিক নির্দেশনা অনুসারে আমি প্রতিটি ধাপে অগ্রসর হতাম। সুখে দুঃখে সবসময় আম্মাজানের কাছে ছুটে যেতাম। আম্মাজান আমাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁর অশেষ সহযোগিতায় আমি নিজের অবস্থা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

উম্মুল আশেকীন আমাদের প্রাণপ্রিয় আম্মাজান আমার দেখা শ্রেষ্ঠ দানশীল মানব সেবিকা ছিলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। কারো কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। অনেক আশেকান ভক্তগণ ও আত্মীয়-স্বজন কাছের-দূরের পরিচিত অনেক জনকেই আম্মাজান সাহায্য করেছেন। আম্মাজানের দানশীলতার কারণে অনেকেই বিভিন্ন মসিবত হতে পরিত্রাণ পেয়েছে। তিনি গোপনে দান করতেন। এতটাই সক্রিয়ভাবে দান করতেন নিজের সন্তানরাও বুঝতে পারতেন না। আম্মাজান আমাকে সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁর বিশেষ কয়েকটি কালাম ছিল:

১. যদি কখনো তোমাকে কেউ অবজ্ঞা করে, এমনকি লাথি মেরে চলে যায়। মনে করবে সে তোমাকে না দেখেই মেরেছে। এটি মনে পোষণ করে বিষয়টিকে তুচ্ছ করে দেখবে। কখনো প্রতিবাদ করবেনা।

২. এই যে আমরা দুঃখ-কষ্টে থাকি, এসব মূলতঃ আমাদের চলার ভুলের কারণেই আমরা বিপদে পড়ি।

৩. কখনও অন্যকে খাবার না দিয়ে বা ভাগে কম দিয়ে নিজের সন্তানদের খাওয়ানোর চেষ্টা করবে না।

আমার জীবনে যে কোন বিষয়ে আম্মাজানের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ নিতে যেতাম। তিনি ছিলেন আমার দিক নির্দেশক, পরামর্শদাতা, আলোর পথের বার্তাবাহক। নিজের মাকে ছোটবেলায় হারিয়েছি বিবাহের পর আম্মাজানের মায়া-মমতায় নিজেকে অগ্রসর করতে সক্ষম হয়েছি। শাহানশাহ্ বাবাজানের পর্দার আড়ালে লুকায়িত হবার তের দিন আগে বাবাজানের টানে আত্মহারা হয়ে পায়ে হেঁটে দরবারে ছুটে যাই। সেইদিন হাজারো আশেকান ভক্তগণের মাঝে আমার দিকে দৃষ্টি করে বললেন, আপনি চলে যান। দাঁড়িয়ে থাকতে হবেনা। আপনার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে। শেষ দেখাতেও মহান উক্তির দ্বারা সৌভাগ্যে উপনীত করলেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি অপলক দৃষ্টিতে বাবাজানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ জজ্‌বাহালে অস্বাভাবিক হয়ে গেলে ভয়ে চলে আসি। বাবাজান প্রায় আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ভয়ে কেউ পাশে যেত না। আম্মাজানও বাবাজানকে অনেক ভয় পেতেন। আদবের ক্রুটি হবে ভেবে সবসময় দূরে দূরে থাকতেন। বাবাজানের দয়া মেহেরবানী শান মান অশেষ ও অতুলনীয়। বাবাজানের মেহেরবানীতে অনেক বিপদে সমস্যার সমাধান পেয়েছি। যখনই দরবারে যেতাম বাবাজান বলতেন, ভিতরে যান। জেবুর মায়ের সাথে দেখা করেন। খাওয়া দাওয়া করে যাবেন।

আম্মাজান আমাকে নিজের হাতে আম দুধভাত খাইয়ে দিয়েছেন। তিনি যথেষ্ট সরল ও মানবিক ছিলেন। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করার মত নয়। আমার সাথে দীর্ঘসময় নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করতেন। মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর বিবাহের বায়োডাটা আসলে আমার সাথে বিষয়াদি আলোচনা করতেন। মওলা মাইজভাণ্ডারীর বিবাহের অনেক বায়োডাটার মধ্যে ছোট আম্মাজানকে তিনি পছন্দ করে পুত্রবধূরূপে কবুল করে নিয়েছেন। নিশ্চয় তা আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিনের হুকুম ও শাহানশাহ্ বাবাজানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে আম্মাজানের অবর্তমানে সিংহাসনের নেত্রীর উপযুক্ত বিবেচনায় কবুল

করেছেন। আম্মাজানের পরবর্তীতে গাউসিয়া হক মন্‌জিলের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সম্পন্ন মহীয়সী হিসেবে ছোট আম্মার মাঝে উপযুক্ততা বিদ্যমান।

তখনকার সময়ে স্বচ্ছলতা ছিল না। এতটাই দুর্বিসহ অবস্থা ছিল যে, ব্যবহারের সামগ্রীও যথেষ্ট পরিমান ছিল না। মেহমানদের জন্য তিনটি চায়ের কাপ, তিনটি বাটি খুবই স্বল্প পরিমান জিনিসপত্র ছিল। আশেকান ভক্তগণ বাবাজানের সাক্ষাতে আসলে হাদিয়া স্বরূপ অনেক টাকা দিয়ে যেত। সাক্ষাতের পর আমরা কয়েকজন মিলে সব টাকা গুছিয়ে নিতাম। আম্মাজান কখনো ফিরেও দেখতেন না। এরূপ অস্বচ্ছলতার মধ্যেও আম্মাজানের কোন চাহিদা ছিল না।

শাহানশাহ্ বাবাজান হাজার হাজার টাকা পুকুরে ফেলে দিতেন। আম্মাজানের কাছে যা জমা থাকত আম্মাজান সব টাকা দরবারের হক কমিটিতে দিয়ে দিতেন। কোনরকম দ্বিমত পোষণ করেননি। পুরোনো বাড়ি থেকে বাবাজানদের জন্য যতটুকু খাবার পাঠানো হত আম্মাজানকে দেখেছি সর্বদা আলহামদুলিল্লাহ্ বলে কবুল করে নিতেন। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাবাজান ও পুত্রববধূ হিসেবে আম্মাজানকে খুব ভালবাসতেন। আম্মাজান সেই খাবার থেকেও নিজে না খেয়ে আগত আশেক ভক্তগণদের মেহমানদারি করতেন। বাবাজান আম্মাজানকে বলেছিলেন; জেবুর মা মেহমানদের সবসময় আপ্যায়ন করবেন। বাবাজানের আদেশ আম্মাজান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পালন করে গেছেন। নিজেই মেহমানদের তদারকি করতেন।

অনেকবার দেখেছি মেহমানদের জন্য নিজ হাতে বিছানার ব্যবস্থা করতেন। নিজের হাতে রান্না করে আশেকানদের খাওয়াতেন। অফিসে কর্মরত খেদমতকারীদের জন্য খাবার পাঠাতেন। কাউকে না খেয়ে বাড়ি ফিরতে দিতেন না। কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতে দেখিনি। খুবই ধৈর্য্যশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। সন্তানদের নিজেই পড়াশুনা করাতেন। খাবারের রেসিপি বই দেখে বিভিন্ন ধরনের রান্না করতেন। অবসর সময়ে আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গে মহিলাদের রান্না শেখাতেন।

আম্মাজানের কাছ থেকে আমি অনেক ধরনের নাস্তা, আচার বানানো আরো বিভিন্ন খাবারের রেসিপি শিখেছি। তিনি গৃহের কাজে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। আম্মাজান আমার দেখা মেধাবী, গুণসম্মত, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নজির। বাবাজানের হুকুম তিনি যথাযথভাবে পালন করতেন। বাবাজানকে অনেক সম্মান করতেন।

বাবাজানও আম্মাজানকে অনেক সম্মান করতেন। কখনো তুমি বলতেন না। সর্বদা আপনি বলে সম্বোধন করতেন।

একদিন বাবাজান এক ব্যক্তিকে আলমারি থেকে টাকা বের করে দিয়ে দিচ্ছিলেন। আম্মাজান কাকে দিচ্ছেন তা দেখার জন্য জানালা থেকে উঁকি দিলেন। আসার সময় সমতল স্থানে হোঁচট খেয়ে পায়ে ব্যথা পান। সেইদিন থেকে আম্মাজান আরো অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন, যাতে কোনরূপ বেয়াদবি না হয়। বাবাজানের আদেশ পালনে সজাগ থাকতেন।

আম্মাজান হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক জানায় পেটে পাথর হয়েছে। বাবাজান বলেন একটি মাত্র পাথর আছে কিছু হবে না। বাবাজানের ওফাতের অনেক বছর পর অপারেশন করে একটিমাত্র পাথর পাওয়া গেছে। আল্লাহ্‌র অলিগণের পাক জবানের কোন ক্রুটি নেই। আল্লাহ্‌র কুদরতের খনি শাহানশাহ্ বাবাজান আমাদের কাছ থেকে পর্দা করলেও তাঁর পাক কালাম আম্মাজানের কাছ থেকেই পেতাম। আম্মাজান যা কিছু বলতেন সব বাবাজানের নির্দেশনায় বলতেন।

বাতেনী বেলায়তের মাধ্যমে আম্মাজান বাবাজানের দেওয়া আলোকবার্তা মানবের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁর কোন জবান বৃথা যায় নি। প্রত্যেক কালামে সত্যতা নিরূপণ ছিল। ভবিষ্যতে কালামের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হত। আম্মাজানের জ্ঞানশক্তি, চিন্তাধারা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজকের হক মন্‌জিল মানবতার প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নুর আক্তার চৌধুরী (হিরু)
স্বামী– শফিউল আলম চৌধুরী
(উম্মুল আশেকীন-এর বড় বোনের বড় পুত্রবধূ)
নারায়ন হাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

আমার খালাম্মা : বুদ্ধিমতি মহিলা

আম্মাজান সম্পর্কে আমার খালা হন। তিনি ছিলেন একজন মহিয়ষী নারী। বহু গুণসম্মত, কর্মঠ, বুদ্ধিমতি, আদর্শবান, ন্যায়পরায়ন ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আমি মাইজভাণ্ডার যাওয়া-আসা করি। সে সময়ে বাবাজান প্রায় জজ্‌বা হালে থাকতেন। আম্মাজান এর নেতৃত্বে হক মন্‌জিল পরিচালিত হত। আম্মাজান সুশৃঙ্খলভাবে ধৈর্য্য সহকারে পুরো হক মন্‌জিলের সকল কার্য সম্পাদন করতেন। সিকদার মামা ও বখতেয়ার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে মন্‌জিলের প্রত্যেক কর্মকান্ড সম্পাদনার নির্দেশ দিতেন। কমিটি গঠন থেকে শুরু করে রান্নার কাজ সবকিছুই আম্মাজানের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। তিনি অনেক সংগ্রামী ছিলেন। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত ও শাহানশাহ্ জিয়া বাবাজানের মেহেরবানীতে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আম্মাজান আজকের এই হক মন্‌জিল গড়ে তুলেছেন। আম্মাজান আশেকান-ভক্তগণকে অনেক ভালবাসতেন। তাঁর কাছে ধনী, গরিব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। আশেকানের ভালোমন্দ, সুযোগ-সুবিধা সবসময়ই খেয়াল রাখতেন। মহিলাদের পারিবারিক কাজকর্ম, আত্মীয়তা রক্ষা, সন্তান পালন, স্বামীর আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। আম্মাজান অনেক দানশীল ছিলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করে কেউ হতাশ হতো না। যতটুকুই সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করতেন। আম্মাজান এর তদারকিতে অনেক অবিবাহিত মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। আশেকানের মানতের টাকা পয়সা দরিদ্র, অসহায়, এতিমদের মাঝে বিতরন করতেন। মানতের টাকা তাঁর কাছে আমানত এর ন্যায় ছিল। উচ্চ মর্যাদাশীল, সম্মাননার অধিকারী হয়েও খুবই সাধারন জীবনযাপন করতেন তিনি। ছেলেমেয়েদের সর্বদা আদর্শ শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজনের অধিক কোনকিছুই ব্যবহার করতে দিতেন না। অপব্যবহার বিলাসিতা তুল্য, যা আম্মাজান এর কাছে খুবই অপছন্দের ছিল। মওলা হুজুর কলেজে পড়ার সময়েও লোকাল বাসে ট্রেনে যাতায়াত করেছেন। শতশত আশেকান ভক্তগণ যার দরবারে দুঃখকষ্ট নিরসনের লক্ষ্যে হাজির হয়, বাবাজান এর খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে আত্মার শান্তি লাভ করে, এমন উচ্চ মর্যাদাশীল আল্লাহ্‌র অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ)-এর একমাত্র শাহ্‌জাদা হয়েও খুবই সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত

ছিলেন। একজন আদর্শ নারী হিসেবে সন্তানদের সুশিক্ষায় উন্মেষিত করেছেন। ছোটবেলায় দেখেছি বাবাজান প্রায়ই আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। জজ্‌বায় থাকা অবস্থায় ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিতেন। তখনও আম্মাজান ছেলেমেয়েদের আগলে ধরে বাইরে এককোণায় বসে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। যতক্ষণ বাবাজান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন না, ততক্ষণই কুয়াশায় বসে থাকতেন। এমতাবস্থায়ও ছেলেমেয়েদের দীনিশিক্ষা দিতেন। মাইজভাণ্ডার এর শান-মান বেলায়ত আল্লাহ্‌র অলিগণের প্রতি ভক্তি, সম্মান ইত্যাদি শিক্ষার আলোকে বাবাজান এর প্রতি প্রেম ভালবাসা জাগ্রত করতেন। আম্মাজান এর জীবনাদর্শ আমাদের কাছে অনুসরণীয়। তিনি অনেক পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশীল, দায়ীত্ববান, দূরদর্শি, মহৎ ও হৃদয়বান ছিলেন। আত্মীয়তা রক্ষার্থে তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত। সবসময়ই যোগাযোগের মাধ্যমে ভালমন্দ খবরাখবর নিতেন। মেহমান আপ্যায়নের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করতে ভালবাসতেন। শেষ বিদায়ের সময় আম্মাজান হসপিটালে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর পর জ্ঞান ফিরছিল, এমতাবস্থায়ও বলছিলেন: "তোমরা খাবার খেয়েছ? সবাই খাবার খেয়েছে? না খেয়ে বসে থেকোনা"। কতটা মমতাময়ী, হৃদয়বান, কোমল মনের মানুষ হলে এমন অবস্থায়ও ভালবাসা প্রকাশ পায়, তা আমার দেখা শ্রেষ্ঠচিত্র। আম্মাজান আমাদের জন্য অনেক বড় নিয়ামত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব অবলম্বনের মধ্য দিয়ে সবাই সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারবে। আম্মাজান এর জীবনাচরণ ছিল ইসলামের মহীয়সী নারীর সাদৃশ্যস্বরূপ। সকল দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে সর্বদা অন্যের সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত ছিলেন সারাজীবন। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বাভাবিক জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। বিন্দুমাত্র ক্রোধ অহংকার ছিল না তাঁর। ভালবাসা মায়া মমতায় ভরা মহীয়সী এক নারী ছিলেন আম্মাজান।

ইসমাত জাহান
উম্মুল আশেকীন-এর বড়বোন
ফেরদৌস আরা বেগমের চতুর্থ কন্যা

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ

আম্মাজান সম্পর্কে আমার খালাম্মা হন। যেহেতু খালাম্মা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিনী। সেহেতু তিনি লক্ষ লক্ষ মহিলা আশেক-ভক্ত-যায়েরিনদের কলিজা ছিলেন। আমার খালাম্মা অনেক ভাগ্যবান অনেক ত্যাগী ছিলেন। তিনি অসাধারণ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আমি তাঁর মতো মহিলা আর দেখতে পাই না। তিনি অসম্ভব ধৈর্য্যশীল ছিলেন। উনার কাছ থেকে মহিলা ভক্তদের অনেক কিছু শিখার ছিল। মহিলা জগতে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। নারী সুফি হিসেবে তাঁর সম্পর্কে সবার জানা উচিত। বিশেষ করে জগতের নারী সমাজের তাঁর সম্পর্কে জানা উচিত। এজন্য নারী সমাজকে দরবার শরিফে যাওয়া উচিত। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, শিখেছেন তাঁরা খুবই ভাগ্যবান। সমস্ত মহিলা আশেক-ভক্তদের যাবতীয় অভিযোগ-অনুযোগ, সমস্যা, সুখ-দুঃখ তিনি খুবই অনুভব করতেন। তাদের দুঃখে দুঃখি হতেন এবং বিচক্ষণতার সাথে সমাধান করার চেষ্টা করতেন। এজন্য মহিলা আশেক-ভক্তরা আম্মাজানের জন্য পাগল ছিলেন। তিনি অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পরামর্শ, চিন্তা, উপদেশ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।

শাহানশাহ্ বাবাজানের ওফাতের সময় মওলা হুজুর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছেন। সেই অবস্থায় থেকে আম্মাজানের পরিশ্রম গাউসিয়া হক মন্‌জিলের জন্য। আমার আম্মা-খালাম্মার মধ্যে আম্মাজানের চেহারা, চাল-চলন, ধৈর্য্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, কথাবার্তার ধরণ সবকিছু আলাদা। এগুলো আমি খেয়াল করতাম। আমার মনে হয় তাঁকে আল্লাহ্ আলাদা গুণাবলির অধিকারী করে বানিয়েছেন। তিনি ছোট ছিলেন বিধায় স্নেহের ছিলেন। অমায়িক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে আত্মীয় স্বজনরা আলাদা চোখে দেখতেন। তাঁর দর্শন ভালো ছিলো। এগুলো আমার মা'র কাছ থেকে শুনেছি। এই সমাজে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কাউকে দেখি না। আত্মীয়তার বন্ধনকে তিনি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলেন। কাউকে ছিটকে পড়তে দেননি তিনি। তাঁর আন্তরিকতা, বুদ্ধিমত্তা, মায়া-মমতা, পরামর্শের জন্য আমরা সব আত্মীয়রা এক ছিলাম। এক কথায় তাঁর সাথে তুলনার কাউকে দেখি না। আমাদেরকে এত আদর করতেন, এত স্নেহ করতেন তা অসাধারণ।

আম্মাজানের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, পরামর্শ, চিন্তা, সহযোগিতার ফসল গাউসিয়া হক মন্‌জিল। ১৯৮৬, ৮৭ কিংবা ৮৮ সালের মন্‌জিলের অবস্থান আর আজকের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার। এক কথায় বলব, খোদার

খোদায়ীত্বের নজর না থাকলে এরূপ হয় না। এখানে আল্লাহ্র নেয়ামত আছে। দরবার শরিফ বুঝার আগে আমি আমার খালার বাড়ি হিসেবে চিনতাম, যখন বুঝ হতে শুরু হলো তখন থেকে দরবার শরিফ অন্যভাবে চিনতে শুরু করলাম। তখন আর আত্মীয় পরিচয় থাকে না। তাঁর মতো এতো অতিথি পরায়ণ দেখিনি। আমাকে গিয়াস বলে ডাকতেন। তিনি শুধু লক্ষ-কোটি আশেক-ভক্তের কলিজা-ই ছিলেন তাই না তিনি আমাদের আত্মীয়দেরও কলিজা ছিলেন। তিনি যে কি রহমত ছিলেন তা তাঁর ওফাতের পরে বুঝতে পারছি। তিনি ছিলেন খোদার পক্ষ থেকে রহমত। শাহানশাহ্র সহধর্মিনী হিসেবে আল্লাহ্ তাঁকে এভাবে প্রেরণ করেছেন। মা হিসেবে তিনি ছিলেন চমৎকার মা। ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। মওলা হুজুর ছিলেন তাঁর প্রাণের মতো। মা-ছেলের সম্পর্ক যারা দেখেছেন তারাই বলতে পারবেন। তাঁদের মধুর সম্পর্ককে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করার মতো না। এজন্য একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে সবার যাওয়া উচিত। না গেলে বুঝা যাবে না।

তাঁর ওফাতের সময় আমি ঢাকা ছিলাম। আমি যখন শুনেছি তিনি বেশি অসুস্থ তখন আমি অফিস থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাকা যাব। আমি ঢাকায় পৌঁছলাম ১০টায়। তিনি সম্ভবত ১০:১০ মিনিট কিংবা ১০টায় পর্দা নিলেন। তখনই আমি পৌঁছি। ভিতরে যাওয়ার সুযোগ না থাকাতে নিচে রিসেপশনে অপেক্ষা করছিলাম। শুনেছি সেদিন সকাল বেলা মওলা হুজুর ছিলেন এবং তিনি অনেক কান্না করেছেন। উপস্থিত অনেকে দেখেছেন। তাঁর এই কান্না যারা দেখেছেন তারা ছাড়া অনুভব করা সম্ভব না। শাহানশাহ্ বাবাজানের ওফাতের পর সন্ধ্যার সময় তাঁর কান্না দেখেছিলাম। এরূপ কান্না কাউকে করতে দেখিনি। নাতিদের সাথে বিশেষ করে শাহ্জাদার সাথে অতুলনীয় সম্পর্ক ছিল। তাঁর কথাবার্তা ছিল অসম্ভব সুন্দর। তাঁর আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। সব বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন, বুঝ-শক্তি অসম্ভব ছিল। কাকে কী বলতে হবে, তিনি দেখার সাথে সাথে আঁচ করে ফেলতেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়া এসব সম্ভব না।

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী
পিতা: বদিউল আলম চৌধুরী
এম এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জমিদার পাড়া, চৌধুরী বাড়ি, হাপানিয়া
নারাছুহাট, ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

হ্যাজাক লাইটের আলোতে দেখা একটি বিয়ে

প্রায় ৪০টি হ্যাজাক লাইটের আলোতে আকাশ আলোকিত করে আতশবাজির চোখ ধাঁধানো আলোয় মুখরিত করে "কালের শাহানশাহ্ বিশ্বঅলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী" শাহী চৌদুলে করে যখন বরযাত্রী সহকারে দাঁতমারার নিভৃত পল্লীতে এসে পৌঁছলেন তখন মনে হয়েছিল আল্লাহ্র এক নির্মল করুণাধারা চাঁদের আলোকেও ম্লান করে ধুলির ধরায় নেমে এসেছে। এই-ই প্রথম দেখলাম একজন বিশ্বঅলি তথা আল্লাহ্র এক নির্মল করুণার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

সেদিন হতেই যেন মনের অজান্তে দরবারের প্রতি মন চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। যা পরবর্তী জীবনে আমার মত এক গুনাহ্গার ব্যক্তি মহান দরবারের সান্নিধ্যে থাকার, দরবারের সাহচর্য পাওয়ার, সর্বোপরি এমন মহান অলি-আল্লাহ্র নৈকট্যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তা শুধুমাত্র আমার শ্রদ্ধেয়া বুবু সাহেবানীর আন্তরিক স্নেহ-মায়া-মমতা এবং তাঁর এক বিশাল উদারতার কারণে। তিনি আমাকে অন্তঃস্থল হতে স্নেহ করতেন। তাঁকে প্রাণভরে বুবু সম্বোধন করতাম। বিশেষ করে 'অ-বু' বলে ডাকতাম, যে ডাকে তিনি বড়ই তৃপ্ত হতেন মনভরে খুশি হতেন। আত্মীয়দেরকে বলতেন, "মিয়াই আমাকে শুধু অ-বু বলে থাকে"। তিনি কিন্তু ভক্তকুল তথা সকলের মায়ের আসনে সমাসীন। সুতরাং আমার এ ব্যতিক্রমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন বা বেয়াদবী নেবেন না, এটাই আমার বিনীত অনুরোধ।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, আল্লাহ্র এক নিশেষ করুণা, এক নিগুঢ় ইচ্ছাতেই যেন বুবু সাহেবানীর জন্ম। আল্লাহ্ই যেন খাস করেই তাঁকে বিশ্বঅলির সহধর্মিনী রূপে নির্বাচিত করেছিলেন। জন্মসূত্রে একজন আউলিয়া সমতূল্য দরবারের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং দরবারের আশীর্বাদপুষ্ট মহান ব্যক্তিত্ব জনাব বদরুজ্জামান সিকদার দাঁতমারার বিশিষ্ট জমিদার এবং মাতা আজিজা খাতুন। এক মহান ব্যক্তিত্ব এলাকার রেনেসাঁ নামে অভিহিত জনাব ফজলুর রহমান (প্রকাশ ফজুমিয়া) দৌলতপুর মিয়া বাড়ির দরবার ভক্ত যিনি বুবু সাহেবানীর শ্রদ্ধেয় নানাজান। সুতরাং বাবা এবং নানার আধ্যাত্মিক মিলনকেন্দ্র পবিত্র দরবার শরিফ। এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের উপর হয়তো আল্লাহ্র এক বিশেষ ইঙ্গিত হয়েছিল এর শাদী মোবারকের।

এদিকে বিশ্বকুল সুফিসম্রাট গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা সাহেব, বিশ্বঅলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী সাহেবের বড় দাদা এবং হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী তাঁর নানা, এই সকল অধ্যাত্ম পুরুষদের সংগমস্থল, মিলনকেন্দ্র দরবারের শাহানশাহ্ বিশ্বঅলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী সর্বজন স্বীকৃত এমন বিশ্বঅলির সহধর্মিনী ভাগ্যবান ভক্তকুল মাতা জনাব মুনাওয়ারা বেগম প্রকাশ 'মানু' আমার 'মানু বু'।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অলৌকিক এক ইঙ্গিতে সুদূর দাঁতমারা নামক এক নিভৃত পল্লীতে এক আউলিয়া সমতুল্য মহান ব্যক্তিত্ব জনাব বদরুজ্জামান সিকদার ও মাতা আজিজা খাতুনের ঘরে এই মহীয়সী মহিলার শুভ জন্ম। যার নাম রাখা হয় মুনাওয়ারা বেগম যা শান্তির প্রতীক তথা "দরবারে মুনাওয়ারা" করার অভিনন্দন। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী'র সহধর্মিনী হিসাবে তাঁকে মনোনীত করে এক নিগুঢ় রহস্য আল্লাহ্র দরবারে তথা আউলিয়াগণের রহস্যের ইঙ্গিত এবং অভিপ্রায়। তা না হলে কোথায় পবিত্র নগরী দরবার শরিফ মাইজভাণ্ডার, আর কোথায় এক অজপাড়া গাঁ দাঁতমারা, যেখানে সে যুগে একমাত্র পাল্কি বা গরুগাড়ি ছাড়া আর কোন বাহনই ছিলনা। অথচ সেসময় যদি দরবারের নজর বাংলাদেশের অট্টালিকায় ভরপুর ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে বা ধনসম্পদে টইটুম্বুর এমন পরিবারের প্রতি এ সম্পর্কের জন্য পয়গাম যেতো তবে তা "দরবারে মুনাওয়ারা" হতো কিনা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। জনাব মফজলুর রহমান মিয়া এবং মুরব্বীগণের মুখে শুনেছিলাম এ শুভ বিবাহের পয়গাম যখন আমার শ্রদ্ধেয় ফুপা বদরুজ্জামান সিকদার সাহেবের সমীপে প্রস্তাব রূপে পেশ করা হয় তখন আমার ফুপা নাকি আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ রেখেছিলেন, "হে আল্লাহ্ আমি এ গুনাহ্গার কি করে আমার পীর সাহেবকে বেয়াই রূপে বরণ করে নেবো, এমন বেয়াদবী হওয়ার আগে তুমি মেহেরবান আল্লাহ্ আমাকে এ দুনিয়া হতে নিয়ে নাও"।

সত্যি যেন আল্লাহ্ এ জীবন্ত আউলিয়ার আর্জি সাথে সাথেই কবুল করে নিয়েছিলেন, তা হবেই না বা কেন, শুনেছিলাম আমার ফুপার মৃত্যুর পর বাজারে বাজারে তাঁর সম্পর্কে লিখিত শোকাবহ কবিতা শুনে শুনে মানুষ মর্মবেদনায় হতবিহ্বল হয়ে যেতো। ঠিক পবিত্র বিয়ের আগেই আমার শ্রদ্ধেয়

ফুপার ইন্তেকাল হয়। আমার ফুপুই কান্না বিজড়িত কণ্ঠে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর হাতে শ্রদ্ধেয় বুবুজানকে তুলে দেন যা আমি দেখেছিলাম।

আল্লাহ্‌র অসীম করুণা আমি বয়সে খুবই ছোট, সম্ভবত ক্লাস টু বা থ্রিতে পড়ি, বাবার সাথে আনোয়ারা বেগম প্রকাশ বেগম বুবুদের বাড়ি হতে গরুগাড়ি এবং হেটে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে দাঁতমারা পৌঁছেছিলাম। এ প্রথম ফুপুর বাড়ি তথা জমিদার বাড়ি দেখা এবং এটাই প্রথম আল্লাহ্‌র এক জীবন্ত অলির শুভ বিবাহের অনুষ্ঠান দেখার নজীর হয়েছিল।

স্মৃতির মণিকোঠায় এ শুভ অনুষ্ঠানের সমস্ত স্মৃতি আজো এক জীবন্ত বাস্তবতা নিয়ে প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনাগুলো মনে গেঁথে আছে। সেই শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক হুজুর সাহেবের পবিত্র মুখখানি যেন চাঁদের এক প্রশান্তিময় নির্মল বাস্তবতা, সেই ছিমছাম গঠন, গভীর নিরবতা পারিপার্শিক সব মিলিয়ে যেন বেহেশ্‌তি এক আমেজের আভাস যা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যের বাইরে।
ছোটদের শিশুসুলভ আচরন বারবার দুলহাকে একটু দেখা, একটু কাছে যাওয়া অথচ এত কোলাহল এত আয়োজন, সে যুগের এমন এক জমকালো অনুষ্ঠান সারা বাড়ি সারা গ্রাম সবখানে খুশির বন্যা অথচ এ মহান মানুষটি যেন কোন এক গভীর ধ্যানে মগ্ন, নিরব নিস্তব্ধ, যেই বসাতে পশ্চিমমুখি হয়ে নিচের দিকে চেয়ে বসেছেন সেই বসাতেই সকাল, কারো সাথে কোন কথা, কারো দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখা কিছুই দেখলাম না এবং এই ব্যাপার যা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যের বাইরে।
সে দিন থেকেই এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে থাকার এক প্রচন্ড আগ্রহ বারবার আকর্ষণ করেছে, আমি বার বার দরবারে ছুটে যেতাম এ মহান ব্যক্তিত্বকে অপলক দেখে থাকতাম, কি পেতাম আমিও জানিনা।

অবস্থার পরিবর্তনে শাহানশাহ্ হুজুর কেবলাকে অনেক হালে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। স্বাভাবিক মানুষের হালে, শানে জালালিয়তে, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন কল্পজগতে, যেগুলোর বিবরন দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।

প্রসঙ্গক্রমে এতটুকু বলা যায়, এমন এক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের জালালিয়ত হালতের সাহচর্য থাকা এমন এক মহতী সহধর্মিনীর জীবন আলেখ্য সমসাময়িক

কিছু ঘটনা, কিছু অবস্থা, কিছু কথা যা ব্যক্ত করা আমার অসাধ্য। বিশেষ করে বাবাজান হাসান মিয়া প্রকাশ মওলা হুজুর-এর বিনা অনুমতিতে তা ব্যক্ত করা যাবেনা। তবে ভক্তকুল এতটুকু বুঝে নিক কতটুকু বিশলতা থাকলে কতটুকু শক্তি, সাহস, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, শোকর, সবর ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ না হলে অসাধারণ মুনাওয়ারা বেগম, লাখো মানুষের মায়ের আসনে সমাসীন হতে পারতেন না।

বুবুজানের এ বিশলতা মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করা অসমীচীন হবেনা। পরিশেষে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমার বুবুজান "দরবারে মুনাওয়ারা"র তথা "শান্তির দরবারের" দাবীদার হওয়ার অধিকার রাখেন বলে আমি মনে করি।

বুবুজানকে সকলেই শ্রদ্ধেয় "মা'জান" বলে ডাকেন। বাস্তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি 'জগতের মা'-এর আসনে সমাসীন। আমি বুবুজানকে বুবু বলে ডাকতাম। এ ডাকে তিনি প্রাণভরে তৃপ্ত হতেন। আত্মীয়-স্বজনকে বলতেন, মিয়াই আমাকে শুধু "অ-বু" বলে ডাকে। ফোনে বা প্রকাশ্য 'অ-বু' বলে ডাকলে তিনি এক তৃপ্তির হাসি দিতেন এবং প্রাণভরে খুশি হতেন তাই আমি বুবুর স্নেহই বেশি পেতাম বলে মনে হয়।

ফখরুল আলম (মিয়া)
উম্মুল আশেকীন-এর মামাতো ভাই
দৌলতপুর, মিয়া বাড়ি
নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

উম্মুল আশেকীন মা'জানের স্মরণে
বিশেষ স্মৃতিচারণ

আমি ছোটোবেলা থেকেই মাইজভাণ্ডারের সাথে সম্পৃক্ত। যখন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) বাবাজান, হক মন্‌জিলে চলে আসেন, তখন আমি সেখানেই আসা-যাওয়া করতাম বেশি। সবসময় ওইখানে যেতাম।

সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ্ (রহ.) বাবাজানের সাথেই থাকতেন সবসময়। তিনি পুরোনো বাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন হক মন্‌জিলে বাবাজানের সাথে, সেই সুবাদে আমি ওইখানেই থাকতাম বেশি। হক মন্‌জিলেই বেশিরভাগ আসা-যাওয়া করতাম। তাঁর সাথে অনেক স্মৃতি আছে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) হলেন আমার বড় মামা। হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হলেন আমার নানাজান।

শাহানশাহ্ বাবাজান পর্দা করার পর, হযরত সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ্ অসুস্থ হওয়ার পরে, একদিন গিয়েছিলেন হক মন্‌জিলে, তখন তাঁকে দেখে মামী (উম্মুল আশেকীন) বললেন, তুমি ওষুধ পত্র খাও না! তখন তিনি বললেন, আমার তো ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে, আমি ওষুধ খাই না, ওষুধ খেয়ে কি হবে? আমাদের কায়া চলে গেছে, ছায়া থেকে লাভ কি! ছায়া থেকে তো আর কোনো দরকার নাই!

এখানে কায়া বলতে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) বাবাজানকে বুঝানো হয়েছে।

এরপর আর বেশিদিন ছিলেন না তিনি, দশমাস ছিলেন, দশমাস পর তিনিও [হযরত সৈয়দ বখতেয়ার শাহ্ (রঃ)] চলে গেলেন। সেটা মামী সবসময় বলতেন, বলতেন এইরকম মানুষ আমি আর দেখিনি, ওষুধের কথা বলছি, আর তিনি বলছেন, কায়া গেইয়্যি গুই, আর ছায়া থাকি লাভ নাই!

মা'জানের সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে। তিনি ছিলেন আমার মায়ের মতো, মা যেমন মেয়েকে আদর করে, তিনিও আমাকে সেইরকম আদর করতেন। এইগুলো বলে শেষ করা যাবে না, কত স্মৃতি আছে!

হযরত সৈয়দ বখতেয়ার শাহ্ (রহ.) পর্দা করার পর আমি দরবারে গিয়ে থাকতাম সবসময়, সব কিছুতে আমাকে সহযোগিতা করতেন মামী, আমি কোনো অসুবিধায় পড়লে, মামীর কাছে পরামর্শের জন্য যেতাম, তিনি আমাকে সবসময় পরামর্শ এবং অন্যান্য সব বিষয়ে সহযোগিতা করতেন।

তিনি সবকিছু দেখতেন, সব বিষয়ে তিনি খেয়াল রাখতেন, হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ) বাবাজানও তাঁর থেকে সবকিছু জিজ্ঞেস করতেন, পরামর্শ নিতেন এবং পরামর্শ অনুযায়ী সবকিছু করতেন।

শ্বশুর বাড়িতে খাদেমরা ছিলো, কোনো লোকজন আসলে নানাজান বলতেন, ছাগল জবাই করো, কোরমা করো, পোলাও করো, তখন মামী সবকিছু নিজের হাতে করে দিতেন। সবকিছু রেডি করে তারপর যেতেন। কিন্তু তিনি কোনদিন বলেন নাই যে, আমি এটা রেঁধেছি, ওটা করেছি! সব নিরবে করে দিতেন।

তাঁর রান্না-বান্না অনেক মজা ছিলো। অন্যরা থাকার পরও নানাজান মা'জানের উপর ভরসা করতেন বেশি।

তিনি হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)কে অনেক মানতেন, অনেক শ্রদ্ধা করতেন, নানীজানকেও অনেক শ্রদ্ধা করতেন, এছাড়াও দেবর, ননদ যাঁরা ছিলেন, সবাইকে স্নেহ করতেন, আমার আম্মাকে অনেক আদর করতেন, তাঁর মতো আর কেউ না! শুধু আত্মীয়-স্বজন না, তিনি সবার জন্য করতেন। সবাইকে দেখাশুনা করা, আদর আপ্যায়ন করার জন্য তাঁর মতো আর কেউ ছিলো না।

তিনি আশেক-ভক্তদের সাথেও একই রকম ছিলেন, তাঁদের সাথে কথা বলতেন, শুনতেন, জিজ্ঞেস করতেন, কিছু খেয়েছে কিনা! খাদেমদেরকে বলতেন, ওঁদেরকে কিছু দেয়ার জন্য। অনেক মায়া মমতা করতেন।

তিনি অনেক দান করতেন। তিনি অনেক অসহায়, এতিম মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। অসহায় মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়ার একটা ঝোঁক তাঁর ছিলো। আমি ঈদের পরে বেড়াতে গেলে, আমাকে পুরো আলমারি খুলে দিতেন, আর

বলতেন, তোমার যেটা খুশি সেটা নাও, কখনো একটা-দুইটা শাড়ি দেন নাই, পাঁচ-ছয়টা শাড়ি একসাথে দিতেন।
তাঁর অন্তরটা অনেক উদার ছিলো সবার জন্য, আমি তো বুঝতে পেরেছি, আমার মায়ের জায়গাটা তিনি নিয়েছিলেন।

সবকিছুতে তিনি আমাকে পরামর্শ দিতেন, মেয়েদের ব্যাপারে বলতেন, ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে তারপর মেয়েকে বিয়ে দিতে। ওদের আব্বাকেও বলতেন, তোমার মেয়েদেরকে তো বিয়ে দিতে হবে, তুমি টাকা পয়সা রাখছো? মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে হবে না! তখন তিনি বলতেন, আমি তো টাকা পয়সা রাখি নাই, আমার মুনিব আছেন, আমার আর কিছু লাগবেনা, মুনিবই দেখবেন সবকিছু।
বাবাজানের একটা ঘটনা বলি, একদিন বাবাজান চিৎকার করে ডাকছিলেন, রানু, রানু কোথায়? আমি দৌঁড়ে গেছি। তখন বাবাজান বললেন, মাধু, আমাকে এককাপ চা খাওয়াতে পারবে? ওইদিকে মামীকে বলছেন, আমাকে ভাত দাও, ভাত খাবো। তখন মামী ভাত নিয়ে গেলেন, আর আমি চা নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন মামা বললেন, বখতেয়ার মিয়া কি ঘরদুয়ার করেছেন? আমি চুপ করে আছি, তখন মামী বললেন, না, কিছু তো করে নাই, তখন মামা আমাকে বললেন, আপনি ওইখানে যাবেন না, এইখানে দুইতলায় থেকে যান, ফ্যান ট্যান আছে। আমি তখন বললাম, মেয়েরা পড়ালেখা করে, সবাই স্কুলে যায়। এটা শুনে মামা বললেন, এটা কোনো কথা! স্কুল কি এখানে নাই! স্কুল তো এখানে আছে। তারপর আমাকে যেতে দেননি। সেইবার অনেকদিন থাকলাম, যেদিন চলে আসতে চাচ্ছি, সেদিন তিনি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেক রোদ! খাদেমা ছেনোয়ারা তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আছে, আমি তখন তাঁকে সালাম করতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বাচ্চাদেরকে মানুষ যেভাবে জড়িয়ে ধরে, সেরকম করে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন প্রায় ১৫ মিনিটের মতো। এরপর আমি সালাম করে উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেন, মাধু, আপনার হাতটা দেন, আমি হাত দিলে তিনি ওইখানে থু থু দিলেন, তখন আমি হাতটা মাথায় মুছে নিলাম। আবার হাত দিতে বললেন, আবার হাতে থু থু দিলেন, আমি হাত আবারো মাথায় মুছে নিলাম। আবার বললেন হাত দিতে, এইবার অল্প করে থু থু দিলেন, আমি বুকে মুছে নিলাম। তারপর বললেন, এখন

ইব্রাহীম সাহেবকে বলেন, ইব্রাহীম সাহেবের গাড়ি পাঠাতে। আমি সালাম করার জন্য স্যান্ডেল দূরে খুলে রেখে এসেছিলাম, তিনি গিয়ে আমার স্যান্ডেল পরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি আর কিছু না বলে, তাঁকে সালাম করে খালি পায়ে চলে আসি – এই স্মৃতিটা আছে।

আরেকটা স্মৃতি হলো, আরেকদিন ভাত নিয়ে গেছি। তখন তিনি আমাকে বললেন, আচ্ছা ও মাধু, আপনার বিয়ে হয়েছে কত বছর? আমি বললাম, পঁচিশ বছর হয়েছে। তখন বললেন, পঁচিশ বছর হয়েছে! হয়েছে তো, আর কতদিন সংসার করবেন। তখন বাবাজান জীবিত ছিলেন, বখতেয়ার সাহেবও ছিলেন। তখন আমি বেশি কিছু বলতে পারি নাই। শুধু বললাম, না, সেরকম কিছুতো আমার নাই, সংসার তো সেভাবে হয় নাই। তখন বাবাজান হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, কেনো এইগুলা সব আপনার না! এইগুলা সবগুলিই আপনার। ওইরকম যখন বললেন তখন আমি চলে এসেছি।

আরেকবার, আমি চা নিয়ে গেছি, তিনি চা পান করছেন, আমি চায়ের কাপ আর ট্রে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার কিছু ভালো লাগছিলো না, এমনি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে জানালা দিয়ে দেখছেন, আমি দেখি নি। এমন সময় আমার স্বামী আর সিকদার সাহেব (জামাল সিকদার) এসেছেন, কি একটা অনুষ্ঠানে কয়টা গরু-মহিষ জবাই করবে জিজ্ঞেস করতে, আমার স্বামী ছিলেন সামনে, সিকদার সাহেব ছিলেন পিছনে। দরজা খুলে তাঁরা ভিতরে ঢুকলে, বাবাজান লাফ দিয়ে উঠে আমার স্বামীর হাত ধরে বললেন, ও মামু, ও মামু, আপনি আমার মাধুকে কি কোনো জ্বালাযন্ত্রণা করেন? তখন তিনি জবাব দিলেন, না, না, না, আমিতো কিছু করি না। আমি আমার স্বামীর গলা শুনে জানালায় গেলাম, তখন তিনি আমাকে দেখে রেগে গিয়ে বললেন, এইগুলা করার জন্য আসছো এইখানে! আমার নামে বদনাম করার জন্য! তখন আমি কিছু বলার আগে, মামা বললেন, না, না, না, মাধু আমাকে কিছু বলে নাই। মাধুকে মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার বুকটা খচ্ করে উঠেছে, তাই জিজ্ঞেস করছি, মাধু কিছু বলে নাই আমাকে। তারপর বললেন, আঁর মাধুরে কোনো কষ্ট ন'দিয়্যন!

রফিক ভাই (আমার মেজভাই) তখন ওয়্যারলেস অফিসে চাকরি করতেন। মাইজভাণ্ডার যেতেন প্রায় সময়। মামীদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখে আসতেন।

সেইসময় একদিন বাবাজান মেজভাইকে বললেন, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, মাইজভাণ্ডার চলে আসো। তখন মেজভাই চাকরি ছেড়ে দিলে সবাই কি বলবে আর তখন আমাদের পরিবারের অবস্থাও তেমন ভালো ছিলো না, তাই চাকরি ছাড়েননি। এরমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একসময় অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে গেলো। তখন আমার বড়ভাই মামার কাছে গেলেন, আর বললেন, মামা, ভাইয়ের অবস্থা তো ভালো না, আপনি একটু চলেন আমার সাথে। তখন মামা বললেন, আমি কি করবো! আমি তো বলেছিলাম চাকরি ছেড়ে দিতে! আমার কথা তো শুনে নাই, এখন ওদের সাথে কথাবার্তা হয়ে গেছে, কথা ফাইনাল হয়ে গেছে আর কিছু করার নাই! তখন বড় ভাই আবার বললেন মামাকে যেতে। তখন মামা বললেন, আমার মাথা ব্যাথা করছে, ভালো লাগছে না। তখন বড়ভাই চলে আসেন। সেইদিন রাত ২/২.৩০টার সময় বাবাজান তাঁর জীপগাড়ি নিয়ে আমাদের চকবাজারের বাসায় আসলেন। শীতকাল ছিলো তখন, এসে মেজভাইয়ের কাছে বসলেন, তারপর হাত দিয়ে পুরো বুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। তারপর বললেন, রফিকের বুকের ভিতর আমি আল্লাহ্‌কে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তখন আমার আম্মা কান্না করে বললেন, ও ভাই, তোমরা থাকতে আমার ছেলেটার এই অবস্থা হবে? তখন বাবাজান বললেন, বুবু, কথা ফাইনাল হয়ে গেছে, এখন আর সময় নাই। এটা বলে ফজরের সময় আবার আসবেন বলে চলে গেলেন। ফজরের সময় যখন আসবেন বলেছেন, তখন আসলেন। আর তখনই রফিক ভাইয়ের জান গেলো। তখন ফজরের আযান দিচ্ছিলো। আম্মা বেশি কান্না করছিলেন, বারবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বাবাজান আম্মাকে খালুর (চৌধুরী এন. জি. মাহমুদ কামাল) গাড়িতে করে আর আব্বাকে ইব্রাহীম সাহেবের গাড়িতে করে মাইজভাণ্ডার হক মন্‌জিলে নিয়ে যান। আম্মা কান্না করছিলেন দেখে মামা বললেন, বুবু কান্না করছেন কেন? আমি দেখছি রফিক ফুল বাগানে খেলছে। সুবহানআল্লাহ্‌! তাঁরা সব কিছু দেখেন, সব কিছু জানেন।

আমার একমাত্র ছেলে আসিফের আকিকার পরদিন আমাদের বখ্‌তপুর বাড়িতে গিয়েছেন মামা। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, অনেক মানুষের ভীড় হয়ে গেছে। তখন আমার স্বামী বললেন, বাবাজান আপনি ভিতরে আসেন। তখন মামা বললেন, ভিতরে কে আছে? তখন তিনি বললেন, আম্মা (বাবাজানের

মেজবোন) আছে। মামা বললেন, হয়েছেতো, একজন থাকলে হবে, আমাকে আর যেতে হবে না। তখন আমার আব্বাও জীবিত ছিলেন। আরো কতো স্মৃতি আছে!

একবার ভাত নিয়েছি মামার জন্য, তখন মামা বললেন, আপনি খাইয়ে দেন। আমি খাইয়ে দিচ্ছিলাম, তখন আমার হাত ধরে বললেন, এতো শুকনা কেনো আপনি? বেশি শুকনা! আপনি এক কাজ করেন, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন আর মাগুর মাছ দিয়ে ভাত খাবেন। আমাকে সবসময় মাধু বলে ডাকতেন। সবাইকে তিনি আদর করে মাধু বলে ডাকতেন, এই আদরের ডাক আর কেউ ডাকবে না কখনো!

বাবাজান রিয়াযতের সময় পানির ভিতর থাকতেন, শুধু নাকটা থাকতো পানির উপরে, মাঘ মাসের কন্‌কনে শীত! হাত-পা সব সাদা সাদা হয়ে যেতো, সারারাত পানিতে থাকতেন, সকাল হলে পানি থেকে উঠতেন। নানীজান বলতেন, তোরা কে কোথায় আছিস! একটু দেখনা, দেখনা, আমার ছেলেটা পানির ভিতর পড়ে আছে! বাবাজান উঠতেন না পানি থেকে। সকালে উঠে বলতেন, আমাকে একটু চা দিন।

এ রকম রাতের পর রাত কেটেছে। তারপর খাল পাড়ে সারারাত বসে থাকতেন। নানী চিল্লাচিল্লি করতেন, বলতেন, দেখোনা আমার ছেলেটা কোথায়! ওইখানে সাপ আছে, আরো কত বিষাক্ত প্রাণী আছে! কেউ তো তাঁকে গিয়ে বলতে পারতোনা যে, চলে আসেন।

৭১-এর যুদ্ধের সময় আমি শ্বশুর বাড়িতে ছিলাম। বাবাজান যখন হক মন্‌জিলে চলে আসার পরে আমরা গিয়েছি, তখন সব জিনিসপত্র এনে গোছানো হয়ে গিয়েছিলো।

দুইটা রুম ছিলো শুধু, ওগুলো নানাজান করে দিয়েছিলেন, একটা বাথরুম ছিলো, পিছনে একটা বেড়ার ঘর ছিলো, আশেক ভক্তদের জন্য। আমরা গেলে মামী বেড়ার ঘরটাতে চলে যেতেন থাকতে, আমরাও মামীর সাথে বেড়ার ঘরটাতে থাকতাম। তখন আমার মেয়ে নাসিম আর শারমিন ছিলো। নাসিমকে বেশি আদর করতেন মামা, দোকানে পাঠাতেন বেশি, মেলায় পাঠাতেন। স্কুল থেকে আসলে মামার কোলে বসিয়ে রাখতেন, খাবার মেখে মেখে ওকে খাওয়াতেন, চুল ঠিক করে দিতেন। উরসের সময় তাকে বলতেন, মেলাতে

যাবেন নানু, মেলাতে যাবেন না! টাকা দিয়ে তারপর তাকে মেলায় পাঠাতেন। আরেকদিন একটা কমলা নিয়ে শারমিনের কাছে গেলেন দিতে, ও নিতে গেলে হাত সরিয়ে নিতেন, আবার দিতেন, আবার হাত সরিয়ে নিতেন, এইরকম তিন চারবার ওর সাথে কৌতুক করার পর ওকে কমলাটা দেন।

মা'জান আত্মীয়-স্বজনকে অনেক মায়া করতেন। নাসিমের কক্সবাজার পিটিআইয়ের বাসা গেইট থেকে অনেকদূর। হেঁটে যেতে হতো। তিনি ওখানে হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলেন, পরে নাসিম যখন বললো, নানু আপনি কষ্ট করে হেঁটে আসছেন কেনো, দারোয়ানকে বললেতো গেইট খুলে আপনাকে নিয়ে আসতো। তখন মামী বললেন, আমি ইচ্ছে করে হেঁটে এসেছি, আমার নাতিন কোথায় থাকে, সেই এলাকা দেখে দেখে এসেছি। ওর কেয়ারীর বাসায়ও দুই তিনবার গেছেন। আমি যদি হক মন্‌জিল থেকে বখ্‌তপুর আসার কথা বলতাম, তখন মামী বলতেন, কি জন্য যাবে তুমি ওইখানে? তুমি কি হাঁস-মুরগি পালো, না গিরস্থি করো! যেতে হবে না, এইখানে থাকো। তখন মেয়েদের স্কুলের পড়া আছে বললে আবারো বলতেন এইগুলো।

আশেক ভক্তদের সমস্যাগুলি মামী মন দিয়ে শুনতেন, পরামর্শ দিতেন আর যে যেভাবে শান্তি পান, ওইভাবে করে তাঁদের সাথে কথা বলতেন।

আমি গেলে, খাদেমদেরকে ডেকে বলতেন, ওর জন্য সবকিছু এইখানে আনো, মুরগি আনো, তরকারি আনো, আমি আসার সময় ওইগুলো সব দিয়ে দিতেন। নাস্তা দিতে একটু দেরি করলে খাদেমদেরকে বলতেন, এতো দেরি হচ্ছে কেনো? নাসিমকে বিয়ের আগে একমাস নিয়ে রেখেছিলেন তাঁর কাছে, হাতের মাপ নিয়ে চুড়ি, আর অন্য সবকিছু মামী নিজে বেছে বেছে পছন্দ করে দিয়েছেন নাসিমকে।

তিনি আমাকে তাঁর নিজের মেয়ের মতো জানতেন, প্রত্যেকটা জিনিস নিজের মেয়েদেরকে যা দিতেন, আমাকেও সেটাই দিতেন। আমাকে তিনি নিজেই অনেকবার বলেছেন, তুই আঁরে মামী ডাকবিনা, মা ডাকিস! বেশি আদর করতেন আমাকে, সব ধরনের বুদ্ধি পরামর্শসহ সবকিছু ঠিক করে দিতেন।

একজন মা হিসেবে ছেলেমেয়েদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনে, লেখাপড়া করানো সব মামী করেছেন, ছেলেমেয়েদের সব দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন।

বাবাজান শেষ যে বার কক্সবাজার যাবেন, তখন তিনি সোফায় শুয়েছিলেন, তখন রফিক ছিলো! রফিক এসে বললো, বাবাজান, চলেন গাড়ি আসছে! তখন আমিও গেছি সামনে। একটা দেয়াল ছিলো, ওইখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আসিফকে নিয়ে। তখন মামা বলেছেন, না, আমার বুক ব্যাথা করছে, যাবো না। সেটা বলে আবার শুয়ে গেছেন, চা দিয়েছি, চা খেয়ে আবার শুয়ে গেছেন, তারপর রফিক চলে গেছে। আধঘন্টা পরে রফিক আবার এসেছে, এসে বলছে, বাবাজান গাড়িতো রেডি, আপনি যাবেন না? তখন মামা উঠেছেন, গেঞ্জি আর লুঙ্গি ছিলো, ওগুলো পরেছেন, এরপর আমাকে বলেছেন, আমার ভাইকে (আসিফ) কিছু খাইয়েছেন? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, খাইয়েছি। তারপর বললেন, হ্যাঁ, একটু খাওয়াবেন, ভালো করে খাওয়াবেন। এরপর আমি চলে গেছি বখ্‌তপুর, বাবাজান কক্সবাজার গেছেন। কক্সবাজার থেকে আসার পথে তাঁর বেশি খারাপ লাগছিলো দেখে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, তখন হাসান [হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)] ছিলো সাথে, এই ছিলো শেষ দেখা!

সৈয়দা জাহানারা আকতার

[হযরত সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ (রহ.)-এর সহধর্মিনী এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (ক.)-এর মেজ বোনের মেয়ে]

আমার প্রাণপ্রিয় নানু

আমার আম্মা সৈয়দা জাহানারা আকতার, শাহানশাহ্ বাবাজানের সহোদর মেজ বোন সৈয়দা মুনিরা বেগমের বড় মেয়ে। আমার আব্বা সৈয়দ নূরুল বখ্তেয়ার শাহ্ শাহানশাহ্ বাবাজানের প্রধান খলিফা এবং তৎকালীন হক মন্জিল এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি ছিলেন। শিশুকাল থেকেই আমি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আসা যাওয়া করি।

আমার প্রাণপ্রিয় নানু উম্মুল আশেকীনের সাথে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার আম্মাকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করতেন। আমাদেরকেও খুব ভালবাসতেন। নানুর সাথে আমাদের অনেক স্মৃতি আছে। তারমধ্যে থেকে ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে কক্সবাজার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের (হক মন্জিল) একটি পারিবারিক পিকনিক হয়। সে সময় একদিন সন্ধ্যায় আমার নানু উম্মুল আশেকীন, মওলা হুজুর ও তাঁর স্ত্রী, হুমায়রা খালা, কুমকুম খালা, আমার বাসায় আসেন। আমি তখন কক্সবাজার পি.টি.আই এর সরকারি বাসায় থাকতাম। মেইন গেইট থেকে ভিতরের দিকে ৬ (ছয়) একর ক্যাম্পাস। আমার নানুসহ সবাই মেইন গেইটে গাড়ি রেখে আমার বাসায় চলে আসেন। আমি তখন নানুকে বললাম, নানু কেন কষ্ট করে হেঁটে আসলেন, গাড়িতো ভিতরে নিয়ে আসা যেত। নানু আমাকে বললেন, আমার নাতনি কোথায় থাকে সেটা দেখতে দেখতে চলে আসলাম। তাঁরা যাওয়ার সময় আমি গার্ডকে বলে গাড়ি ভিতরে নিয়ে আসি। সেদিন আমি কত যে খুশি হয়েছিলাম সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কতটা মায়া, মমতা ও আন্তরিকতা থাকলে কেউ এমনটা করে সেটা সহজেই অনুমেয়।

গাউসিয়া হক মন্জিলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে উম্মুল আশেকীনের অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী। মওলা হুজুর যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা কাজ করার আগে তাঁর সাথে আলোচনা করতেন।

তিনি একজন আদর্শ পুত্রবধূ ছিলেন। পরিবারের বড় বৌয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি অনেক নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। অনেক সাহায্যকারী থাকা সত্ত্বেও শ্বশুর-শাশুড়ির সেবাযত্ন, অতিথি আপ্যায়ন সহ বিভিন্ন সাংসারিক কাজকর্ম তিনি

নিজ হাতে করতেন। তাঁর রান্না অনেক সুস্বাদু ছিল। অনেক ধরনের রান্না জানতেন নানু।

তিনি একজন আদর্শ স্ত্রী ছিলেন। শাহানশাহ্ বাবাজান সবসময় কঠিন সাধনা-রিয়াজতে নিমগ্ন থাকতেন। সে সময় তিনি সুনিপুণভাবে সংসারের সব দায়িত্ব পালন করতেন।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মা। তাঁর ছয় সন্তানকে তিনি সুশিক্ষিত, মার্জিত, মানবিক এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। লক্ষ লক্ষ আশেক ভক্তদের মা ছিলেন তিনি।

আশেক ভক্তদের জন্য তাঁর হৃদয় মায়ায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সবাইকে সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। সবার সুবিধা অসুবিধা সব খেয়াল রাখতেন।

উম্মুল আশেকীন অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। গরিব, অসহায়দেরকে তিনি সবসময় দান করতেন। ভালবাসতেন। গরিব ঘরের মেয়েদের বিয়ের জন্য তিনি প্রচুর দান করতেন।

দরাবরে আগত আশেক ভক্তদের আপ্যায়ন ও সর্বোচ্চ যত্নের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। সব কিছুর খোঁজ খবর রাখতেন তিনি।

একজন আধ্যাত্মিক সাধিকা হিসেবে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। দরবারের আধ্যাত্মিকতা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অগাধ জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাঁর।

আমার স্নেহময়ী নানু উম্মুল আশেকীন মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)। তিনি ছিলেন মহিয়সী, পরম মমতাময়ী। আমার আম্মা সুখে-দুঃখে প্রায় সময় তাঁর সান্নিধ্যে যেতেন। তিনি পরম মমতায় সমাদর করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে থাকতে বলতেন। আমাদের পরিবারের কঠিন সময়গুলোতে তিনি আমাদের মাথার উপর ছায়া হয়ে থেকেছেন। এসব ছাড়াও আরো কত এতিম, অসহায়কে যে তিনি সাহারা দিয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। আমরা নানুর পরশধন্য, স্নেহধন্য, মমতাময়ী নানুর মমতা আমাদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হে আল্লাহ্, নানুর উসিলায় আমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের ফুলের খুশবো ছিলেন আমার নানু। হে আল্লাহ্! আমার নানুকে আপনি জান্নাতের সম্মানিত স্থানে মেহমান করে নিন।

সৈয়দা নাসিমা আখতার

পিতা: হযরত সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ (রহ.)

বক্তপুর দরবার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

উম্মুল আশেকীন আমার খালাম্মা

শিশুকাল থেকে তাঁর কোলে ঘুমাতাম তাঁর নিজস্ব জবানীর আলোকে।
১৯৭৫ সালের প্রথম দিকের কোন এক বিকেলে খালাম্মাসহ পরিবারের সবাইকে (সবাই ছোট) নিয়ে মামাত বোন তুহিন, খালাত বোন ফজলুর জামাই রহমান সাহেব সহ ২টি ওপেল গাড়িতে আমাদের বাড়ি আসেন বাবাজান। তখন আমি বাঁশখালী কলেজের শিক্ষক। খালাম্মাসহ সবাইকে নিয়ে একটি নির্ঘুম উৎকণ্ঠার রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা হয় বাবাজানের সাথে। পরদিন দুপুরের খাওয়ার আগে বাবাজান হঠাৎ জজব্ হালে সবাইকে গাড়িতে উঠতে বললে, খালাম্মা মাকে সব আয়োজন বন্ধ করতে বুঝিয়ে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন।

বাবাজান আমাকেও গাড়িতে উঠার হুকুম করলে আমিও চলৎশক্তিহীন হয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। যদিও রাতে দু'বার আমাকে কক্সবাজার যাবার কথা বললে আমি ক্লাশ আছে বলে যেতে পারবোনা বলেছিলাম বাবাজানকে অথচ সব কেমন যেন নিমিষে উল্টে গেল। আমাকে হারিয়ে ফেললাম আমাতে, একটা অপরিচিত ভিন্ন অনুভুতি জেঁকে বসলো আমার অস্তিত্বে। যে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল আমাদের বাড়িতে পূর্ব রাতে, যেন শেষ হলো সায়মন হোটেলের পাঁচ রুমে অবস্থান কালে, সাগরের গলা জলে সবার দেখভালের দায়িত্বে, বাঁশখালী কক্সবাজারে ২ রাত ৩ দিনের কর্মবৈচিত্রে। খালাম্মার আকুল ইচ্ছায় দয়ায় এ পাশ করার আনন্দই আমার শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি। কারণ বেপথুর পথে আসার আনন্দই যে আলাদা। এ যে দয়ার দান, অমোঘ প্রাপ্তিযোগের সোপান, বৈপরীত্বের বিনিময়ে কৃপাদানে বরিষন।

খালাম্মা যখন শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রামের বিশেষায়িত হসপিটাল থেকে ঢাকার বিশেষায়িত হসপিটালে স্থানান্তরিত হলেন আমি তখন আমেরিকার মায়ামিতে বড় ছেলের বাসায়। সেখানে অবস্থান কালে মাওলা হুজুরের সাথে প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হতো।
যেদিন শুনলাম খালাম্মা সিসিইউতে, শঙ্কামুক্ত নন। শঙ্কিত চিত্তে সময় পার করছিলাম, আর নিজেকে বার বার ধিক্কার দিচ্ছিলাম এ অবস্থায় পাশে থাকতে না পারার জন্য। মাওলা হুজুরকে বিরক্ত না করে জামাতা ভাই জসিমকে ফোনে না

পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার কামাল ভাই, ইঞ্জিনিয়ার আজিজ ভাই, প্রফেসর জসীম ভাই ও আমেরিকায় অবস্থানরত বাহাদুর ভাইয়ের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছিলাম।

কিন্তু যেদিন সব শেষ হয়ে গেল, মা আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেলেন, তার অনেক আগে থেকেই কাউকে ফোনে পাচ্ছিলামনা। শেষ পর্যন্ত বাহাদুর ভাইয়ের ফোনে জানলাম, দুজন দুজনকে ফোনে হ্যালো বলছি কিন্তু দুজনই কিছু বলতে পারছিলাম না কান্নার তোড়ে। ঠিক সে সময়ই লন্ডন থেকে আমার সন্তানের মতো আলীর স্ত্রী জুলি আমার অবস্থা আন্দাজ করে ফোন করে বার বার সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল, বলছিল আপনি নিজেও খুব সুস্থ নন, আপনি হার্টের রোগী। এদিকে আমার ছেলে ও ছেলের বউ, তারাও কান্না থামাতে না পারলেও আমি ও তাদের মাকে বারবার শান্ত করার চেষ্টা করছিল।

পরদিন যখন সি-প্লাস টিভিতে মায়ের শেষ বিদায়ের দৃশ্য দেখছিলাম, তখন আমাকে সহানুভুতি জানাতে আমার বেয়াই-বেয়াইন, তাদের ছেলে, ছেলেবউ, অন্যসব আত্মীয় এসেছিলেন, অথচ আমি আর আমার স্ত্রী সেখানে থেকেও বাংলাদেশের অশ্রু সাগর, না থাকার বেদনায় বেসামাল ছিলাম।

যখনই মাইজভাণ্ডার শরিফ যেতাম জিয়ারত, মিটিং, বৈঠক বা অন্যান্য কার্যাদি (যদি থাকতো) সম্পন্ন করে খালাম্মার সাথে যতক্ষণ সাক্ষাৎ না হতো ততক্ষণ মনকে মানাতে পারতাম না। যাঁর পিতা দরবার এ পাকের একনিষ্ঠ আশেক ও গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের উরস এন্তেজামের একজন বিশিষ্টজন, হজের পর যিনি সংসার ও বৈষয়িক দায়-দায়িত্ব ছেড়ে মসজিদ চৌহদ্দিতে ছোট একটি শন-বেড়ার ঘর তৈরি করিয়ে কালাতিপাত করেন আমৃত্যু, তাঁরই কনিষ্ঠ কন্যাকে দরবার বড় বৌ হিসেবে গ্রহণ করে দীর্ঘ খেদমতের যেন স্বীকৃতির রূপায়ন ঘটান আর বড় বৌও পিতার রক্ত ঋণে খেদমতে, সেবায়, শ্রদ্ধায়, বিনিত আচরণ, ব্যবহার ও কর্মের ঐকান্তিক নিরবচ্ছিন্নতায়, ত্যাগের মহীমায়, উৎকণ্ঠার অকুল সমুদ্রে ডুবিয়ে নিজেকে সুষমামন্ডিত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং পিতার মতো শেষ সময় পর্যন্ত বড় বৌয়ের মর্যাদা রক্ষা করে একজন মহান, ভাস্বর অধ্যাত্ম পুরুষের একনিষ্ঠ সহধর্মিনী হিসেবে লাখো আশেক ভক্তের আশ্রয়স্থল মা'জান হতে পেরেছিলেন।

বিবাহ পরবর্তী পরম আরাধ্য অশেষ পূজনীয় শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহছায়ায় থেকে চরম উৎকণ্ঠায়, প্রতি মুহূর্তের উচাটন অবস্থায়, জীবনের প্রতিটি বাঁক অত্যন্ত সফলতার সাথে পার করে সেবা, ত্যাগ দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহে।
পরবর্তীকালে স্থানান্তরিত হয়ে পূর্ববাড়ির হাসান বাগ/হক মন্‌জিলে আসলে তা আরো বেগবান হয়। ততদিনে তাঁর পিতার শন বেড়ার ঘরে থাকার অনুরণন যেন তাঁর জীবনে ঘটে শ্বশুরের দেওয়া দু' কামড়ার ঘরে বাবাজান আর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে স্থান হয় পাকঘরের শন বেড়ার ঘরে। জবানে আমাদের সাথে আলাপে 'তোমাদের বাবাজান' হয়ে উঠেন শুধুমাত্র 'বাবাজান'। সম্পূর্ণ অনুধাবনের যথেচ্ছ রূপ যেন পরিগ্রহ করে তাঁর অনুভুতির প্রকৃষ্ট রূপায়নে আধ্যাত্মিক চেতনার সফলতায়।

দরবারের বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উরস এন্তেজাম, মাজার পরিচালনা, খেদমত, দরবারের প্রশাসনিক পরিকল্পনা, কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্যক্রম, শুভাশুভ থেকে শুরু করে সব বিষয় সম্বন্ধে তিনি খোঁজখবর নিতেন, পরিচালনায় উপদেশ দিতেন, প্রয়োজনে নিজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ প্রদান করতেন, নিজের অভিমত ব্যক্ত করতেন। তৎকালীন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রিয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ সিকদার, পোর্ট ট্রাস্টের ইঞ্জিনিয়ার আলী নবী চৌধুরী, লালখান বাজার বাগদাদ ফার্ণিচারের স্বত্তাধিকারী আবদুস্ শুক্কুরে'র দরবারে অনুপস্থিতির খবর স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছে পৌছুলে, তিনি আমাকে উক্ত তিনজনের কাছে পাঠান। তিনজনই বাধ্য সন্তানের মতো ফিরে আসেন মায়ের হুকুমে এ ধরণের শত শত ঘটনা রয়েছে।

স্বভাবজাত নম্র ব্যবহার, স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আলাপের আন্তরিকতা, সদা সহানুভুতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে করেছে অনন্য, অসাধারণ, মন্‌জিল সমূহের মধ্যে বিপুল ফারাকের ব্যতিক্রমী 'মা'জান' হিসাবে স্বর্ণসিংহাসনে করেছে আসীন। আপন পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, আশেক-ভক্তের কোন ভেদাভেদ ছিলনা তাঁর কাছে। ব্যবহারের মিষ্টতায়, বলার নম্রতায়, যুক্তির পরাকাষ্ঠায় তিনি ছিলেন ভিন্নমাত্রার অনন্য সাধারণ। খাদেমাদের সাথে যে ব্যবহার পুত্র-কন্যা-আত্মীয় স্বজনের সাথেও ভিন্ন ছিলনা।

খালা হিসাবে, মা হিসাবে, আত্মীয় হিসাবে বলা যায়, যে শিশুর জীবনকাল শুরু হয়েছে খালার কাছে মায়ের অতুলনীয় আদর স্নেহে, বুড়ো বয়সেও তার পরিবর্তন পাইনি।

তিনি আমৃত্যু মানবসেবায় রত ছিলেন তাঁর এ সেবা কার্যক্রম সকলের জন্য অবারিত ছিল পুত্র-কন্যা, পরিবার, আত্মীয়-পরিজন, আশেক-ভক্ত সকলের জন্য সীমাহীন আন্তরিক ও দয়ার্দ্র চিত্ততায় ভরপুর ছিলো।

মা'জান পর্দা করে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলেও রেখে গেছেন যোগ্য উত্তরসুরী অন্দরমহল নয় সার্বিক কল্যাণে, কর্ম সম্পাদনের প্রকৃষ্টতায়, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে–আপন মেধা, মনন, ব্যবহার, আচরণ ও সর্বত্রগামী দৃষ্টির সীমানায় যাঁর অবস্থান।

এ ওয়াই এমডি জাফর
পিতা: আজিজ আহমদ চৌধুরী
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম– কালীপুর, ডাকঘর– ইজ্জতনগর
উপজেলা– বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
সম্পর্ক: খালাম্মা, বড়বোনের ছোট ছেলে

শেষ দেখা–না দেখার কষ্ট

উম্মুল আশেকীন আমার খালাম্মা। ছোট বেলায় একবার দরবারে বেড়াতে গিয়েছি। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে প্রায় সময়ই দেখতাম খালাম্মা বড় রওজায় জিয়ারতে যেতেন। জিয়ারত কি বুঝতামনা তখন, অনেক সময় দেখতাম খালাম্মা অঝোরে কাঁদছেন।

আমার খালাম্মার মৃত্যুই সবচাইতে বড় কষ্টের। আমেরিকা ছিলাম, শেষ দেখা না দেখার কষ্ট, সবচাইতে বড় কষ্টের।
মাইজভাণ্ডারী গান সম্পর্কে তিনি বলতেন, গানে আগের সেই দরদ আর নেই, আধুনিক গানের সুর চলে এসেছে বলে উষ্মা ও দুঃখ প্রকাশ করতেন।
খালাম্মা সব বিষয়ে খবর রাখতেন। খাদেমা, আশেক-ভক্ত, আত্মীয় পরিজন সবার সাথে সুন্দর ও আন্তরিক নম্র ব্যবহার করতেন তিনি।
খালা হিসাবে, মা হিসাবে ও আত্মীয় হিসাবে খালাম্মা তুলনাহীন ছিলেন। তিনি সবাইকে একইভাবে দেখতেন। তাঁর কাছে পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, আশেক-ভক্ত-খাদেমার মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিলনা। সবার সাথে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় কথা বলতেন। তাঁর কথায় সবাই মুগ্ধ হতো। আমরা সবসময় তাঁর মত হবার বাসনা মনে রাখতাম এবং চেষ্টাও করতাম, এখনো করেই চলেছি।

১৯৭২ সালে আমার বড় ভাইয়ের বিয়েতে বাবাজান (খালু) সহ খালাম্মা আমাদের বাড়িতে (নারায়ন হাট) এসেছিলেন।

আবার আমার বিয়ের পর বাঁশখালী কালিপুরে বাবাজান আমার খালাম্মাসহ গেলে আমার হাতে বাবাজান খানা কবুল করতেন। আমাকে কখনো রুবিমা কখনও মাধু ডাকতেন। আমার কাছে এর চাইতে বড় আনন্দের আর কিছু নেই। নিশ্চয়ই তা আমার নাজাতের উসিলা হবে।

রোকসানা বেগম রুবি
পিতা: বদিউল আলম চৌধুরী
হাপানিয়া চৌধুরী বাড়ি, গ্রাম– নারায়নহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
স্বামী: এ ওয়াই এমডি জাফর
গ্রাম: ইজ্জতনগর, ডাক: কালীপুর, বাশখালী, চট্টগ্রাম
সম্পর্ক: আমার ছোট খালাম্মা, তাঁর মেজবোনের সেজ মেয়ে

আমার ছোট ননদ

উম্মুল আশেকীন আম্মাজান এর বড়ভাই মোঃ আব্দুল মালেক চৌধুরীর সহধর্মিনী আমি। আম্মাজান সম্পর্কে আমার ননদ হলেও অলিকুল সম্রাট শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সম্মানিতা সহধর্মিনী, সেই প্রেক্ষিতে আম্মাজান বলে সম্বোধন করাটাই শ্রেয়। তিনি শৈশবকাল থেকেই অনেক সহনশীল, উদার মানসিকতার ব্যক্তি ছিলেন। বাড়িতে কোন ভিক্ষুক সাহায্যের জন্য আসলে আম্মাজান সাহায্যদানে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অসহায়দের প্রতি প্রাণবন্ত ও দয়াবান ছিলেন। পরিবারের কারও সাথে তাঁর মনোমালিন্য হত না। আমার শ্বশুরের কনিষ্ঠকন্যা হওয়াতে তিনি সকলের দুলালী ছিলেন। তিনি বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়ন ছিলেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে সদা সজাগ থাকতেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানের বিবাহের প্রস্তুতি নেওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের মাধ্যমে বিভিন্ন দিক থেকে মেয়ের সন্ধান নেওয়া শুরু হয়। এরই মধ্যে মির্জাপুর এলাকায় এক পাত্রীর সঙ্গে মোটামুটি বিবাহের প্রস্তুতি শুরু হয়। হঠাৎ শাহানশাহ্ বাবাজান এর অভিমতে সেই প্রস্তাবটিতে নিষেধ করে আমার শ্বশুরের কাছে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা মুনাওয়ারা বেগম এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন।

আমার শ্বশুর অছিএ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বাবাজান এর আশেক ছিলেন। মুনিবের দরবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিশ্চিন্তে কোনরূপ আপত্তি ছাড়া তিনি প্রস্তাব কবুল করেন। বাবার সিদ্ধান্তে পরিবারের অন্যরাও দ্বিমত পোষণ করেনি। এরপর যেদিন বিবাহের আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে বরপক্ষের লোকজন বাড়িতে আসে সেইদিনই আমার শ্বশুরের ইন্তেকাল হয়। শ্বশুরের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠার বেশ কিছুদিন পর ননদের বিবাহের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। শাহানশাহ্ বাবাজান একজন আল্লাহ্র আধ্যাত্মিক সাধক, তাঁর অস্বাভাবিক আচরণ, পরিবারের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা এই বিষয়ে আমাদের কোনরূপ আপত্তি ছিল না। আমার স্বামী যেহেতু বড়ভাই সেই হিসেবে পিতার দেওয়া ওয়াদা পালনে তিনি সুদৃঢ় ছিলেন।

বিবাহের দিন বরপক্ষ তাঁদের লোকজন, সানাই, ঢোল, ব্যান্ড-পার্টি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বাড়িতে আসেন। বিয়ে বাড়ি হাসি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠে।

আত্মীয়-স্বজনে ভরপুর ঘরের প্রতিটা কামরা। এমতাবস্থায় শাহানশাহ্ বাবাজান হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আশেপাশে বহু খোঁজাখুঁজির পর দুলহার সন্ধান মিলে। কাচারি ঘরের পাশে উঠোনের এক কোণায় কাঁঠাল গাছের নিচে তিনি বসে ছিলেন। সারাদিন একই অবস্থানে বসে খাওয়া দাওয়া করলেন ও বিবাহের কার্য সম্পাদনের পর রাত্রিযাপন করেন।

বাবাজান এর অস্বাভাবিক আচরণের কথা আম্মাজানকে জানানো হলে তিনি কোনও দ্বিধাবোধ করেননি। এরপর আম্মাজানের বিবাহের দশদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও বৌ ফেরানো দেওয়া হয়নি। আম্মাজান এর সাথে যারা গিয়েছিল তারাও নতুন আত্মীয়ের বাড়িতে লজ্জাবোধ করছিল। বাবাজানের সাথে আম্মাজানের দেখাসাক্ষাতও হয়নি। দুজনেই আলাদা কামরায় থাকতেন। অতঃপর বাড়ি থেকে কয়েকজন পাঠিয়ে আম্মাজানকে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শাহানশাহ্ বাবাজানকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অনেক বুঝানোর পর আম্মাজানকে বাড়ি আনার নির্দেশ দিতে রাজি হয়েছিলেন।

বেশকিছুক্ষণ পর বাবাজানের কাছে তাঁর ভাই জিজ্ঞাসা করেন। ভাবীরা কি বাড়িতে পৌঁছে গেছে? বাবাজান হাসছিলেন আর বললেন’ ওরা চলে আসছে। সবাই আবারও ফিরে আসছে। তখন রীতিমত সবাই অবাক। এতদিন পর নতুন বৌ বাড়িতে গেল সাথে সাথে কেন ফিরে আসবে। হঠাৎ করে বাড়ি ফেরার মাঝপথে আশ্চর্যজনকভাবে খালের সেতুটি ভেঙে পড়ে। বাধ্য হয়ে সবাইকে দরবারে ফিরে যেতে হয়।

কয়েকদিন দরবারে কাটানোর পর সবাই বাড়ি আসে। বাড়িতে এনে তাঁর বড়ভাই সিদ্ধান্ত নেন, যেহেতু শাহানশাহ্ বাবা ও আম্মা আলাদা থাকতেন সেক্ষেত্রে বাড়িতে যতদিন ইচ্ছা রেখে দেওয়া যায়। সেইরাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন। শাহানশাহ্ বাবাজান ক্রোধে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে মারধর করছেন। সকালে উঠেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তিনি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন এবং আগামী দিনেও বাবাজানের নিদের্শ অনুযায়ী ছোটবোনের আনা নেওয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর থেকেই আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল ও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উপর ভরসা করে আম্মাজান সংসার জীবন শুরু করেন। বিবাহের কয়েক বছর পশ্চিমবাড়িতে যৌথ পরিবারে ছিলেন। পরে বাগানবাড়িতে আলাদা করে দেওয়া হয়। সেখানে এককভাবে নিজের সংসার সাজিয়ে তোলেন।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী পুত্রবধূকে অনেক স্নেহ করতেন। শ্বশুরের সহায়তায় পরিবারের ভোগ নিবারণ করতেন কখনও বাপের বাড়ি থেকে কিছুর দাবি জানাতেন না। কোনকিছুর অতি আকাঙ্খাও ছিল না। সর্বদা আল্লাহ্র ভরসায় থাকতেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মেহেরবানীতে আস্তে আস্তে সচ্ছ্বলতা আসার পর থেকেই নিজ পরিবারের মূলকর্ত্রী হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। পরিবার, আত্মীস্বজন, আশেকান ভক্তগণ, উরস শরিফ ইত্যাদির মাঝে নিজেকে ব্যস্ত করে নেন। তিনি যেমন পরিশ্রমী ছিলেন তেমনই ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্তপ্রতিক। মিথ্যা, ব্যাভিচার, অন্যায় এসব বিষয়কে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। আশেকানদেরও সর্বদা এই নীতিআদর্শে পরিবারের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে আত্মবিসর্জন দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি ইসলামিক বিধান সমৃদ্ধ আদর্শ নারীর দৃষ্টান্ত সম্পন্ন নজির ছিলেন।

মিসেস আবদুল মালেক চৌধুরী
উম্মুল আশেকীন-এর বড় ভাবী
বদরুজ্জামান চৌধুরী বাড়ি, গ্রাম: নিচিন্তা দাঁতমারা
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

বাবাজান চোখ খুলে তাকালেন

আমি রেহেনা বেগম ফেরদৌস চৌধুরী। আমার বাড়ি মিরসরাই। আমার শ্বশুর বাড়ি আনোয়ারা। আমার স্বামীর নাম ফেরদৌস উদ্দিন চৌধুরী। আমি দক্ষিণ উপজেলা আওয়ামীলীগ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। এক্স চেয়ারম্যান, আনোয়ারা ও জেলা নারী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। আমার বাবা মাইজভাণ্ডার এর আশেকান ছিলেন। আমার মেজভাই জালাল উদ্দিন চৌধুরী আমিনুল হক শাহ্ মাইজভাণ্ডারীর নাতনীর সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সূত্রে আমরা বাবাজান কেবলা এ কাবার আত্মীয় হতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী প্রায় সময় আমাদের বাসায় আসতেন। তিনি হলেন আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ উর্ধ্বস্তরের আল্লাহ্র সম্রাট বাদশাহ্। ছোটবেলায় এতকিছু বুঝতাম না। এটুকুই ধারণা ছিল যে, তিনি সাধারণ কেউ নন। তিনি আল্লাহ্র অশেষ কুদরতের ক্ষমতার অলৌকিক নিদর্শন। সেই চিন্তা চেতনায় অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বাবাজান সবসময়ই জজ্বাহালে আল্লাহ্র ধ্যানে একাকীত্বে বসে থাকতেন। একদিন বাবাজান আমাদের বাসায় রেডিওতে গান শুনছিলেন। হঠাৎ রেডিও সহ বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। এমন সময় আমার ভাবী বললেন, হায় হায় বাবাজানতো আমার ক্যাসেট নিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে বাবাজান একথা শুনামাত্রই রেডিওটি সামনের পুকুরে ফেলে দেন। এরপর বজলুল শাহ্ রহমানের বাড়িতে ঢুকে যান।

বাবাজান সবসময়ই মজনুহালে ঘুরে বেড়াতেন। প্রায় সময় ব্যাটারিগলি থাকতেন। আমি ইংলিশ পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার আগে বাবাজানের কাছে দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাটারিগলি যাই। আমার কাছে অল্প কিছু টাকা ছিল তা দিয়ে আমি আপেল ও সিগারেট নেই। আমার মেজভাই ও ভাবী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অনেক কিছুই নিয়েছিল। তারপর বাবাজান এর কাছে যাই। গিয়ে দেখলাম তিনি সাদা একটি লুঙ্গি পড়ে বাবরি কাটা চুল একপাশ হয়ে ঘুমিয়ে আছেন।

আমার ভাই-ভাবী বাবাজানকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ভিতর ঘরে প্রবেশ করছে। আমি মনে মনে আফসোস করছিলাম ও ভাবছিলাম হায়রে আমিতো বাবাজানের জন্য এনেছি তিনিতো দেখতে পেলেন না। বাবাজান সাথে সাথেই চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভিতরে বুবুরে দি আইউন'। মারহাবা আল্লাহ্র

অলিগণ অন্তর্যামী। তখন আমি বুঝলাম বাবাজান আমাকে কবুল করেছেন। সেই দিন বাবাজান এর সঙ্গে সাক্ষাতকালে আমি তাঁর ফেলে দেওয়া সিগারেটের অংশ ও দিয়াশলাইয়ের কাঠিগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখি। যখনই বাবাজান এর সঙ্গে দেখা হত আমি এই কাজটি করতাম।

হঠাৎ এক দুর্বিষহ অবস্থায় আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমার স্বামী প্রায় তিন বছর আমাকে কোন টাকাপয়সা দিতে পারেননি অথচ আমি ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে খরচ করতাম। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে তাদেরও দিতাম। এভাবে অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আশ্চর্য হয়ে পড়ি। আমি এত টাকা কই পেলাম, আমিতো শুধুমাত্র তিনশত টাকা ব্যাগে রেখেছিলাম। পরে উপলব্ধি করতে পারলাম সবই শাহানশাহ্ বাবাজানের দয়া মেহেরবানী।

শাহানশাহ্ বাবাজানের একমাত্র উত্তরাধিকারী শাহ্জাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মওলা মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিনী জেসমিন হাসান হলেন আমার বড় ভাইয়ের মেয়ে বেবির ননদ। সেই সূত্র ধরে, আবারও বাবাজানের সাথে আত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। সেই সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে আমরা অনেক গর্বিত ও আনন্দ অনুভব করি। আলহামদুলিল্লাহ্।

আগে বহুবার দরবারে গিয়েছিলাম, মাইজভাণ্ডারের সেমা মাহ্ফিল, জিকিরের ধ্বনি, মিলাদ, কিয়াম, মুনাজাতে আত্মার শান্তি লাভ করতাম। আল্লাহ্র অলিগণের রহমত ফয়জ বরকত যেন এসবের মধ্যেই জড়িয়ে আছে।

তবে আত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আম্মাজানকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। খোদায়ী মারফতের এতবড় বুজুর্গের সহধর্মিনী তাজিমের যেন ত্রুটি না হয় সেই ভয়ে সবসময়ই দূর থেকেই দেখতাম। আম্মাজান আল্লাহ্-রাসূলের দ্বীনিশিক্ষায় আলোকিত একজন মহিয়সী ছিলেন। মা ফাতেমা (রা.)-এর ন্যায় আখলাকের অনুসারী নারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। আশেকানের সঙ্গে তাঁর রূহানী সম্পর্ক বিরাজ করত। আম্মাজানের কাছে আশেকানের গুরুত্ব যেন সকল কিছুর উর্ধ্বে। শাহানশাহ্ বাবাজানের বেলায়তী ক্ষমতার অংশীদার হয়ে আশেক ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করতেন। তিনি ছিলেন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের সাফল্য অর্জনকারী বীরজননী।

রেহেনা বেগম ফেরদৌস চৌধুরী
স্বামী: ফেরদৌস উদ্দিন চৌধুরী
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

চৌদ্দ বছর পর সন্তান লাভ

লক্ষ-কোটি মানুষের শ্রদ্ধেয় 'মা' জান হওয়ার পিছনে তাঁর মা-বাবারও অনেক অবদান রয়েছে। এই জমিদার বাড়ি আমার অনেক পুরনো আত্মীয়। এই অসাধারন ব্যক্তিত্ব জনাব বদন সিকদারের জেঠার সাথে আমার নানার বোনের বিয়ে হয়। সাত বছর নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর জেঠা মারা যান এবং আমার নানার বোনকে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সিকদার সাহেবের মা-ও আমার নানীর আপন বোন। তাঁদের নানার বাড়ি ধানপোড়া চৌধুরীর বাড়ি। তাঁর মেজ মেয়ের বিয়ে হয় আমার মামাতো ভাই বদিউল আলম চৌধুরীর সাথে। সেই সুবাদে বদরুজ্জামান চৌধুরীর বড় ছেলে আবদুল মালেক চৌধুরীর বড় মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়।

বদরুজ্জামান চৌধুরী সাহেব অছিয়ে গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর মুরিদ ছিলেন। উরস শরিফ পরিচালনা কমিটির সাধারন সম্পাদক ছিলেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানকে অনেক বড়লোক মেয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অছিয়ে গাউসুল আযম সকলকে উপেক্ষা করে সিকদার বাড়িতে লোক পাঠালেন 'মা'জানের সাথে শাহানশাহ্ বাবাজানের বিয়ের জন্য।
বদরুজ্জামান চৌধুরী (বদন সিকদার) মহাবিপদে পরে গেলেন। না-ও করতে পারবেন না আবার হ্যাঁ করলেও তাঁর পীর সাহেবকে বেয়াই ডাকবেন কি করে? শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ-ই করে ফেললেন। কিন্ত মনে মনে আরজি দিলেন, মেয়ের বিয়ে আগে যেন তাঁর মৃত্যু হয়। কারণ পীরকে কোনদিনই বেয়াই ডাকতে পারবেন না। তাঁর আরজি মত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর মেয়ের বিয়ের পূর্বেই রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখ সুবহে সাদিকের সময় মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে মহামিলনে নিয়ে যান। এককথায় তাঁর পীর সাহেবকে আর বেয়াই ডাকতে হলো না।
১৯৫০ সালের ২৮ জানুয়ারি 'মা'জানের যখন বিয়ে হয় তখন আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। লোকমুখে শুনেছি এই বড় বিয়ের কথা। বছর খানেক পরে জোৎস্না রাতে পায়ে হেটে আমার মায়ের সাথে মাইজভাণ্ডার শরিফ জিয়ারতে যাই। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের অন্দর মহলে তাঁর সাথে মহিলা জায়রীন হিসেবে আমার

মা দেখা করেন। ঐ সময় মা'জানকে ভাল করে দেখেছি। আর শাহানশাহ্ বাবাজানের আম্মাজান আমাদের দাদী হুজুরাইনকেও দেখেছি। ভিতর বাড়িতে একটি বাঁশের বেড়ার টিনের ছাউনির মেহমান খানায় বসিয়ে চা-নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করিয়েছেন। আমার আম্মাকে ফুপু বলে সম্বোধন করছিলেন।

দাদী হুজুরাইন ও দাদা হুজুর মা'জানকে খুবই স্নেহ করতেন বড় বউমা হিসেবে। মা'জান বড় জমিদারের মেয়ে হলেও তা কোনদিন কাউকে প্রকাশ করেননি। বড়-ছোট সবাইকে আদর আপ্যায়ন করতেন।

মা'জানের মনটা ছিল অনেক বড়। ভাদ্র মাস আসলে তিনি বাপের বাড়িতে যে রকম দেখেছেন, বড় বড় ডেকচি করে মধু ভাত পাকিয়ে এবং বৈঠা ভর্তি করে তাল পিঠা বানিয়ে ভেতর বাড়ি বাহির বাড়ির সবাইকে পরিবেশন করতেন।

নতুন বাড়িতে (গাউসিয়া হক মন্‌জিল) মা'জান চিংড়ি শুটকি দিয়ে মশুর ডাল রান্না করে প্রথম শবেবরাত করেছিলেন। এভাবে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কোনদিন বাবাজানের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। রাতদিন বাবাজানের খেদমতে থাকতেন। রাতের ২/৩ টা বাজে মেহমান গেলেও শাহানশাহ্ বাবাজান মেহমানদের জন্য খাবার পাঠাতে মা'জানকে বলতেন। মা'জান কোনদিন এতে অপারগতা জানাননি। মাঝে মধ্যে বেশিরভাগ সময় চৈতন্য গলি আমার সেজ ফুপু শাশুড়ির বাসায় অর্থাৎ জসিম চৌধুরীর বাসায়, ব্যাটারী গলি ব্যাটারী কোম্পানীর বাসায় থাকতেন। তাঁর কষ্ট হলেও কোনদিন বাবাজানকে বলেননি যে তিনি দরবারে চলে যাবেন। যখন বাবাজান নিজে খুশিতে নিয়ে যেতেন তখনই যেতেন।

আমার বিয়ের পর ১৪ বৎসর ছেলে হয়নি। মা'জান নিজের চোখের পানি ফেলে বাবাজানের কাছে আমাকে ছেলে দেওয়ার জন্য বারবার আরজি দিয়েছেন এবং ১৯৮৮ সালে আমার প্রথম মেয়ে হয়েছে। আবার ঐ মেয়ের নামও দিয়েছেন শাহানশাহ্ বাবাজান। বাবাজান বলেছিলেন নিহার রাখুন জে – নিহার। বাবাজানের কালাম মত আমি আমার মেয়ের নাম রেখেছি নিহার আকতার।

আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৮৮ সালে বাবাজান আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

গাউসিয় হক মন্‌জিলের সমস্ত কিছু দেখতেন চালাতেন বখতেয়ার সাহেব ও জামাল সিকদার সাহেব। এক বৎসরের ভিতর বখতেয়ার সাহেবও চলে গেলেন। তখন সব পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করতে হয়েছে মা'জানকে।

মা'জান আমার জানামতে কোনদিন কোন ভক্ত-জায়রিনকে অসন্তুষ্ট হন মত ব্যবহার করেননি। তিনি যে কোন মেহমান ও ভক্ত-জায়রিনকে সন্তুষ্টচিত্তে মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন। তাই সমস্ত মাইজভাণ্ডার শরিফে যত মহিলা ভক্ত-জায়রিন অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করেন, তার চেয়ে বেশি মহিলা ভক্ত-জায়রিন মা'জানের কাছে আসেন এবং তাঁর থেকে সমস্ত আরজি আবেদনের সমাধান ও সুফল পেয়ে থাকেন।

মা'জানকে দেখার জন্য অনেক মহিলা ভক্ত-জায়রিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। তিনি সময়মত নিচ বারান্দায় একটি মোড়ায় বসতেন, তারপর সারিবদ্ধভাবে এক এক করে সাক্ষাৎ দিতেন এবং মহিলা ভক্ত-জায়রিনরা তাদের আর্জি-আবেদন জানাতেন। মা'জানও সুমধুর ভাষায় তাদেরকে সম্মতিসূচক উত্তরে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিতেন।

শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফের নক্শা করেছিলেন স্থপতি আলমগীর কবির সাহেব। এরপর রওজা নির্মাণ হতে অর্থের যোগানসহ বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, সাজসজ্জা, ভেতর-বাইরের শোভাবর্ধন সব কিছুতেই মা'জানের সদয় পরামর্শ ছিল।

বাবাজানের ওফাতের এক সপ্তাহ পূর্বে একটা দোয়া লেখা এসেছিল বাবাজান ওফাত হলে ঐ দোয়া লেখাটা বাবাজানের শরীর মোবারকের উপর দিয়েছিলাম। বাবাজানকে গোসল দেয়ার জন্য নেওয়ার সময় ঐ দোয়া লেখা বিছানার চাদর সব আমার হেফাজতে রেখেছিলাম। ৫/৬ দিন পর তাঁকে বুঝিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। তখন মা'জান বলেছেন আর কোনদিন তো এই দোয়া লেখা আসে নাই। এই দোয়া লেখাটা এক সপ্তাহ পূর্বে এসেছে নিশ্চয়ই এটাতে কোন রহস্য আছে এটা রেখে দাও। আমি মরলে আমার গায়ের উপর দেবে। ঠিকই ৩৪ বৎসর পর মা'জান পর্দা করলে তাঁর গায়ের উপর মেজ আপাকে (মেজ শাহ্জাদী) বলে ঐ দোয়া লেখাটি দিয়েছি।

শাহানশাহ্ বাবাজানের রওজা শরিফ করার সময় আমি, জসিম চৌধুরী, জাফর বদ্দা মিলে মূল তাবুকের বাম পার্শ্বে মা'জানের জন্য একটি তাবুক করেছিলাম।

মা'জান পর্দা করার খবর শোনার পর শুধু চিন্তা করছি মা'জানকে রওজা শরিফের ভিতর বাবাজানের পাশে সমাহিত করতে পারছি কিনা। মেজ আপাকে এবং

জসিম চৌধুরীকে ফোন করেছি। জাফর বদ্দাকে মনে করিয়ে দিয়েছি। শেষে জসিম চৌধুরী বলেছেন, মওলা হুজুর নিজে হুকুম দিয়েছেন রওজা শরিফের ভিতর তাবুত তৈরী করতে। এটা শুনে বাবাজানের কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম আমাদের আশা পূরণ হয়েছে। লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে মা'জানের নামাযে জানাযা পড়ে তাঁকে সমাহিত করাটাই প্রমাণ করে দিল উম্মুল আশেকীন মা মুনাওয়ারা বেগম এর মত এত বড় মহীয়সী মহিলা ১০০ বৎসর এর মধ্যে আর জন্মাবে না।

কামাল উদ্দিন আহমদ
'মা জান'এর ভাই-ঝি জামাই
সদস্য, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রিয় পর্ষদ
ঠিকানা: ৩য় তলা, ১১ নং ভবন, রোড নং-২
ফুলেশ্বরী আবাসিক, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম

বাবা তোমরা চলে যাচ্ছ কেন

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাথে আমার সম্পৃক্ততা মূলত আত্মীয়তার সূত্রে। সেই আত্মীয়তার সূত্রে আমি দরবারের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি আল্লাহ্র দরবারে সবসময় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার শ্রদ্ধেয় মাতা শাহ্জাদী সৈয়দা রওশন আরা বেগম হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আপন ভাইয়ের একজন সম্মানিত আওলাদে পাক। সেই হিসেবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ হচ্ছে আমার নানার বাড়ি। সেই নানার বাড়ির আত্মীয়তার সূত্রে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে সামাজিকভাবে মামা এবং উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগমকে আমি মামী বলে সম্বোধন করতাম।

আজকে আমার অভিজ্ঞতা আমি মূলত উম্মুল আশেকীনকে নিয়ে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। যতবার তাঁকে দেখেছি, যতবার তাঁর সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, ততবার আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি গভীর মমত্ববোধ, দেখেছি মানুষের জন্য দরদ, দেখেছি মানুষের জন্য ভালোবাসা, দেখেছি কিভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে। তাঁকে দেখেছি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শকে কিভাবে লালন করা যায়, দরবারের প্রতিটি কাজকে কিভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়, দরবারের দাওয়াতকে অর্থাৎ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আদর্শকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই নিয়ে চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকতে। দরবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ তিনি তাঁর প্রতিটি কাজেকর্মে এবং জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে প্রকাশ করেছেন। বহুবার তাঁকে দেখেছি, যখন তিনি মাইজভাণ্ডারী গান শুনতেন তখন তিনি গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন। মনে হতো তিনি হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে রেখেছেন নিজেকে। আজকে আমার যে অভিজ্ঞতাগুলো আমি বলবো, তা কিছুটা নিজে দেখা আর কিছুটা আমার শ্রদ্ধেয় মাতার কাছ থেকে শোনা। উম্মুল আশেকীন মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আসেন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর নবপরিনীতা বধূ হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই একজন নববধূর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক বিষয়গুলোকে তিনি সানন্দে বিসর্জন দিয়েছেন। একজন নববধূর আশা থাকে স্বামীর সাথে তিনি

সময় কাটাবেন। কিন্তু স্বামী যেখানে খোদায়ী রহস্য খোঁজায় ব্যস্ত, যেখানে তিনি আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য অবলোকনে রত, সেখানে তো তাঁকে ধরে বেঁধে রাখা যায় না, ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না। আমি আমার আম্মার কাছ থেকে শুনেছি, উম্মুল আশেকীন ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে শাহানশাহ্‌ বাবাজানকে দেখে থাকতেন যখন তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা মোবারকের দিকে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে থাকতেন। নবপরিনীতা বধূ হিসেবে আশানুরূপভাবে স্বামীর সঙ্গ না পাওয়ার সেই কষ্ট তিনি কষ্ট হিসেবে মনে করেননি। তিনি সবসময় বলেছেন, ‘এটা তাঁর দয়া’। আমরা জানি যে মা’জানকে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকতে হয়েছে – আমাদের কাছে এটা কষ্টের মনে হয়। কিন্তু তিনি সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন সে কষ্ট। শাহানশাহ্‌ বাবাজান চা পান করতে চেয়েছেন, কিন্তু এরপরই তিনি সাধনায়, আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনে রত হয়ে গেছেন। আম্মাজান সারারাত ধরে সে চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কখনো কখনো হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন কিন্তু সেই কষ্টকে তিনি কখনোই কষ্ট হিসেবে দেখেননি। সবসময় তিনি একটা কথাই বলেছেন, ‘এটা তাঁর দয়া’।

হযরত খাজা মঈনুউদ্দিন চিশ্‌তী (রহ.) বলেছেন, “সত্যিকারের আশেক সেই ব্যক্তি, যিনি মাশুকের দেওয়া দুঃখকষ্ট, মসিবত আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লয়, উহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে না”। একটা জিনিস আমার কাছে অন্তত পরিস্কার হয়েছে, উম্মুল আশেকীনের জীবনের যে সংগ্রাম, শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর সাধনার সাথে তাঁর যে একাগ্রতা এবং সেই একাগ্রতা করতে গিয়ে তাঁকে যে সংগ্রামী জীবন যাপন করতে হয়েছে, যে কষ্ট তাঁকে বরণ করতে হয়েছে; সেই কষ্ট তিনি কোনদিন কষ্ট হিসেবে দেখেননি। তিনি দেখেছেন হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তের বাগানের যে সূর্য সে মহান স্বত্ত্বার সাথে নিজেকে একাত্ম করে রাখার একটি সুযোগ হিসেবে।

আমার আম্মার সাথে শাহানশাহ্‌ বাবাজানের ‘ভাই-বোনের’ একটা অত্যন্ত স্বর্গীয় সুমধুর সম্পর্ক ছিল। আমাকে উম্মুল আশেকীন কয়েকবার বলেছেন, “বাবা তোমার মাকে যখন তিনি দেখতেন তখন তিনি অস্থির হয়ে যেতেন, কি খাওয়াবেন, কি করবেন – এতো ভালোবাসতেন”। আমার মা যে কোনো বিষয়ে, বিপদে-আপদে-খুশির খবরে শাহানশাহ্‌ বাবাজানের কাছে ছুটে যেতেন। শাহানশাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী আমার মাকে একদিন বলেছেন– “বুবু, আমাকে যদি না পান আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না – (আমার মায়ের কাছ

থেকে শুনেছি), জেবুর মাকে বলে যাবেন” (জেবু শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর বড় সন্তান)। আমি অনেককেই বলতে শুনেছি, শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বলেছেন, “জেবুর মাকে বললে আমি শুনবো”। এ স্বীকৃতি উম্মুল আশেকীনের সাধনা এবং খেদমতের যোগ্যতম পুরস্কার বলে আমি মনে করি।

এবার আমি আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলতে চাই। আমি যতবার মা'জানকে দেখেছি, ততবারই তাঁর মধ্যে দেখেছি গভীর মমত্ববোধ। আমি কয়েকটি ঘটনা বলবো, একবার স্বপরিবারে বিদেশ থেকে যখন দেশে আসি তখন ১০ই পৌষের শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র খোশরোজ শরিফে যোগদানের জন্য আমরা ৯ই পৌষ বিকেলে দরবারে পৌঁছি। আমরা গাউসিয়া হক মন্‌জিলের ভিতর বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ করে রাত দশটা/সাড়ে দশটার দিকে আমি মা'জানের খোঁজ করে জানলাম যে, তিনি রান্নাঘরে মধুভাত রান্নার তদারকি করছেন। মধুভাত হলো চট্টগ্রামের একটা বিশেষ ধরনের নাস্তা স্বরূপ। কোন একসময় আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, ‘মধুভাত আমার খুব প্রিয়, বিদেশে এটা আমরা পাই না’। পরদিন সকালবেলা ১০ই পৌষ খোশরোজ শরিফ উদযাপন উপলক্ষে রওজা শরিফ গোসল ও মাজারসমূহ জিয়ারত সেরে আমি যখন গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসি, তখন দেখলাম মা'জান নাস্তার টেবিলে মধুভাত নিয়ে আমাদের জন্য বসে আছেন। কতটা মমত্ববোধ থাকলে অন্য কাউকে দিয়ে মধুভাত রান্না না করিয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি নিজেই তদারকি করে মধুভাত তৈরি করেছেন। মা'জান স্বর্গীয় হাসি দিয়ে বললেন, “তোমরা তো মধুভাত পছন্দ করো, বিদেশে পাওনা, একটু খাও”। আমি দেখেছি যে, তাঁর শারীরিক অবস্থা তেমন সুস্থ নয়। এরপরেও তাঁর মধ্যে সেই স্বতস্ফূর্ত মমত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে, সেটি হচ্ছে, একদিন রওজা শরিফ জিয়ারত করে ভিতর বাড়িতে যাই মা'জানকে কদমবুচি করার জন্য। তাঁকে সালাম করার পর তিনি অসুস্থ শরীরে রান্নাঘরে গিয়ে খাদেমাদের নাস্তা দিতে বলে নিজে তদারকি করে তাদের দিয়ে টেবিলে নাস্তা আনিয়ে বসে থেকে নিশ্চিত করলেন যেন আমি ভালোমতো খাই।

আমরা বিদেশ থেকে দেশে গেলে মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর বাসায় যেতাম, রাতে থাকতাম। যখন চলে আসতাম তখন তিনি বলতেন, “বাবা তোমরা যাচ্ছ কেন? তোমরা থাকলে আমার খুশি লাগে”। এই যে মমত্ববোধ, এই যে দয়ার

বহিঃপ্রকাশ, এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আমি শতভাগ নিশ্চিত করে বলতে পারি আমার যে অভিজ্ঞতার কথা আমি বলছি তা শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রেই ঘটেনি, তাঁর সকল আত্মীস্বজন, আশেক-ভক্তগণ, পরিবারের সদস্যবর্গ, খেদমতকারী, একদিনের পরিচিতদের সঙ্গেও তাঁর আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সবসময় সহাস্যে খুশি মনে সমস্ত চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেছেন, সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন দরবারের শান-মানকে বাড়ানোর জন্যে, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর খেদমতে।

আজকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া হক মন্‌জিলের যে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান তার নেপথ্যের কারিগর হচ্ছেন উম্মুল আশেকীন। একদিন গাউসিয়া হক মন্‌জিলে পারিবারিক পরিসরে বিভিন্ন আলাপের এক পর্যায়ে মওলা হুজুর আর আমি বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর পবিত্র রওজা শরিফের সার্বিক সৌন্দর্য বর্ধনের কাজের পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। সে সময় আম্মাজান আমাদের সাথে এসে বসলেন এবং মনোযোগ সহকারে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের একজন অভিজ্ঞ আর্কিটেক্ট এর পরামর্শ নিতে বললেন। আজকে বিশ্বঅলি হক ভাণ্ডারীর পবিত্র রওজা শরিফের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখে যখন অভিভূত হই; আমরা হয়তো অনেকেই জানিনা এর নেপথ্যের কারিগর হচ্ছেন এক মহীয়সী নারী যাঁর প্রজ্ঞা, খোদায়ী জ্ঞান, অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং রেয়াজত দরবারের শান আজমতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। তাইতো মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের পবিত্র জানাযা শরিফে যথার্থই বলেছেন, “গাউসিয়া হক মন্‌জিল একটি প্রাতিষ্ঠানিক যে রূপ ধারণ করেছে, উম্মুল আশেকীন তার নেপথ্যের একজন মহান নির্মাতা হিসাবে কাজ করেছেন”।

বাবাজানের রিয়াজতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি দরবারের সকল অনুষ্ঠান সফলকাম করা, বাবাজানের সকল প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা, গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং বাবাজানের আদর্শকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার আলোকে সারাজীবন নিজেকে আত্মবিলীন করে গেছেন। মানবিক প্রেমাগ্নিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আশেকানদের কাছে টেনে নিতেন। বহুবার তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আশেকানদের সাথে দীর্ঘসময় ধরে সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। তিনি সকল নিষেধ অমান্য করে ভক্তদের সময় দিয়েছিলেন। তাদের

দুঃখ কষ্টের আরজি উপলব্ধি করে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেছেন। নিজের শারীরিক অসুস্থতাকে অবজ্ঞা করে মানব কল্যাণে নিয়োজিত থেকে মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ করে গেছেন।

মওলানা রুমীর একটি উক্তি: "Would you become a pilgrim on the road of love the first condition is that you make yourself humble as dust and ashes." বাংলা অনুবাদ হল, 'তুমি প্রেমিক হিসেবে পূণ্যযাত্রী হতে চাইলে নিজেকে বিনয়ী করে রাখ, ধুলোর সাথে নিজেকে মিশিয়ে রাখ'। এই মহান উক্তির নজির হিসেবে আম্মাজানের জীবন প্রণালী অবলোকনে পরিলক্ষিত হয় যে, সারাজীবন অনায়াসে রাজরানী হয়ে সিংহাসনে বসে থাকতে পারতেন; কিন্তু সেই চেতনাকে পরিহার করে তিনি নিজেকে বিনয়ী করে রেখেছেন এবং মানবতার কল্যাণে আত্মনিবেদন করেছেন।

আমার মায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ননদ-ভাবীর। তবুও তিনি শ্রদ্ধার সাথে আম্মাকে 'বুবু' বলে সম্বোধন করতেন। একদিন দুপুরবেলা খাওয়ার পরে মওলা হুজুরের বাসায় মামী আমার আম্মাকে একই বিছানায় ঘুমানোর জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন। আমার আম্মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কোন রকমে বুঝিয়ে মামীকে রুমে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর কৌতুহলবশতঃ আমি আম্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম, কেন তিনি উম্মুল আশেকীনের পাশে বিছানায় শয়ন করেননি। আম্মা বললেন, "তুমি কি জাননা তিনি কে? ঘুমের মাঝে ভুলক্রমে আমার পা যদি তাঁর শরীরে লাগে তাহলে আমার দুনিয়া ও আখিরাত দুজাহান শেষ হয়ে যাবে"। একজন উচ্চ মর্যাদাশীল বেহেশ্‌তি জননী হয়েও উম্মুল আশেকীন আমাদের মাঝে সাধারণ হয়েছিলেন। সিংহাসনের মালিক হয়েও একজন খাদেমার ন্যায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর রিয়াজত-সাধনা মানবিক কর্মকান্ডের চূড়ান্ত পুরস্কার শাহানশাহ্ বাবাজান যথাযথভাবে মর্যাদার সাথে তাঁকে প্রদান করেছেন। মহান ২৬শে আশ্বিন, যে দিন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী নিজে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়েছেন; সেই মহান দিনের সাথে খুব বেশি ব্যবধান না রেখে উম্মুল আশেকীন প্রাণপ্রিয় আম্মাজানকেও আল্লাহ্‌র সংস্পর্শে নিয়ে যান। আমার বিশ্বাস এটা হচ্ছে উম্মুল আশেকীনের প্রতি শাহানশাহ্ বাবাজানের একাত্মতার স্বীকৃতি।

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ জানাই আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শ এবং দরবারের খেদমতের সাথে

নিজেদের একাত্ম করে নিতে পারি। সাথে সাথে মওলা হুজুরের সাথে সুর মিলিয়ে আমাদের প্রার্থনা– "এই মমতাময়ী মায়ের মায়া-ছায়া যেন কেয়ামত্ তক আমাদের উপর জারী থাকে"। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের এ প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করুন।

প্রফেসর হুমায়ুন মুর্শেদ

লিডিং এডুকেশন প্রফেশনাল

ইউএনএসডব্লিউ গ্লোবাল

ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া

পরিবার

আমার আম্মা – কিংবদন্তির আম্মাজান

ভূ-স্বামী বাবার ঘর হতে কনিষ্ঠ কন্যাটি যখন মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অসাধারণ একটি সাংসারিক কাঠামোতে প্রবেশ করলো তখনও তাঁর চমকিত হওয়ার বাকি ছিল। সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ আপন ভোলা মগ্নচিত্ত একজন পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে আবিষ্কার করাটা তাঁর জীবন এবং জীবনবোধকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল নিঃসন্দেহে। এই অসাধারণ জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে তাঁর পরিবার দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও আমরা বিস্ময়চিত্তে লক্ষ্য করি যে মোসাম্মত মুনাওয়ারা বেগম ইতোমধ্যে এই মগ্নচিত্ত পুরুষটি এবং এই অসাধারণ পরিবারটির জমিনে তাঁর মনের নোঙরটি শক্ত করে গেঁথে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। এই নোঙরটি, যতই দিন গিয়েছে, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার শিক্ষা, আদর্শ, সংস্কৃতির সাথে আরো নিবিড় হয়েছে, যা তিনি আমৃত্যু ধারণ করেছেন। সন্তানরা যে যার মতো জীবনের পথে চলে গিয়েছে, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও দরবারের জমিন ছেড়ে অন্য কোনখানে যাওয়া বা থাকাকে পছন্দ করেননি। কোথাও যেতে হলেও দ্রুততম সময়ের মধ্যেই তিনি আবার ফিরে এসেছেন ‘হক মন্‌জিলে’।

স্নেহ নিম্নগামী, পড়েছি, শুনেছি, বুঝিনি। সন্তানের অদর্শনে হৃদয়ের খাঁ খাঁ করা হাহাকার, আদর স্নেহ দেয়ার দুর্দমনীয় লোভ কেমন তা বুঝিনি। যখন আমার রক্তধারা প্রবাহিত হলো, ভবিষ্যতের পানে তখন সেই হৃদয়ে মোচড় দেয়া রক্তের ডাক, স্নেহের অনুভূতির দেনা-পাওনার সেই নাগাল পেলাম। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকানির মতো ভাবনায় এসে গেল, আমার আম্মাতো এই শূন্যতা মেনে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন অবলীলায়। নিজের স্নেহের ধন যারা, তাদের সাথে থেকে স্বর্গীয় আনন্দের ধারায় স্নাত করার অপার্থিব মায়াকে ত্যাগ করেছেন। চিরাচরিত এই মানবিক অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে দরবারের খেদমতের নৈতিক, আধ্যাত্মিক চেতনাকে অগ্রগণ্য করেছেন।

ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে দরবারের প্রয়োজনে তুচ্ছজ্ঞান করে আমার আম্মা হয়ে উঠেছেন ‘আম্মাজান’। নিজের স্বার্থ, নিজের সাধ, নিজের প্রয়োজন, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দেয়া, পরিত্যাগ করাটা তাঁর জীবনে সহজাত হয়ে উঠেছিল। ত্যাগের এই শক্তি ছিল তাঁরই স্বামী সর্বস্বত্যাগী খোদাপ্রেমে বিভোর শাহানশাহ্ বাবাজানের রূহানী তাসার্‌রুফাত-এর প্রতিক্রিয়া।

ভক্তি, ত্যাগ, নৈতিকতা, সংগ্রাম, সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠার এক বিরল উদাহরণ আম্মার জীবন। তিনি সেই ব্যক্তিত্ব যিনি কৃচ্ছ্রতা সাধনের প্রয়োজনে সন্তানদের মাছ এবং মাংস একবেলায় পরিবেশন করতেন না। আবার দরবারের প্রয়োজনে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বেও আড়াই লাখ টাকা দরে পুকুরের অংশ কিনতে দ্বিধা করেননি। দরবারের ভবিষ্যতকে নিরুপদ্রব করার জন্য সদর-অন্দরের সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করেছেন অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে। পতি-অন্তঃপ্রাণ আম্মা নিজের সমস্ত দুঃখ ও চাওয়া-পাওয়াকে চাপা দিয়ে হাসিমুখে সন্তানদের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। মন্‌জিল গঠনের প্রতিটি কাজে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছেন। অক্লান্তভাবে দরবারে আগত মেহমানদের খেদমত করেছেন। দরবারের জন্য নিঃস্বার্থ আত্মবিলয়ের ক্ল্যাসিক, ঐতিহাসিক উদাহরণগুলোর মধ্যে এটি মহাগুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। সহজাতভাবে তিনি সহজ সরল ছিলেন, দুনিয়া তাঁর ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ততটুকুই দুনিয়া করেছেন, যতটুকু দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন। এমনকি কারো জন্য ক্ষতির শিকার হলেও কখনো কারো সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য, কটু-কাটব্য করতে আমরা শুনিনি। শাহানশাহ্ বাবাজানের উপর অগাধ ভক্তি বিশ্বাস তাঁকে সমস্ত আপাত সাধ্যাতীত কাজ সমাধানে শক্তি যুগিয়েছে।

দুনিয়াবী অর্থে মুরুব্বিহীন হয়েও মুরুব্বিয়ানা করেছেন অত্যন্ত কুশলতার সাথে। সন্তানের পড়ালেখা, সুযোগ-সুবিধা, বিয়ে-শাদী সবকিছুই দরবারে অবস্থান করেই অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সম্পাদন করেন। অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়েও তাঁর এই কর্তব্যনিষ্ঠ অবদান অশ্রুসিক্ত নয়নে স্মরণ করতে হবে সকলকে সারাজীবন। অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর নৈতিক জীবনকে, তাঁর আধ্যাত্মিকময় দুনিয়াবী কর্মকান্ডকে আম্মাজান গভীরভাবে অনুসরণ করতেন। তিনি দুনিয়ার হায়াতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর পরামর্শে এবং আদর্শেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেছেন। অছিয়ে গাউসুল আযম যে সংগ্রামশীল সুনেতৃত্বের সফলতার পয়গাম আমাদের দিয়েছেন তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ আম্মাজান।

অপার্থিব ঐশি আলোর জীবনসঙ্গিনীও আলোকস্নাত হবেন তাই স্বাভাবিক – আম্মাজান ছিলেন তাই।

আলোকস্নাত এই অন্তর্জগতের কারণে শাহানশাহ্ বাবাজানের পার্থিব জীবন সমাপনীর জন্য আম্মাজানের কাছ হতে অনুমতির অলৌকিক প্রয়োজন হয়েছিল। শাহানশাহ্ বাবাজানের বেচালের একমাস পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, এক অলৌকিক পুরুষ এসেছেন তাঁর কাছে তাঁর অনুমতির জন্য। শাহানশাহ্ বাবাজানকে পারলৌকিক জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ঘটনা তিনি পরিবারের সবাইকে বলেন এবং আমাদেরকে বাবাজানের বিদায়ের জন্য প্রস্তুত করেন।

আম্মাজানের খেদমত যে দরবারে কবুল হয়েছে তা ২৬শে আশ্বিনের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর ওফাতের ভেতর দিয়ে এবং লক্ষ আশেক-ভক্তের রোনাজারিপূর্ণ উপস্থিতির মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। কোন মহিলার এতবড় জানাযা স্মরণকালে কেউ দেখেনি। ফেরেশ্তারাও নিশ্চয় সামিল ছিলেন সেই জানাযা শরিফে।

আমরা জানি আম্মাজানের বিদায়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ইতিহাসে একটি যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পথ ধরে অসংখ্য আশেক-ভক্ত এই পৃথিবীকে আলোকময় স্থানে পরিণত করুন এই কামনা করছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
উম্মুল আশেকীন-এর পুত্র সন্তান

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী (রহ.) অগণিত নারীর আলোকবর্তিকা

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ক্লিফটন গ্রুপের অন্যতম স্বত্বাধিকারী জনাব জালাল সাহেবের মাধ্যমে আমাদের পুরো পরিবারকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আমন্ত্রণ জানানো হয় ১৯৯৭ সালের কোন এক সময়। তিনি সম্পর্কে আমার চাচা হন। এটিই ছিল প্রথম আমন্ত্রণ। পরিবারের সবাই এই দাওয়াতে যাওয়ার কথা ছিল প্রস্তুতিও ছিল, কিন্তু সর্বশেষ আমি এবং আমার আম্মা আমরা দুজন দরবার শরিফে যাই। পরিবারের সবার প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কাকতালীয়ভাবে আর কেউ যেতে পারেননি আমাদের সাথে। মনে হয় মহান খোদা তা'য়ালার ইচ্ছা তাই ছিল। আমার পরম সৌভাগ্য! আলহামদুলিল্লাহ্।

তীর্থভূমি দরবার শরিফের দিকে যতই যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল ততই আমার মন প্রসারিত হচ্ছে খোদা তায়ালার দিকে। দরবার শরিফ পৌঁছানোর পর হক মন্‌জিলের ভিতর বাড়িতে ওযু করে পবিত্রতা অর্জন করার পর মনে হচ্ছিল আমার সারা জীবন একেবারেই পবিত্রতা অর্জন করে নিয়েছে। মন ভীষণ হালকা হয়ে গিয়েছিল। হৃদয়টা শিউরে উঠেছিল। আমার শ্বশুর বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র রওজা পাকে প্রবেশ করে যিয়ারত করতে লাগলাম। মাযারের সুগন্ধি, যিয়ারত কারীদের কান্নার শব্দ, শান্ত পরিবেশ, পাখির পবিত্র কণ্ঠে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসার ডাক। মাযারের তাসার্‌রুফাতে আমার অন্তর মোমের মতো গলে যায়। মন বলেছিল চিরচেনা মহান ব্যক্তির সাথে পুনঃদেখা হতে চলেছে। পরম আত্মা যেন আমাকে ডাকছে। এরই মাঝে মনে পড়ল আমার বাবা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজসেবক মরহুম আলহাজ সেকান্দর হোসেন মিয়া, দাদা ইব্রাহিম মিয়া ও দাদী জাহানারা বেগম এর কথা। কিছু সময়ের জন্য থমকে গেলাম। নিরব হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছিল এটি আমার বাবার সমাধি। অজান্তেই চোখের কোণে জল ছল ছল করছিলো। উল্লেখ্য আমার বাবা, দাদা, দাদী আল্লাহ্‌র মহান অলী বুজুর্গদের ভক্ত ছিলেন।

যিয়ারত শেষ করে আমি আর আমার আম্মা ভিতর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম আর চারদিকে প্রাণভরে দেখছিলাম। মনোমুগ্ধকর অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। যেন

বেহেশ্‌তি সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আর হৃদয়ে জায়গা করে নিচ্ছিল নিজের অজান্তে। ভিতর বাড়িতে যাওয়ার পর পরিচয় দেওয়াতেই খবর দেওয়া হলো বাড়ির মালিককে। সাথে সাথেই উপস্থিত উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী (রহ.)।

রূপবতী ও মায়াবী চেহারার মহীয়সী এই মহান নারী আমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পাশে বসালেন। তাঁর কথামালার শব্দচয়নে আছে অন্তহীন গভীরতা। প্রত্যেকটা শব্দে যেন মুক্তো ঝড়ে। মনে হচ্ছিল অনেক পুরোনো পরিচয় আমাদের। আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, আতিথেয়তায় আমরা মা-মেয়ে দুজনই যেন তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছি। সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছি সেবিকা, স্বজন, মেহমান কিংবা যিয়ারতকারী মহিলা ভক্তদের সাথে একই শব্দচয়নে, একই স্বরে, একই বাচনভঙ্গিতে কথা বলার দৃশ্য দেখে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত রাবেয়া বসরি (রহ.)'র মতো বহুগুণের অধিকারী একজন মহান নারী। তাঁর ব্যক্তিত্বে যেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকটি মানুষই যেন তাঁকে আপন ভেবে সুখ-দুঃখ সবকিছু তাঁর চরণে অর্পণ করে। সবাই সম্বোধন করে 'আম্মাজান' বলে।

তাঁর গুণই বলে দিচ্ছিল এই সম্মান তাঁরই। জীবনে এই প্রথম মনে হয় এমন একজন পবিত্র নারী দেখেছি। বড় আকাঙ্খা ছিল আমিও যদি একটু 'আম্মাজান' ডাকতে পারতাম। ঠিক বছর খানেক পরই পরম সৌভাগ্যক্রমে আম্মাজানই হয়েছেন আমার শাশুড়ি আম্মা। আল্লাহ্ আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান গাউসিয়া হক মন্‌জিল এর সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী এর সাথে ১৯৯৯ সালে আমার শাদী সম্পন্ন হয়। সেদিন আমি আমার এক মায়ের কাছ থেকে আরেক আপন মায়ের সান্নিধ্যে আসি। মহান স্রষ্টার এই দয়ার শুকরিয়ার অন্ত নেই। আমাকে স্বর্গীয় এক জগতে এনে তিনি ঠাঁই দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের পরই আমার আম্মার সাথে পথ চলা, আর আম্মা হয়ে যান আমার মহান শিক্ষক। শ্রদ্ধেয় আম্মা আমাকে ঘরের বউ হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিতেন। দরবারে আগত মহিলা মেহমানদের আপ্যায়ন, কথা-বার্তা বলা থেকে শুরু করে সন্তান লালন-পালন কিভাবে করতে হবে তা

শিখিয়েছেন। কোন মুহূর্তে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিতেন। সন্তানকে সুনাগরিক হয়েও হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শে জীবন গড়ে তোলার মহান প্রশিক্ষক হচ্ছেন আম্মা। একজন আদর্শবান সন্তান গঠনে আম্মা হচ্ছেন অগণিত নারীর আলোকবর্তিকা।

তিনি আমাকে সব সময় কঠিন সময়ে ধৈর্য্য ধরে আল্লাহ্‌র উপর রুজু থাকতে বলতেন। আম্মার সান্নিধ্যে যতদিন ছিলাম, প্রায় প্রতিদিন নতুন কিছু না কিছু শিখেছি। তাঁর কাছ থেকে আমি এমন অনেক কাজ দেখেছি, অনেক আদর্শ শিখেছি, যা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে সারা জীবন।

বউ হয়ে যখন তাঁদের পরিবারে আমার আগমন ঘটে, স্বাভাবিকভাবে তখন একটা নতুন পরিবেশে, আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম বিশাল পরিবারের নতুন সদস্যদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া অত সহজ কাজ ছিলো না। আম্মা আমাকে এই পরিবারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে অনেক সহযোগিতা করেছেন, একদম বন্ধুর মত আম্মা আমার সাথে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আমাকে তাঁর নিজের মত করে গড়ে তুলেছেন। বিশেষ করে দরবারের পরিমণ্ডলের বিশাল এই আধ্যাত্মিক ভূমিতে আমাকে শতভাগ মানিয়ে নিতে আম্মার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তা কখনো ভুলার মত নয়।

আমাকে দরবার বুঝার জন্য, দরবারের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার জন্য, দরবারের বিশ্বজনীন যে বার্তা তা একেবারে হাতে কলমে আম্মার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। একটা চিরন্তন সত্য কথা যে আম্মার সান্নিধ্য যদি আমি না পেতাম, তাহলে মহাসাগর রূপী এই পরিমণ্ডলে বিচরণ করা আমার জন্য অনেক কষ্টসাধ্য একটা কাজ হত।

আম্মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক একজন পরহেজগার মহিলা। নিয়মিত নামায আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, দরূদ শরিফ পাঠ, মিলাদ পড়াসহ অন্যান্য নফল ইবাদতে আম্মা ছিলেন বেশ যত্নশীল। আম্মা একা নয়, তিনি আমাদের সবাইকেই তাঁর খাদেমা মহিলা, নাতি-নাতনিদেরকেও ধর্মীয় আচার পালনে খুব কড়া নির্দেশ দিতেন এবং নিয়মিত দেখভাল করতেন।

আম্মা একটা জিনিস খুব খেয়াল রাখতেন যে, তিনি দরবারের আওলাদের স্ত্রী। তাই আম্মা তাঁর জীবনাচারের প্রতিটি পদক্ষেপে দরবারী আবহ ধরে রাখতেন। দরবারের প্রতি তাঁর এতো বেশি টান ছিলো যে, দরবার ছাড়া এক রাতও বাইরে অবস্থান করতে চাইতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে থাকলে তাঁর ধ্যান, জ্ঞান,

মন এই দরবারেই পড়ে থাকতো। দরবারের আশে পাশে কোন মাহ্ফিল হলে তিনি রাত জেগে সেই মাহ্ফিল শুনতেন। অনেক সময় মাহ্ফিল শুনে কাঁদতেন। আম্মা শেষের দিকে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে তাঁকে শহরে চিকিৎসার জন্য আনা হতো। চিকিৎসা শেষে আবারো দরবারে নিয়ে আসতে হতো। একটা সময় চিকিৎসার প্রয়োজনে ঘনঘন শহরে আনা নেয়া করাতে আম্মার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আমরা তাঁকে শহরের বাসায় রেখে চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চাইলে তাতে তিনি চরম আপত্তি জানান। তিনি শহরে থাকতে চাইতেন না। আমাদেরকে জোর করতেন, যেন তাঁকে দরবারে নিয়ে যাই। পরবর্তীতে যখন শহরেই থেকে যেতে হয়েছে, তখন প্রতিদিন আম্মা ভিডিও কলে দরবারের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখতেন, আর চোখের পানি ফেলতেন। দরবারকে তিনি অন্তরের গভীরে ঠাঁই দিয়েছেন। আত্মার এই মেলবন্ধন থেকে তিনি ছিন্ন হলেই অনেক অস্থির হয়ে যেতেন।

আম্মার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর কাছে আসা আশেক-ভক্তরা তাঁকে কিছু বলার আগেই অদ্ভুতভাবে বুঝে ফেলতেন। মানুষের মনের কথা বুঝার জন্য একটা সুন্দর মন-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ হতে হয়। মানুষকে ভালবাসতে হয়, আপন করে নিতে হয়। যে কাজটা আম্মা অত্যন্ত সুন্দর করেই করতে পেরেছেন। মাঝে মধ্যে কোন কারণে আমার মন খারাপ হলে আমি আম্মার সামনে হাসিমুখে স্বাভাবিক বাচনভঙ্গী করলেও, তিনি বুঝে যেতেন আমার মন খারাপ। এই সময় আম্মা আমাকে কাছে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে মমতাভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতেন আর আদর করতেন। মন খারাপ হলেও, আম্মা তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দিতেন না। তিনি আশেক-ভক্তের আম্মা শুধু নন, তিনি ছিলেন অশান্ত অস্থির মনের প্রশান্তির এক নিরাপদ ঠিকানা।

আম্মা যখন আমার শ্বশুর শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দরবারে আসেন, তখন থেকে শুরু হয় আম্মার কঠিন পথচলা। কারণ শাহানশাহ্ বাবাজান দুনিয়ার ভাব-বিভোরমুক্ত এক ঐশী মহামানব। যার জন্য তিনি খুব একটা সংসারে মনোযোগ দিতেন না। অথচ বিশাল একটা পরিবারের বড় বউ হয়ে এক প্রকার একাই সবকিছু সামলাতে হয়েছে আম্মাকে। মন্জিল দেখাশোনা, সন্তানদের পড়াশোনা, আশেক-ভক্তদের সুবিধা অসুবিধা দেখভাল করাসহ প্রায় সব কাজ তিনি একাই করে গেছেন। এর মধ্যে শাহানশাহ্ বাবাজানের অস্বাভাবিক আচরণ, বাবাজানের

খাবারের ঠিক নেই, ঘুমানোর কোন সময়ের ঠিক ছিলো না, হঠাৎ করেই বাইরে চলে যাওয়া, দিনের পর দিন দরজা বন্ধ করে রুমে অবস্থান করাসহ এই রকম অজস্র সমস্যা, কষ্ট আর ভীষণ রকম চাপ সত্ত্বেও আম্মা তিল পরিমাণ মন খারাপ করতেন না। বরং তিনি এসবকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব মনে করে ইবাদত হিসেবে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। আম্মার শ্বশুর এবং শাশুড়ি এই সময় আম্মার পাশে থেকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি থেকে অনেক আদর যত্ন পেয়েছেন। যার জন্য আম্মা তাঁদের উপর বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন এবং সবসময় তাঁদের কথা বলতেন।

বাবাজানের অধিক মাত্রায় আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণের জন্য বাবাজানকে এক সময় অনেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন বলতে থাকেন। বিভিন্ন শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধ ও পরামর্শে দাদা হুজুর অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করান। কিন্তু আম্মা তা মানতেন না এবং বিশ্বাসও করতেন না। তিনি মনেপ্রাণে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শাহানশাহ্ বাবাজান আল্লাহ্র মহান অলি। মূল কথা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আম্মার অন্তরে সেই ঐশী প্রেম দিয়েছেন বলেই, শাহানশাহ্ বাবাজানের ব্যাপারে উচ্চমার্গীয় ধারণা পোষণ করেই তিনি ঈমানী বিশ্বাস নিয়ে বলেছেন, শাহানশাহ্ বাবাজান আল্লাহ্র অলি। আলহামদুলিল্লাহ্।

১৯৮৮ সালে বাবাজানের ওফাত এর পর গাউসিয়া হক মন্জিল এর জন্য এক কঠিনতম সময় আসে, তাঁর সন্তানেরা সবাই ছিলেন ছোট, দায়িত্ব নেয়ার মত অবস্থান কারোরই ছিলো না। একজন স্ত্রীর জন্য এর থেকে দুঃসহ কোন স্মৃতি থাকতে পারে না। কিন্তু আম্মা এই পরিস্থিতিতেও দৃঢ় থেকেছেন, ধৈর্য্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর ৬ সন্তানকে দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়িয়ে সুশিক্ষিত ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি ৫ মেয়েকে চট্টগ্রামের স্বনামধন্য পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন। আমার স্বামী হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীকে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আদর্শবান সৈনিক হিসেবে তৈরি করেছেন।

বাবাজানের রওজা শরিফ নির্মাণের মত ব্যয়বহুল প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। আজ এই রওজা শরিফ এশিয়ার অন্যতম

স্থাপত্যশিল্প হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের আওতাভুক্ত ‘শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট’ এর মাধ্যমে অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মানব উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান হাজারো সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আস্থার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে দেশব্যাপি বেশ নাম কুড়িয়েছে। এ মন্‌জিলে এখন মেহমানদের অবস্থান ও আপ্যায়নের জন্য কত উন্নত ব্যবস্থা।

নারী ও শিশুদের আলাদা অবস্থানের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। রয়েছে বিশাল মাঠ। যেখানে প্রতি জুমাবার হাজার হাজার মুসল্লি জুমার নামায আদায় করেন। আম্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর যুগোপযোগী পদক্ষেপ এর জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন জায়গায় পরিণত হয়েছে গাউসিয়া হক মন্‌জিল। এখানে মানুষ আসে স্বর্গীয় সুধা নিতে, শান্তি অন্বেষণ ও কল্যাণের প্রত্যাশায়। চারিদিক সাজানো এবং গোছানো এই স্থানে আসলেই যে কারো মন জুড়িয়ে যাবে। লক্ষ আশেক ভক্তদের জন্য নিরাপদ ও প্রশান্তির নীড় এই গাউসিয়া হক মন্‌জিল একটা কঠিন সময় পার করে আজকের আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গাউসিয়া হক মন্‌জিল রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংগ্রামী এই মহীয়সী নারীর অসামান্য ত্যাগ, দৃঢ়তা আর মেধাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে।

তাঁর ৫ মেয়ে আর ১ ছেলের সম্পর্ক এক কথায় অসাধারণ। অনন্য এই সম্পর্ক নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাসের কোটা পূরণ হতে আরো বেশ খানিক সময় লেগে যেতো। রাসুলে পাক (দ.) মায়ের সেবাযত্ন করার জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেই আলোকেই তারা মায়ের সেবা করেছেন। পৃথিবী এক দিকে আর মা এক দিকে। সন্তানরা সবাই সেই মায়ের দিকেই এগিয়ে গিয়েছেন। অনেক সময় দেখেছি, আমার মহান স্বামী হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী দরবারে আগত মেহমানদের সাক্ষাত দিচ্ছেন, তাঁর সাথে সাক্ষাত প্রার্থীদের দীর্ঘ লাইন। এ সময় ভেতর বাড়ি থেকে আম্মাজানের ডাক আসলেই তিনি বসা থেকে সোজা উঠেই আম্মার সাথে দেখা করতে ছুটে আসতেন। আম্মার সামান্য অসুস্থতার কথা শুনলেই শহর থেকে তাঁর মেয়েরা ছুটে আসতো। যেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) এর মায়ের প্রতি ভালবাসার অনন্য উদাহরণ।

একজনকে নিয়ে একটু আলাদাভাবে না বললে এই লিখাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তিনি হচ্ছেন আম্মার একমাত্র পুত্র সন্তান, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন ও মধ্যমণি, লক্ষ আশেকের প্রাণস্পন্দন, আমাদের পবিত্রতম অহংকার, আমার মহান স্বামী আলহাজ হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী। আম্মা আর আমার স্বামী তাদের মা সন্তানের সম্পর্ক হযরত মা ফাতিমা (রা.) আর তাঁর আদরের দুই দুলারা হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। এরা যেন একে অপরের পরিপূরক ও পরমাত্মা। দুইটা দেহে একটা প্রাণ। মায়ের কিছু হলে ছেলে অস্থির আবার ছেলের কিছু হলে মা অস্থির। শত ব্যস্ততা, কাজের চাপ যা থাকুক না কেন, মা-ছেলের ভালবাসা, যত্ন নেয়া, সার্বক্ষণিক পাশে থাকা, কিছুই বাধা হতো না। আম্মা বিশেষ যত্নে শাহানশাহ্ বাবাজানের রেখে যাওয়া রক্তের উত্তরাধিকার ও পবিত্র আমানতকে গড়ে তুলেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে নাম করা স্কুল কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। আম্মার কাছে আদর্শিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ছিল মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক, অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

আম্মা সব সময় দাদা হুজুরের আদর্শ ও কর্ম অনুসরণ করতেন। তিনি চেয়েছেন যেন তাঁর পুত্রও দাদা হুজুরের আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়েন। সেই লক্ষ্যে আম্মা তাঁর পুত্রকে সব সময় নির্দেশ দিতেন দাদা হুজুরের কাজকে অনুসরন করে চলতে। আজ আম্মার স্বপ্ন পূরণ করেছেন তাঁর সন্তান। সারা বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল হিসেবে আজ আম্মার গর্বিত সন্তানের বেশ খ্যাতি রয়েছে। তাঁকে তিলে তিলে প্রতিষ্ঠিত করতে মায়ের ঘামঝড়া পরিশ্রম, ত্যাগ আর মূল্যবান সময় ব্যয়, আজকের মা জাতির কাছে অনুকরণীয় আদর্শ আর প্রেরণা হয়ে থাকবে। আম্মার গড়ে তোলা এই মানুষটি আজ লক্ষ আশেকের ভালবাসার পাত্র। তিনি 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট'এর মত মানবিক প্রতিষ্ঠান করেছেন। যার কর্মে-আদর্শে ক্রমেই ফুটে উঠছে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বিশ্বজনীন ত্বরিকার নির্যাস। যিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজের সূচিতে রাখেন মানুষের কল্যাণমুখী নানা কর্মসূচি। আড়ালে থেকে কোটি কোটি টাকা এই ট্রাস্ট এর মাধ্যমে বিলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর

কল্যাণমুখী এই কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণী পেশার মানুষ।

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের যেকোন ছোট-বড় সিদ্ধান্ত আম্মার সাথে পরামর্শ করে নিতেন। রওজা শরিফের মার্বেল পাথর কোন ডিজাইনের হবে, ফ্যানের কালার কি হবে, দেয়ালের রংয়ের কালার কি হবে, কি গাছ লাগালে সুন্দর হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্তই আম্মার সাথে বসে করতেন। পরিপাটি সুন্দর মনোমুগ্ধকর গাউসিয়া হক মন্‌জিলের প্রতিটি ইট নির্বাচনে ছিলো মায়ের মতামত।

দাদী-নানী হিসেবে আম্মা ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর মেয়ের ঘরের হোক বা ছেলের ঘরের নাতি-নাতনি কেউ তাঁর কাছে আলাদা ছিলো না। সবাইকে সমানভাবে স্নেহ করতেন। নাতি-নাতনিদের ছাড়া আম্মা খাবার গ্রহণ করতেন না। আমার সন্তানরা যখন শহরে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন আম্মা নিয়মিত ফোন করতেন, ভিডিও কলে কথা বলতেন। নাতি-নাতনিদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। তাদের ভালমন্দ খবর রাখতেন। আমাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন যেন তাদের যত্নের কোন কমতি না হয়। ছোটবেলা থেকেই নাতি-নাতনিদের প্রতি আম্মা এতোবেশি যত্নশীল ছিলেন যে, আমাদের এটা নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করতে হতো না। আর তাঁর প্রতিটা নাতি-নাতনি তাঁকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। দূরে কোথাও থেকে আসলে দৌঁড়ে আম্মার বুকের উপর ঝাপ দিতেন। এ সময় একে অপরের মাঝে এমন একটা পরিবেশ বিরাজ করতো যে, মনে হতো কত বছর পর তাদের দেখা হয়েছে। হৃদ্যতাপূর্ণ এই সম্পর্ক যেন হযরত ইমাম হাসান-হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) ও রাসুলে পাক (দ.) এর নানা-নাতির পবিত্র সম্পর্ককে মনে করিয়ে দেয়।

তিনি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর শ্বশুর বাড়ির শাহানশাহ্ বাবাজানের ভাই-বোন, তাদের স্ত্রী সন্তানদের সাথে ছিলো দারুণ সু-সম্পর্ক। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের কোন অনুষ্ঠানাদি পালন করা হলে বা পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান হলে সবার আগে তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। ভেতর বাড়িতে তাঁর শ্বশুর বাড়ি থেকে কেউ আসলে, আম্মার মধ্যে তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত, আন্তরিকভাবে সবার সাথে কথা বলতেন, আদর আপ্যায়নে তিনি সবসময় একটু বেশিই যত্নবান থাকতেন। মেহমানরা যতক্ষণ অবস্থান করতেন, ততক্ষণ তাদের সাথে খুব হাসি-খুশিতে কথা বলতেন, সময় দিতেন।

তাঁর একটা রেওয়াজ হচ্ছে, বছরের দুই ঈদে অবশ্যই দাদাবাড়ি, চাচাদের বাড়ি সবাইকে যেতে হবে। আমরাও খুব আনন্দ সহকারে আমার চাচা শ্বশুরদেরকে ঈদের সালাম করতে যেতাম। এই কাজটা তিনি প্রতি বছর ঈদের দিনই করতেন। যত ব্যস্ত থাকি না কেন, ওখানে আমাদেরকে যেতেই হতো। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক পরিবার আছে, যারা নিঃস্ব-অসহায় আম্মা তাদের ব্যাপারে বিশেষ করে খবর রাখতেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহ দেয়া, অসুস্থ হলে ঔষধপত্র ক্রয়ে অর্থ সহায়তা দেয়া, লেখাপড়া করার জন্য অর্থ সহায়তা দেয়া, এইরকম অনেক কাজ তিনি গোপনে করতেন।

পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে আম্মা সবসময় ভাল ব্যবহার করতেন। তিনি কোন প্রতিনিধি মারফত প্রতিবেশীদের খবরাখবর নিতেন। নিজেদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানাতেন। এলাকার অসহায় পরিবারের মাঝে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সহায়তা দিতেন। আবার কোন পরিবারের ছোট মেয়েদের নিজের কাছে এনে বড় করে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়েও দিয়েছেন।

আশেক ভক্ত জায়েরীনদের জন্য আম্মা ছিলেন পবিত্র আত্মার আত্মীয়। দরবারের বাৎসরিক উরস অনুষ্ঠানে আগত মহিলা মেহমান জায়েরীনদের জন্য সবসময় তৎপর থাকতেন। তাদের অবস্থান, খাওয়া-দাওয়া-সুযোগ সুবিধার দিকে বেশ নজর রাখতেন আম্মা। দূর দুরান্ত থেকে আসা মেহমানদের জন্য বিশেষভাবে সুযোগ সুবিধা দিতেন। আম্মা সকল আশেকানদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। তাদের সবার সাথে ধৈর্য্য সহকারে সাক্ষাত করতেন। আম্মা সকল আশেকানদের কথা শুনতেন। অনেক আশেকান অসহায়ভাবে আম্মাকে তাদের কষ্টের কথা উপস্থাপন করতেন। আম্মা তাদের কথা শুনে খুব আফসোস করতেন।

যখন কারো কষ্টের কথা শুনতেন সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের কাছে রক্ষিত টাকা তিনি দিয়ে দিতেন। তিনি গরীব অসহায় আশেক ভক্তদের কি পরিমাণ টাকা দান করতেন তার কোন হিসেব রাখতেন না। আম্মার সাথে মানুষ এমনভাবে সব কথা বিনিময় করতেন, নিজের আপন কোন মানুষের সাথেও এভাবে কেউ মনের গোপন কথা বলে না। অনেক সময় তাঁর সন্তানের (আমার স্বামী) সাথে মহিলারা সাক্ষাত চাইলে আম্মার অনুরোধে তাদেরকে তিনি সাক্ষাত

দিতেন। আশেক ভক্তের কোন আবদার তিনি ফেলতেন না। সারাক্ষণ আশেক ভক্তদের সেবাযত্ন নিয়েই আম্মা তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। ভেতর বাড়িতে মেহমান, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, আশেক ভক্ত দেখলেই তিনি আনন্দিত হতেন। চোখে মুখে উচ্ছ্বাস এর ছাপ লক্ষ্য করা যেতো। রাসুলে পাক (দ.) এর অন্যতম পছন্দনীয় আমল ছিলো মেহমানদারী করা। আলহামদুলিল্লাহ্।

এতিমদের আম্মা নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন। তাঁর নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত 'উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্যখানা'র ছাত্রদের জন্য ভেতরবাড়ি থেকে উন্নতমানের খাবার পাঠাতেন। কোন এতিম ছাত্রের সঙ্গে আম্মার সাক্ষাৎ হলেই তাদেরকে তিনি অনেক আদর করতেন এবং খাবার খাওয়াতেন। এ ছাড়াও দরবারের বাৎসরিক অনুষ্ঠানাদিতে তাদের জন্য আলাদা করে সবকিছু ব্যবস্থা করে রাখতেন। এতিমদের সব বিষয়ে সার্বিক খোঁজখবর রাখতেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন "তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে (নিসা ৪/৩৬)"। ইসলাম ধর্মের শাশ্বত জীবন ব্যবস্থার আলোকেই আম্মা নিজেকে গড়ে তুলেছেন। উপরোক্ত কথা আর কুরআনের আয়াতই হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আম্মার অন্যতম লক্ষ্য ছিলো মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার যেন বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। সে লক্ষ্যেই আম্মা তাঁর সন্তানের সাথে কাজ করেছেন। মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রতিষ্ঠা, গবেষণা ও প্রকাশনা সেল গঠন, বই প্রকাশনা, আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ ট্রাস্ট এর নানান কর্মসূচিতে ছিলো আম্মার প্রচ্ছন্ন ভূমিকা। তাঁর সুফলও ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে সমগ্র বিশ্ব। আজ এ ত্বরিকার প্রচার-প্রসার বিশ্বব্যাপি হচ্ছে। সারা বিশ্বে এ ত্বরিকার অগণিত আশেক ভক্ত সৃষ্টি হচ্ছে। বহির্বিশ্বে শাহানশাহ্ বাবাজানের অনেক আশেক ছড়িয়ে পড়েছে।

আম্মা শুধু একজন দরবারি পুত্রবধূ বা শুধু দরবারের বিষয় জানেন তা কিন্তু না। তিনি দেশের সব বিষয় ও রাজনৈতিক খবরসহ বিশ্বের বিভিন্ন খবরা-খবর রাখতেন। নিয়মিত পত্রিকা পড়তেন। এক কথায় সব ব্যাপারে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন।

আম্মা গ্রামে বেড়ে উঠলেও শহরের আধুনিকতার ব্যাপারে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন। আম্মা খুব ভ্রমণপিয়াসী ছিলেন, সময় পেলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যেতেন। আমাকে ওমরা হজে নিয়ে গেছেন, সেখানে মক্কা, মদিনা জিয়ারত করেছেন, এ ছাড়াও চিকিৎসার জন্য ব্যাংককও ভ্রমণ করেছেন। মিয়ানমারের বিখ্যাত সব দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছেন। এছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন পর্যটন স্পট যেমন, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, বান্দরবান, রাঙ্গামাটিসহ দেশের প্রায় জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। আম্মা টিভি সেটের সামনে বসে জিওগ্রাফী চ্যানেলে, বিভিন্ন বন, জঙ্গল, পশু পাখি, নদী বন্দর, আকাশ, সমুদ্রের জলরাশির দৃশ্য দেখতেন, আর আমাদের বলতেন, দেখো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কত সুন্দর, কত অপরূপ। সুবহান আল্লাহ্‌।

আম্মার গুণাবলীর ব্যাপ্তিটা এতো বিশাল যে, তা সামান্য এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা কোনভাবে সম্ভব নয়। আমার অনুভূতি এমন গুণবতী নারী আমি জীবনেও দেখিনি। আমাদের পরম প্রিয় এই মানুষটি বিধাতার নিয়মেই ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র দিকেই ধাবিত হয়েছেন যে তার কোন আন্দাজই আমরা করতে পারিনি।

আম্মা যখন অসুস্থ হয়ে গেলেন, শেষ সময় হাসপাতালেই থাকতে হয়েছে। অসুস্থতার দরুন আম্মার স্মৃতিশক্তি সীমিত হতে থাকে। তিনি কাউকে ভাল করে চিনতে পারছিলেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁর সন্তান যখনই তাঁর সামনে উপস্থিত হতেন বা ওষুধ খেতে বলতেন, তিনি ওষুধ খেতেন আর তাঁর দিকে মায়ার নজরে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলতেন, এইতো আমার ছেলে, আমার বুকের ধন, আমার বাবাজান।

আম্মা হাসপাতালের বেডে সবসময় বলতেন 'এই আমার শ্বশুর (দাদা হুজুর) এসেছেন তাঁকে বসতে দাও' 'এই দেখো জেবুর (বড় আপা) বাবা এসেছেন (শাহানশাহ্ বাবাজান) তাঁকে বসতে দাও, চা দাও' 'আমার আব্বা-আম্মা

আসছে। এই সময় আম্মা বলতেন, আমার হাসান কই' ওকে ডাকো, বসতে বলো, সবাইকে চা নাস্তা দাও' সহ নানানরকম কথা বলতেন আর জিকির করতেন। তিনি অসুস্থতায় যখন খুব অস্থির হতেন, তখন কেউ তাঁকে থামাতে পারতো না। ডাক্তার, নার্স এবং আমরা সবাই তাঁকে থামাতে ব্যর্থ হতাম। তখন আম্মাকে দরবারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেই তিনি শান্ত হয়ে খাবার-দাবার-ঔষধ খেয়ে নিতেন। অনেক সময় তাঁর ছেলে উপস্থিত হলেই তিনি থেমে যেতেন। আর মায়ার নজরে তাকিয়ে থাকতেন। 'ও পুত' বলে আদরী কণ্ঠে কাছে ডাকতেন। এই সময় আম্মা তাঁর ছেলের সকল অনুরোধ অকপটে রাখতেন। কোনরকম অস্বাভাবিক আচরণ করতেন না।

আম্মাকে বলতে শুনেছি শাহানশাহ্ বাবাজান আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমাকে ডাকছেন তিনি। তাঁর ছেলেকে বলতেন 'ও পুত! আমি আর বাঁচবো না'। ভাবা যায়, এই সময় একজন ছেলের মনের অবস্থা কি হতে পারে? তারপরেও আম্মাকে তিনি বলতেন, আম্মা কিচ্ছু হবে না, ভাল হয়ে যাবেন। মায়ের এমন অন্তিম সময়ে কতটা কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে একজন সন্তানকে এমন সান্ত্বনাসুলভ কথা বলতে হয়, তা চোখে না দেখলে বুঝতে পারতাম না।

আমরা আবেগের জাতি, ভালোবাসার জাতি। ভালোবাসা ও হৃদ্যতায় জমে থাকা জীবন যখন একটি সময়ের শেষ বিন্দুতে থমকে দাঁড়ায় তখন অশ্রুসিক্ত আবেগময় বিদায় জানানো আমাদের তথা মানবজাতির চিরচেনা সংস্কৃতি। মানুষের জীবন নাতিদীর্ঘ। এ স্বল্প জীবনের নানা প্রবাহে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় আরো অন্যান্য জীবন এবং প্রতিটা সম্পৃক্ততায় সৃষ্টি হয় আবেগ ও ভালোবাসাময় স্মৃতির। এ স্মৃতির টানেই মানুষ কষ্ট পায় প্রিয়জনের হঠাৎ প্রস্থানে কিংবা অকাল প্রয়াণে, হৃদয়ের আঘাতে ক্রন্দনসিক্ত হয়। মানুষের প্রতি প্রিয়জনের এ টান, এ ভালোবাসা চিরায়ত ও শাশ্বত। তাই তো মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রিয়জন হারানোর শোকে। যে গৃহে কোনো মানুষ বিদায় নেয়, সে গৃহে নেমে আসে শোকের মাতম, আহাজারি আর গগনবিদারী আর্তচিৎকার। মৃত্যু অবধারিত, একদিন মৃত্যুর করাল গ্রাস সবাইকেই গ্রাস করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। এটা মহান রাব্বুল আলামিন-এর একটা শাশ্বত চিরায়ত নিয়ম। কিন্তু কিছু প্রিয় মানুষের বিদায় সত্যি বড়ই বেদনাদায়ক।

খুব অল্প বয়সে বাবাকে হারানোর পর মায়ের কাছেই বড় হওয়া। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক যে, বিয়ের পর শ্বশুর আব্বাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আপন গৃহ ছেড়ে মায়ের কাছ থেকে অন্য গৃহে এসে আর একজন মায়ের সাথে আমি স্বর্ণালী দিন পার করছিলাম। কিন্তু হায়! সেই মাও বিদায় নিলেন। মুহূর্তেই এক আলোকিত পরিবেশে নেমে এলো নিকষ কালো অন্ধকার।

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পরম প্রিয় অভিভাবক লক্ষ আশেকানদের রুহানী 'আম্মাজান' উম্মুল আশেকীন হযরত মুনওয়ারা বেগম (রহ.)'র পদধুলির অভাবে ভেতর বাড়ি এখন কাঁদছে। পিনপতন নীরবতার এই পরিবেশ আবার কবে ফিরে পাবে তার আপন ঔজ্জ্বল্যতা সেটা মহান মুনিবই ভালো জানেন। সেই মুনিবের দরবারে ফরিয়াদ!! আম্মার শিখিয়ে দেয়া আদর্শে যেন এই আঙ্গিনাকে আবারো পুরনো রূপে ফিরিয়ে আনতে পারি।
আমিন।

জেসমিন হাসান
উম্মুল আশেকীন-এর পুত্রবধূ

দাদু....আমার জীবনের আদর্শিক প্রতিচ্ছবি

আমার দাদু। যিনি আমার আত্মার অতি নিকটে অবস্থান করেন। দাদাভাইয়ের সান্নিধ্য না পাওয়া বা দাদাভাইয়ের আদর না পাওয়ার যে হতাশা আমাদের মধ্যে ছিল তা দাদু অনায়াসে মিটিয়ে দিয়েছেন। কখনো সে অভাব আমাদের মধ্যে আনতে দেননি। পরম মমতায় আমাদের সব সময় আগলে রেখেছেন অতি যত্নে, ভালবাসার চাদরে আমাদের এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখতেন, তা থেকে ছুটলেই, ভীষন মন খারাপ হত। আমাদের দাদু আছে মানে আমাদের কখনো দুঃখ, কষ্ট, হতাশা স্পর্শ করতে পারেনি। প্রতিটা সময় খুবই উচ্ছ্বসিতভাবে আমরা অতিবাহিত করেছি। দাদু আমার বা আমাদের হৃদয়জুড়ে অনাদিকাল বাস করবেন। দাদুকে অনেক ভালবাসি। দাদু নেই, দাদু এখন আল্লাহ্‌র মেহমান হয়ে পরপারে চলে গেছেন। দাদুর প্রস্থানের এ খবর কোনভাবে আমাকে বা আমাদেরকে স্থির হতে দিচ্ছে না। দাদুর প্রতিটি বাক্য, আমাদেরকে নিয়ে কাটানো দাদুর প্রতিটি সময়কে গভীরভাবে মনে পড়ছে। দাদুকে নিয়ে লেখাটা আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক।

আমার ছোট জীবন জুড়ে আমি দাদুকে একজন নিঃস্বার্থ আত্মপ্রবণ, আত্মত্যাগী এবং মহিয়সী মহিলা হিসেবে দেখেছি। যিনি তার সমগ্র জীবন মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিকতার পথে উৎসর্গ করেছিলেন। এই পবিত্র ভূমি, মাইজভাণ্ডার শরিফ, আমার দাদুবাড়ি। এ ভূমি লক্ষ লক্ষ দুঃখী, ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিষন্ন, বিষাদগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, মানুষের জন্য শান্তির আশ্রয়স্থল। এই পবিত্র ভূমির চারপাশে যা ঘটে তার প্রতি তিনি অবিরাম আবেগপ্রবণ ছিলেন। আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি তার একমাত্র আবেগ ছিল পরিবার, আব্বু, আম্মু, আমরা নাতি-নাতনি এবং সব ফুপ্পিরা।

আমরা শহরে থাকাকালীন তিনি দরবার শরিফ থেকে আমাদের জন্য মৌসুমী ফল, খাবার ও উপহার পাঠাতেন। সব সময় ফোনে খবর রাখতেন, কথা বলতেন, আমাদের নিয়ে গল্প বলতেন, গল্প শুনাতেন। দাদুবাড়ির সে পবিত্র ভূমিতে অবস্থান করলে আম গাছ এবং লিচুর বাগান আমাকে দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব এবং একজন প্রেমময় অভিভাবক আমার প্রিয় দাদুর কথা মনে করিয়ে দেয়। দাদু তার বংশধরদের জন্য খুব চিন্তা করতেন। দাদাভাইয়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ও

ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। তাঁর অস্তিত্বজুড়ে ছিল দাদা ভাইয়ের স্মৃতি। তিনি সেই ঐশ্বরিক আশীর্বাদে নোঙর করেছিলেন, যে নোঙর তিনি আজও তুলেননি। আমরা যখন থেকে শিখতে শুরু করি তখন থেকেই তিনি দাদাভাই সম্পর্কে গল্প বলতেন। মাইজভাণ্ডার শরিফের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। ভক্তদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অনন্য। তিনি সর্বদা ধৈর্য্য সহকারে আশেক ভক্তদের আর্জি খুব আন্তরিকতার সাথে শুনতেন এবং তিনি ধৈর্য্য সহকারে আশেক-ভক্তদের দীর্ঘ লাইন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতেন। তিনি আমাকে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ, সমবেদনা, ভালবাসা শিখিয়েছেন। পাশাপাশি দাদুর সংগ্রামময় জীবনের ইতিহাস বলেছেন এবং আমাদেরকেও শিখিয়েছেন। দাদু তাঁর ভালবাসা, আদর, যত্ন দিয়ে আমাদের এমনভাবে ঋণী করেছেন যা কখনও শোধ করা যাবে না। দাদু একজন প্রেমময় মহিয়সী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, দাদু আমার জীবনের আদর্শিক প্রতিচ্ছবি হয়ে বেঁচে থাকবেন.....ভালবাসি দাদু।

শাহ্‌জাদা সৈয়দ আহমদ মুনতাজির জিয়া
উম্মুল আশেকীন-এর ছেলের ঘরের নাতি

ফেরেশ্‌তাসুলভ সৌন্দর্যের অবয়ব

সম্মানিত সকল পাঠকের প্রতি সালাম। আমি আমার সুপ্রিয় দাদুর স্মৃতি – স্মরণ এবং সম্মানে এটি লিখছি।

তাঁর সুস্নিগ্ধ আলোময়তা এবং পরম মমতায় আমার বেড়ে ওঠা যেন এক স্বর্গীয় আশীর্বাদ। আমার দাদু একজন মেধাবী মহিলা। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, উপলব্ধি এবং উদ্ভাবিত নবধারার কারণে মাইজভাণ্ডার শরিফে তিনি একটি স্বতন্ত্র স্তম্ভ হিসেবে দীপ্যমান। সংসার জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় ধৈর্য্য-সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি যে আকর্ষনীয় সুন্দর স্বচ্ছ গতিময় জীবন গড়ে তুলেছিলেন তা আমার জন্যে এক সশ্রদ্ধ বিস্ময় জাগানিয়া বিষয়। বলা যায় তাঁর উদারতা এবং দয়া প্রত্যক্ষ করা ছিল আমাদের জন্যে সত্যিই এক ধরনের অবারিত সুযোগ। দাদু আমাদের ভালবাসতেন কল্পনাতীতভাবে। পার্থিব সকল প্রকার ঝুট ঝামেলা থেকে আমাদেরকে নিষ্ক্রান্ত রাখতেন এক অনন্য ছায়াদার হিসেবে। শুভ্র শ্বেতবাস ধারিনী দাদুর মধ্যে বিরাজ করত ফেরেশ্‌তাসুলভ সৌন্দর্য্যের অবয়ব।

তাঁর কোমল-শীতল হাতের পরশ এবং আমার চুলের উপর আঙ্গুল বুলানো আমাকে মোহিত করত। কোন কারণে কখনো আমাকে বেদনাহত দেখলে তিনি আমাকে গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁর এ ধরনের মর্মস্পর্শী আলিঙ্গন এখনো আমার হৃদয়ে তাড়না দেয়। যদিও তিনি সশরীরে আমাদের মাঝে নেই তবুও তাঁর উদ্দীপনাময় উপস্থিতি, হাস্যোজ্জ্বলতাকে আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান বলে অনুভব করি। তাঁর বুদ্ধি, বোধশক্তি অতুলনীয়। আমাদের বার্ষিক লুডু প্রতিযোগিতায় তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে অপরাজেয় হিসেবে কৌতুকপ্রদ ভাষায় হাস্য-রসের যোগান দিতেন। আমি নিজেও তাঁর সঙ্গে কৌতুক করতাম, হাস্য-রসের সৃষ্টি করতাম, আমি আমাদের পরম বন্ধুত্বকে হারিয়ে বেদনাহত। আমি সবসময় তাঁর, তিনিও একান্ত আমার। তিনি সর্বাবস্থায় আমার সঙ্গে আছেন। যখন আমি কোন সুন্দর দৃশ্য দেখি অথবা সূর্যালোক আমার অস্থিমজ্জায় অনুভূতি জাগায় তখন তিনি সর্বাবস্থায় আমার হৃদয়ে বিরাজিত হন। সস্নেহ ধারা এবং প্রশংসনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যখন নিকটবর্তী হই তখন আমি আমার দাদুর পরম নৈকট্যকে বিস্মিতভাবে অনুভব করি। আমি তাঁর মহিমায় নিজেকে বিদ্যমান দেখি এবং তাঁর মতোই পৃথিবীর বুকে কল্যাণময় কাজে নিবেদিত হবার স্বপ্ন দেখি।

শাহ্‌জাদী সৈয়দা নাফিসা মুনাওয়ারাহ্‌

উম্মুল আশেকীন-এর পুত্র সন্তানের বড় মেয়ে

আমার প্রিয় দাদু শীতল ছায়ায় পরম প্রশান্তি

কারো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কিছু লিখতে গেলে যে বুকে কাপন ধরে তা দাদুর জন্য কলম হাতে না নিলে তা কোনদিন অনুভব করতে পারতাম না। ছোট বেলা থেকেই দাদু ছিলেন আমার চলার পথের প্রিয় সাথী। দাদু ছিলেন সহানুভূতিশীল, শুদ্ধ চিন্তাশীল এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় মনোবলের এক মহিয়সী নারী। বিশেষ বিশেষণের অনন্য গুণাবলীর অধিকারী আমার দাদু। দাদুর মধ্যে এমন গুণাবলী দেখেছি যা আমি কারো মধ্যে দেখিনি। দাদুর সাথে আমার মূল্যবান কিছু সুখ-স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। শহরে অবস্থানের কারণে দাদুর সঙ্গ পেতাম না বলে মন অনেক খারাপ হয়ে যেতো, তাই প্রতিদিন দাদুর সাথে ভিডিও কলে কথা হতো। দাদুর সাথে দুষ্টুমির ছলে লুডু খেলেছি। দাদু তাঁর বিখ্যাত মাখন হালুয়া বানিয়ে আমাদের খাওয়াতেন। প্রায় প্রতিদিন দাদুর সাথে নানারকমের পাখি দেখা হত। দাদু খুব প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। তিনি কোথাও বেড়াতে গেলে সবুজ অরণ্য, হিমালয়ের মতো উচ্চতাসম্পন্ন পর্বত শ্রেণির দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

দাদুর সাথে আমার সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত হত, যখন কোথাও যেতাম ফিরে আসলে যখন দাদু আমাকে কোমলভাবে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতেন। এতে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা নিমিষেই ভুলিয়ে ফেলত। আমাদের প্রতি দাদুর ভালবাসা এবং উষ্ণতা, মমতাভরা আদর আমাদের হৃদয়কে আনন্দে উপচে দিত। তাঁর ভালবাসা, আদর, যত্নের কারণে দাদা ভাইয়ের অভাব তিনি আমাদের কোনদিন বুঝতে দেননি। দাদুর এই আন্তরিকতা, ভালবাসা, মমতা শুধুমাত্র তার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দাদুর সাথে সাক্ষাত করতে আসা অগণিত আশেক ভক্তদের প্রতিও ছিল অসীম আদরযত্ন।

দাদু যতই ক্লান্ত থাকুন না কেন তিনি ধৈর্য্য ধরে বসে আশেক ভক্তদের দুঃখ দুর্দশার কথা ও আর্জি শুনতেন। দাদু খুব সতর্কভাবে খেয়াল রাখতেন, কোন মেহমান যেন অভুক্ত অবস্থায় বা কষ্ট নিয়ে মাইজভাণ্ডার থেকে ফিরে না যায়। দাদু মানুষের কষ্টে খুব ব্যথিত হতেন। তিনি আশেক ভক্তদেরকে চাহিদামত দান করতেন। মন্‌জিলের ভেতর বাড়িতে অনেক গরিব মেয়েদের তিনি দেখেশুনে ভাল পরিবারে বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের আজকের শক্তভিত্তি ও সমৃদ্ধিতে দাদুর অবদান অসামান্য। এই মন্‌জিলের

প্রতিটি স্থানে দাদুর স্মৃতি জড়িত। তিনি এমন একজন আদর্শিক মহিয়সী নারী ছিলেন যিনি আমাদের সবাইকে সবসময় ভাল ব্যবহার করতে ও সবার সাথে ভাল আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করতেন। দাদু ছিলেন আমাদের বংশের জন্য বটবৃক্ষের ছায়া, শতপ্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি আমাদের শীতল ছায়ায় পরম প্রশান্তিতে রাখতেন। আমাদের প্রিয় দাদুর চলে যাওয়ায় আমাদের হৃদয়ে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তা কেবল তার সুন্দর স্মৃতি ধারণ করার মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারে। আমি দরবারে আসলে দাদুকে কোমলভাবে আর আলিঙ্গন করতে পারবো না, এই কথা কোনভাবেই আমি ধারণ করতে পারছিনা। আমার প্রত্যাশা, পরপারে ভাল থাকবেন দাদু।

শাহ্জাদী সৈয়দা মুনজারীন মুনাওয়ারা
উম্মুল আশেকীন-এর পুত্র সন্তানের ছোট মেয়ে

আমার মা

আমার মা সাংসারিক ছিলেন। সংসারের পাশাপাশি অন্যান্য কাজ অতীব নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপূর্ণভাবে করে গেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি যখন ছিলেন (দাদা, দাদী) তখন তাঁদের প্রতি দয়াশীল ও দায়িত্বশীল ছিলেন। যতটুকু তিনি পেরেছেন, তাঁর মধ্যে একনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বড়, তাঁর উপর দায়িত্ব আসলে তাঁকেই পালন করতে হবে, তা মাথায় রেখেই দায়িত্ব পালন করতেন। প্রয়োজনে বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে তা করতেন।

আমার মা জমিদারের মেয়ে ছিলেন। আমার নানা খুব আল্লাহ্ ভক্ত ছিলেন। যেহেতু নানা দরবারের ভক্ত-অনুরক্ত ছিলেন সেহেতু তাঁর মেয়েও সবসময় সেটা স্মরণ করতেন। আমার মা এই বিষয়টাকে লালন করে গেছেন।

আমার মা আর পাঁচ জন গৃহিনীর মতোই ছিলেন। অল্প বয়সে মা'র বিয়ে হয়েছে। বয়স বাড়তে বাড়তে তিনি যে ত্যাগগুলো স্বীকার করেছেন তা নিয়ে কোন দুঃখ ছিল না বরং খুশি ছিলেন। ওটা তাঁর একটা গুণ।

আমি যখন ছোট ছিলাম বাবাকে এত বেশি হালে থাকতে দেখিনি। আমার যতটুকু মনে পড়ে শুয়ে বসে থাকতেন নিজের রুমে। নিরিবিলিতে প্রায় সময় রুম বন্ধ অবস্থায় থাকতেন। তিনি গরমের মধ্যেও লেপ-তোষক নিয়ে ঘুমাতেন। এমনও দেখেছি সারাদিন সারারাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। গভীর রাতে পায়চারি করতেন ঘরে ঘরে। অনেকে বলতেন বাবা সংসার করে না। পিতা হিসাবে এটা করতেন না, ওটা করতেন না। আসলে তাঁর সব কাজই ছিল সংসারভিত্তিক। আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতেন। এটা সেটা কেনাকাটা করতেন। কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা সেটা দেখতেন। বাচ্চাদের আদর-যত্ন করতেন, কোলে নিতেন। তবে, এখানে পড়তে যাও বা ঐখানে যেও না, এরকম কোন আদেশ-নিষেধ করতেন না। আমরা ছোট ছিলাম, তত বুদ্ধি হয়নি, তারপরও আমরা তাঁর কথাগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতাম।

মা তো মা-ই। আম্মা একটা কথা বার বার বলতেন, 'তুমি ছেলে হলেও তুমি বড়, মেয়ে হলেও তুমি বড়, এটা সবসময় মনে রাখবে। তোমরা তোমাদের পরিবারের ইজ্জতের কথা চিন্তা করবে'। এই শিক্ষাগুলো তিনি অহরহ দিয়ে গেছেন। তিনি অনেক সময় অনেক কথা বলেছেন। আশেক-ভক্তের ব্যাপারে মা বলতেন, 'তারা হচ্ছেন দরবারে পাখি'। দরবারের দায়িত্বের ব্যাপারে আম্মা খুবই

যত্নবান ছিলেন। যেহেতু আম্মার ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছে, এ বাড়িতে এসেছেন সেহেতু এগুলো আম্মার জন্য কোন ব্যাপার ছিলনা, এগুলো আম্মার রক্তে ঢুকে গেছে। এগুলোকে আম্মা অগ্রাধিকার দিতেন। আম্মা কখনো এই কাজগুলো থেকে রেহাই পেতে চেয়েছেন, আমি কখনো দেখিনি। আমরা অনেক সময় বিরক্ত হয়েছি, আম্মা কখনো বিরক্ত হননি। আশেক-ভক্তদের ব্যাপারে আমাদের বলতেন, "বিরক্ত হয়োনা, তারা দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, আবার চলে যাবেন"।

হক মন্‌জিলে আসার পর আম্মা সারারাত কেঁদেছেন। আমরা তো ছোট ছিলাম – তখন এতকিছু আর বুঝতামনা। ঘুম আসছে, ঘুমিয়ে গেছি। দাদা আম্মাকে কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা, সংসার খরচ ইত্যাদির ব্যাপারে। তবে কিছুটা অনিশ্চয়তা তো ছিলই, বলতে গেলে তিনি নিজের সংগ্রাম নিজেই করেছেন।

আম্মা দান করতে পছন্দ করতেন। সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতেন।

আম্মা ধর্মপরায়ন ছিলেন। ধর্মপালন করতে আনন্দবোধ করতেন। তাঁর আব্বা পীর-মুর্শিদ ধরা লোক। আম্মা সেই ব্যাপারটা বুঝতেন এবং পালন করতে আনন্দবোধ করতেন।

হক মন্‌জিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আম্মার যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

আম্মার হস্তক্ষেপ, উৎসাহ সবক্ষেত্রে বিরাজমান ছিল। তাঁর উৎসাহেই সবকিছু হয়েছে। জীবনযাপনের সাথে সাথে দরবারের পরিধি বাড়বে, প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে – এটা তাঁর অনেক বড় স্বপ্ন ছিলো।

দাদী হিসেবে নাতি-নাতনিদের সাথে তাঁর খুবই মধুর সম্পর্ক ছিলো, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে, মজা করে কথা বলতেন। এটা তিনি খুব উপভোগ করতেন, পছন্দ করতেন।

শাহ্‌জাদী সৈয়দা জেবুন্নাহার বেগম
উম্মুল আশেকীন-এর বড় মেয়ে

আহমদিয়া মন্‌জিল ছেড়ে আসার দিন 'মা' বেশি বেশি কেঁদেছিলেন

ফটিকছড়ি উপজেলা দাঁতমারা গ্রামের জমিদার পরিবারের ছেলে বদরুজ্জামান সিকদারের ছোট মেয়ে আমার মা, নাম মুনাওয়ারা বেগম। জন্ম ১৯৪২ সাল। তদানিন্তন বাংলায় মেয়েদের পড়ালেখার তেমন প্রচলন ছিল না। পাশের স্কুলে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। ১৫ বছর বয়সে আম্মার বিয়ে হয়। আমার দাদা অর্থাৎ শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী সেসময় তাঁর প্রথম পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। আমার দাদা ছিলেন আমার নানার পীর। পীরের সুশিক্ষিত ছেলের জন্য নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তাঁর কাছে খুশির খবর ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ ছিল না। বি.এ পরীক্ষার কয়েকটি বিষয় ভালভাবে দিলেও একটা পরীক্ষার খাতা হাতে নিয়ে তিনি পায়ে হেটে মাইজভাণ্ডারে চলে আসেন। সেই থেকে তিনি সবসময় ভাববিভোর অবস্থায় থাকতেন। এই অবস্থায় মেয়ে বিয়ে দেওয়াটা প্রচন্ড বোকামী মনে করতে লাগলেন। আমার আম্মার অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল। কারণ আমার নানা অর্থ-বিত্তে ও সামাজিকভাবে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি লঙ্গরখানা খোলেন। গুণগত দিক দিয়ে মানসম্মত খাবার পরিবেশনের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গোল্ড মেডেল প্রদান করেছিল।

আমার নানুর পরিবার আমার আম্মার বিয়ের আগে থেকেই দরবারের সাথে জড়িত। তিনি দাদার মুরিদ ছিলেন। আমার সেজ কাকার কাছ থেকে শুনেছি উরসের তাবার্‌রুক বিতরণের দায়িত্ব দাদা সবসময় নানুর ছোট ছেলে তালেব চৌধুরীর হাতে দিতেন।

আমার নানু অনেক পরোপকারী ছিলেন। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষে অনেক পরিবার অভাবের কারণে ৫টাকা ১০টাকা দিয়ে নিজের বাচ্চা বিক্রি করে দেশ ত্যাগ করেছিল। এইরকম অনেক বাচ্চা কিনে ওদের বড় করে নিজের জায়গা দিয়ে বসতবাড়ি করে দিয়েছেন তিনি। আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য কিছু করার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর এই স্বভাব তাঁর তিন মেয়ের মধ্যেও ছিল। আমার নানা ব্রিটিশ আমলে ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন। এতকিছুর পরও তিনি পীরের হুকুমকে শিরোধার্য করে নিলেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যত জেনেও মেয়েকে সেখানে

বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার আম্মা আমাদের একটা কথা বলতেন, (কথাটা হচ্ছে একটা শ্লোক) ‘বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়’।

আমার আম্মা এবং আমার নানা দুইজনেরই ভক্তি-বিশ্বাস অটুট ছিল। একজন বাবার প্রতি অন্যজনের পীরের প্রতি। এই কথা কেন উল্লেখ করলাম! কারণ অতি সহজ, অতি সরল, অতি ভক্তিকে আমরা অনেক সময় অবজ্ঞা করি। অতি ভক্তি এবং অতি বিশ্বাস যদি ঠিক জায়গায় দেওয়া যায় তাহলে অনেক বড় কিছু অর্জিত হয়। কোন যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে গিয়ে কিভাবে পীরের কদমে আত্মসমর্পণ করতে হয় সেটার হাতেখড়ি আমার মা শিখেছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। আমার আম্মাকে দরবারে বিয়ে দেওয়াটাতে পীরের হুকুম পালন ছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না।

বিয়ের তিনদিন পর ভাইরা সবাই মিলে আম্মাকে নিতে আসেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে নতুন জামাই থেকে বিদায় নিতে আসলে আব্বা তাঁদেরকে রাতে থেকে যেতে বলেন। তাঁরা থাকতে অপারগতা জানিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলেন না। মাঝপথে ব্রিজ ভেঙ্গে আবার মাইজভাণ্ডারে ফেরত আসতে হয়। পরের দিন আবার রওনা দিলেন। এই ঘটনায় গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী যে চেরাগ জ্বালানোর কথা স্বপ্নযোগে জনৈক মাওলানাকে বলেছিলেন সেই “চেরাগে গাউসুল আযম”-এর কিছুটা তাপ আমার আম্মা এবং তাঁর পরিবার অনুভব করেছিলেন। কিন্তু চেরাগটা কত বড় সেটা তখনও বুঝতে পারেন নি।

বিয়ের তিন বৎসর পর আম্মার একটা মেয়ে হয়। দাদা, দাদু, আশেক-ভক্ত সবাই খুব খুশি। দাদু একজন খাদেমকে দিয়ে বাচ্চাকে আব্বার কাছে পাঠালেন কোলে দেওয়ার জন্য। খাদেমা “বড় বদ্দা বাচ্চাকে কোলে নেন” বলা মাত্রই তিনি একটি গাছ দেখিয়ে বললেন, “ঐ গাছের তলায় মাটিতে ফেলে রাখ, পোকামাকড়ে খেয়ে ফেলবে”। এ ঘটনায় সবাই খুব মর্মাহত হলেন, বিশেষ করে দাদু। এই কথাটার অর্থ বুঝতে সবার সাত মাস লাগল। সাত মাস পর মেয়েটি মারা গেল। এই ঘটনায় আব্বার প্রতি আম্মার বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিটা আরো মজবুত হয়ে গেল। তিনি অনুভব করতে লাগলেন, এই জগৎ সংসারের প্রতিষ্ঠিত মানুষ যত গুণে গুণান্বিত, তাঁর স্বামী তার চেয়েও বেশি কিছু গুণে গুণান্বিত।

কিন্তু আব্বা আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই অনেক কোলে নিতেন। খুব আদর করতেন। আমার বয়স যখন ৫–৬ বৎসর তখনো আমাকে কোলে নিতেন।

পাউরুটিতে মোটা করে বাটার-জেলি লাগিয়ে নিজ হাতে খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে শহর থেকে বাটার পাউরুটি আনাতেন। মিষ্টি আলুবোখারার বীচির ভেতরে সুমিষ্ট একটি বাদাম থাকে। ছোটবেলায় আব্বা সেই বীচি দাঁতে ভেঙে বাদাম বের করে আমাকে খাওয়াতেন।

মেজ ফুপুর কাছ থেকে শুনেছি, দাদু আমার আম্মাকে বিশেষ পছন্দ ও মায়া করতেন। কারণ বিয়ের তিন বছর পর্যন্ত আমার আম্মার কোন বাচ্চা ছিল না। আব্বার জন্য তেমন কোন সময় দিতে হতো না। কারণ আব্বা নিজের ভাবে নিজে বিভোর থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। আমাদের জন্মের পর থেকে আব্বার এই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। আগের বরফ শীতল মেজাজটা পরিবর্তন হয়ে কিছুটা হাসিখুশি আবার কিছুটা রাগান্বিত মেজাজে থাকতেন।

আব্বার জজব হাল হলে (অর্থাৎ রাগান্বিত হলে) আম্মা একটু আড়ালে চলে যেতেন। আমার দাদা নাকি আম্মাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। আম্মার সাথেও মাঝে মাঝে রাগ করতেন কিন্তু শারীরিকভাবে কখনো আঘাত করেননি। রাগারাগি করার একটু পরেই আবার শান্তভাবে বলতেন, "অ-জেবুর মা এক কাপ চা দিত পারিবেন না, যে?" সাংসারিক কোন ব্যাপার নিয়ে যে রাগ করতেন তা না। কোন কথাবার্তা ছাড়াই রেগে যেতেন। আম্মা ভয় পেতেন কিন্তু কোন বাকবিতণ্ডা করতেন না। পক্ষান্তরে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন এই ভেবে যে, তাঁর হয়ত কোথাও কোন ভুল হচ্ছে। এই চিন্তাটাই আম্মাকে পরিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছে।

আব্বা অনেকের কাছে আম্মার রান্নার এবং কাজের প্রশংসা করতেন। আমরা সহ আম্মাকে কক্সবাজারে বেড়াতে নিয়ে গেছেন দুইবার এবং ঐ সময়ের বেস্ট হোটেল সাইমন-এ রেখেছেন। আমরাসহ আম্মাকে ঢাকাতেও বেড়াতে নিয়ে গেছেন দুইবার। আব্বা আমাদের দৈনন্দিন কাজের খোঁজখবর তেমন রাখতেন না এইসব ব্যাপার আম্মাই সামলাতেন। কিন্তু আব্বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে আম্মাকে দিক-নির্দেশনা দিতেন।

পরবর্তী সময়ে আমি দেখলাম আম্মা বেড়াতে খুব পছন্দ করেন। শরীর খারাপ থাকলেও বেড়ানোর কথা বললে আম্মা চলে যেতেন। আমি আর আমার আপা যে ঘরে থাকতাম তার উল্টো দিকে আব্বা-আম্মা বাকী ভাইবোনদের নিয়ে থাকতেন। মাঝখানে একটি উঠান ছিল। উঠানের এক কোণে একটি টয়লেট

ছিল। একদিন আমি ঘর থেকে বের হয়ে পুকুরের দিকে যাব, হঠাৎ দেখি আব্বা বদনা হাতে টয়লেটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখামাত্র বললেন, "বাবা এক বদনা পানি দিত পারিবেন না?" সাথে সাথে আমি উত্তর দিলাম "পাইজ্জুম আব্বা" (পারবো আব্বা)। পুকুর থেকে বদনাটা পানি ভর্তি করে আব্বার হাতে দিতেই আমাকে বললেন, "অনর আম্মারে লই বেড়াইয়ুন যে, বেড়াইয়ুন যে, বেড়াইয়ুন"। তখন আমার বয়স ১৩-১৪ বছরের বেশি হবে না। তখন থেকে আমার মাথায় আম্মাকে নিয়ে বেড়ানোর চিন্তা ঢুকে গেল।

১৯৭৩ সালে আমার আম্মা দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত হন নতুন বাড়িতে। নতুন বাড়িতে আব্বা আসেন সকালে। আম্মা আসেন রাতে। সে রাতে আমরা কেউ খাবার খাইনি। আম্মারতো প্রশ্নই আসে না। কারণ আম্মা অনবরত কাঁদছিলেন। আব্বা ছিলেন খুবই স্বাভাবিক। কোন কিছু না বুঝে আমি এবং আমার বড়বোন দুজনেই কেঁদেছি। একদিন আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– "আম্মা, 'আহমদিয়া মন্‌জিল' ছেড়ে আসার দিন আপনি এত কেঁদেছিলেন কেন? নির্জন বাড়ি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এসব কারণে"? আম্মা বললেন, "দুশ্চিন্তা যে হয় নি তা না, কিন্তু আমি দুশ্চিন্তায় কাঁদিনি, কেঁদেছি ভিটের মায়ায়, ১৯ বছর যে বাড়িতে কাটিয়েছি সে বাড়ির মায়ায়"।

আমরা নতুন বাড়িতে আসার দুইদিন পর আহমদিয়া মন্‌জিলে রান্নার কাজ করেন এমন দু'জন খাদেমা আম্মাকে দেখতে আসেন। তাঁরা বললেন, "গত রাতে ছোট বুবু (অর্থাৎ আমার ছোট ফুপু) এসেছিলেন, সারারাত ঘুমাননি। আপনার (আমার আম্মার) রুমে বসে কেঁদে কেঁদে সারারাত কাটিয়েছেন"। দাদীর ইন্তেকালের পর দাদীর মত করে ফুপুদেরকে আদর-আপ্যায়ন করে কিছু পরিমান হলেও মায়ের ভালবাসার ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আম্মা। আলাদা করার সময় দাদা আমার আম্মাকে কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিলেন। যেমন জায়গা জমির পরিমাণ কত, রওজা শরিফের ফাণ্ড থেকে আব্বার ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ চলবে, খামারের জমি সবকিছু মৌখিকভাবে বলে দিলেন। দোকানে কোন ভাগ আব্বা পাবেন না এটাও বলে দিলেন। আম্মা সবকিছু শুনে বিনয়ের সাথে দাদাকে বললেন, বাবা, জেবুর বাপ তো দুনিয়াদার মানুষ না তাহলে আমরা চলবো কিভাবে"? দাদা নাকি মৃদুস্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "বড় মিয়ার ইনকাম অফুরন্ত, কোন অসুবিধা হবে না"।

প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই দাদা আমার আম্মার অন্তরে সাহসের বীজ বপণ করে দিয়েছিলেন। আম্মা বুঝেছিলেন এই ঝলমলে বাড়ি ছেড়ে যে নির্জন বাড়িতে তিনি যাচ্ছেন সেখানে জীবন সংগ্রামে জীবনসাথী হিসেবে যাকে পাবেন তিনি সামান্য কেউ নন। কারণ সামান্য কিছু থেকে অফুরন্ত কিছু আসতে পারেনা। দাদার এই ইংগিতটাই আম্মা বুঝাতে পেরেছিলেন, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

আম্মা সারাজীবন অল্পে তুষ্ট ছিলেন। স্বাধীনতার পর পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। চালের দাম অস্বাভাবিক হওয়াতে মন্জিলের খাদেম-খাদেমা এবং দরবারী মেহমান সবাই আটার রুটি খেতে লাগল। শুধু ভাত রান্না হত আমাদের জন্যে। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আম্মা আমাদের বললেন, "মন্জিলের বেগ্গুনে রুটি খায়, চল আঁরাও রুটি খাই। বেকে খাইলে আঁরা কা খাইত্ ন ফাইত্তাম (মন্জিলের সবাই রুটি খাচ্ছে, আমরাও রুটি খাই। সবাই রুটি খেতে পারলে আমরা কেন খেতে পারবোনা)"। সেদিন থেকে দুর্ভিক্ষের সময় আমরাও রুটি খাই। এইভাবে খাদেম-খাদেমা, আশেক-ভক্ত সবার সাথে নিজের জীবনকে একাত্ম করে আজ তিনি 'উম্মুল আশেকীন'এ পরিণত হয়েছেন। অনেক মহিলা বিশেষ করে যারা বিদেশে থাকেন তারা বলতেন, "আম্মাজান আপনার কি লাগবে বলেন, আগামীতে আসার সময় আমি নিয়ে আসব"। আম্মা বলতেন, "আমার কিছু লাগবে না, আমার তো সবই আছে"। তিনি কোনদিন কাউকে কিছুর জন্য বলেছেন এমনটি আমি শুনিনি।

আমার বড়মামীও (আম্মার বড় ভাবী) সে কথা বলেছেন আমাকে। সাহায্য বলতে এখানে আমি নির্ভরশীলতাকে বুঝিয়েছি। আবার কেউ যদি ভালোবেসে সম্মানের সাথে কিছু দিতেন তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। ব্যাপারটা স্পষ্ট করার জন্যে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন: আমার বড় আপার বিয়ের সময় আমাদের পুরনো দুই তলা ভবনের নিচের তিনটি কক্ষ বসবাসযোগ্য হলেও উপরের কক্ষগুলির কাজ অসমাপ্ত ছিল। সেই অসমাপ্ত ঘরেই বিয়ের মেহমান বসার ব্যবস্থা করলেন। তিনি চাইলে তাঁর আত্মীয় বা আব্বার আত্মীয়-স্বজন থেকে টাকা ধার করে বাড়ির বাকী কাজ সমাপ্ত করে বিয়ের আয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। পক্ষান্তরে আমার বড় আপার প্রথম সন্তানের জন্মের সময় আমার ডাক্তার কাকার (শাহ্ সুফি ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভাণ্ডারী) কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন কোন ডাক্তার দেখাবেন এবং বড় আপাকে তাঁর নির্দেশিত ডাক্তারকে দেখাতে বললেন। এই ছিল আম্মার সাহায্য নেওয়া-না

নেওয়ার পদ্ধতি। ছোট ছোট ঘটনাগুলির বিশদ বর্ণনা দিচ্ছি এই জন্য যে, যে কোন মানুষকে জানতে হলে বা তার জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা নিতে চাইলে সেই ব্যক্তির জীবন পদ্ধতি, ঘটনাপ্রবাহ জানা দরকার বলে আমি মনে করি।

১৯৭৫ সালের দিকে আমার ছোট মামা মিথ্যা খুনের মামলায় জেলে যান। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে এইভাবে, আমার মামা কোন এক ছুটিতে স্বপরিবারে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান। তখন তাঁর ঢাকার বাসায় মামার এক বন্ধু যশোর থেকে আসা কয়েকজন মেহমান নিয়ে এক রাত ছিলেন, হোটেলের ভাড়া বাঁচানোর কথা বলে। তার কিছুদিন পর যশোর থেকে আসা মেহমানদের মধ্য থেকে ৩ জনকে হত্যা মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করে। যেহেতু কয়েকদিন আগে ঐ লোকগুলি মামার বাসায় এক রাত ছিল তাই মামার জড়িত থাকার সন্দেহে মামাকে গ্রেফতার করে। এই অযাচিত বিপদে সবাই দিশেহারা। আমার আম্মাও খুব কান্না করতে লাগলেন। আম্মা ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার জন্য আব্বার কাছে অনুমতি চাইলেন। কথাটা শুনে আব্বা খুব হাসতে লাগলেন এবং যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। বললেন, "যন পইত্তুনো যে, দিন পনের বেরাই তেরাই চলি আইবু" (অর্থাৎ জেলে পনের দিন বেড়ায়ে বাসায় চলে আসবেন)।

যাওয়ার অনুমতি না পেয়ে আম্মা কেঁদে কেঁদে দিন গুজরান করতে লাগলেন। মামার গ্রেফতারের কথা শুনে আব্বা উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। আব্বার অট্টহাসি দেখে আম্মার মন খারাপ হয়ে গেল। সাথে সাথেই আব্বার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তবুও শহরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। তখন কোন ফোন বা মোবাইল ছিল না। কেউ আসলে খবরা-খবর পেত। কিছুদিন পর আম্মা খবর পেলেন যাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল তাদের মধ্যে তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। আমার মামারও ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। আইন-আদালত রাজনৈতিক নেতা যাকেই ধরা হচ্ছে সবাই বলছে, খুনের কিছুদিন আগেই আসামিরা মামার বাসায় অবস্থান করার প্রমাণ পুলিশের কাছে থাকায় তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করা কঠিন ছিল। সবাই চেষ্টা করছিল অন্তত ফাঁসি যেন না হয়।

এইসব শুনে আমার আম্মা স্থির থাকতে পারলেন না। ভুলে গেলেন নিজের ক্ষতির অগ্রিম বার্তা। চলে গেলেন ভাইয়ের বাসায়। ওখানে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে আম্মা বাথরুমে পিছলে পড়ে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হন। গভীর তদন্তে হত্যার সাথে মামার সংশ্লিষ্টতা না থাকার প্রমাণ পাওয়ায় গ্রেফতারের ঠিক পনের দিনের দিন মামা বে-কসুর খালাস পেয়ে বাসায় চলে

আসেন। এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিলাম এই জন্য যে, এই ঘটনার মাধ্যমে আমার আম্মা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা যে চেরাগ জ্বালানোর কথা স্বপ্নযোগে জনৈক মাওলানাকে জানিয়েছিলেন সে চেরাগ কত বড়। এইভাবে চেরাগে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগমকে শিখিয়েছেন কিভাবে ধৈর্য্যধারণ করতে হয়। কিভাবে 'এল্‌মে লাদুন্নী' প্রাপ্তদের পদতলে একতাবদ্ধ হতে হয় অর্থাৎ গুরু তিনি যা করেন তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া। এইজন্য পরবর্তীতে এর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি স্থির ছিলেন, বাধ্য ছিলেন।

গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে থাকাকালীন যে কয়জন মানুষ আব্বাকে হযরত কেবলা কাবার বেলায়তের ক্ষমতার উত্তরাধিকার মনে করেছেন বা বুঝতে পেরেছেন লেদু ফুপু তাদের একজন।

১৯৭৩ সালে আমরা নতুন বাড়িতে আসি। নতুন বাড়িতে আসার পর থেকেই বাড়ির প্রবেশ দ্বার নিয়ে আম্মা খুব চিন্তিত ছিলেন। কারণ আমাদের বাড়ির ভিটিটা ছিল ৫০-৬০ কাঠার। কিন্তু প্রবেশ দ্বার ছিল খুবই ছোট চাপা। নতুন বাড়িতে প্রবেশদ্বার ঘেঁষে ছিল ডোবা (লোকমুখে কথিত আছে শিয়াল কুয়ার পাড়) যা অন্যজনের জমি। ফটকটি বড় করারও কোন উপায় নাই কারণ ফটকটি ঘেঁষেই একটি কুয়া বা ডোবা। এই জায়গার মালিক অন্যজন। সুতরাং চাইলেই ফটক বড় করা সম্ভব নয়। তিনিও এই অসম্ভবকে সম্ভব করার কাজে লেগে গেলেন। একজন মহিলার মাধ্যমে কিছুদিন পর পর জমির মালিককে জমিটা আমাদের কাছে বিক্রির জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। জমির মালিকরা সবাই একমত হতে অপারগ ছিলেন। তারপরেও তাদেরকে রাজী করানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এইরূপ কিছুদিন পর পর একজন মহিলা আসতেন। তিনি নিজে আসতেন নাকি আম্মা ডাকাতেন আমি ঠিক জানি না। ভদ্রমহিলা অনেক আশার বাণী শোনাতেন কিন্তু কাজের কাজ অর্থাৎ ডোবা ক্রয়ের নাটকের কোন পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতেন না। এমতাবস্থায় হঠাৎ আব্বা একদিন আম্মাকে ডেকে বললেন, "অ-জেবুর মা এই কুয়া গান ভরাইত পারিবেন না?" তখন আম্মা সাথে সাথে উত্তর দিলেন "অনে হুকুম দিলে যে পাইজ্জুম"। আমার আম্মা বুঝে গেলেন এই কুয়া আমাদের হয়ে যেতে আর দেরি নাই। এরপর আম্মা যত প্রকার চেষ্টা করা যায়

তা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯৮৬ বা ৮৭ সালে ৩৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ৭ গন্ডা ডোবা জমি কিনে নিলেন। সে সময় তিনি দরবারের চলাচলের সুবিধার্থে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা দিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের হক মন্‌জিলের জন্য জায়গাটা কিনেছিলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর ব্যক্তিজীবনে চট্টগ্রাম শহরে একটা বাড়ি বা জায়গার খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ আমরা তিন ভাই-বোন ভাড়া বাসায় থেকে লেখাপড়া করতাম।

শহরে আসার প্রথম দিকে আমার মামাতো বোন আরজুমান আপার সাথে ছিলাম। আমার এবং আমার বড় আপার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমার ভাই কোথায় থাকবে এই ব্যাপারটা আম্মার জন্য অনেক বড় পারিবারিক সমস্যা ছিল। কিন্তু তিনি পারিবারিক প্রয়োজনটাকে উপেক্ষা করে দরবারের প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখলেন। তিনি চিন্তা করলেন ভাগ্যে থাকলে শহরে বাড়ি কিনতে পারব কিন্তু এই জায়গা যদি অন্য কেউ কিনে ফেলে তাহলে দরবারের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। এইভাবে সারা জীবন নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে বিসর্জন দিয়ে দরবারের খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। নিজের নামে এক গন্ডা জমিও কখনো তিনি কিনেননি। পরে ছেলে ও মেয়েদের জন্য কিনেছেন। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি দরবারকে অর্থাৎ হক মন্‌জিলকে গোছানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পরিবার গোছানোর কাজে মনোযোগী ছিলেন।

১৯৭৫–৭৬ সালের দিকে আব্বা আমার ছোট ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী-কে শহরে লেদু ফুপুর বাসায় রেখে আসতেন, মাঝে মাঝে বাড়ি আনতেন। আমার ভাই যাওয়ার সময় আম্মা কান্না করতেন, কারণ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। কিন্তু আব্বার কথার সঙ্গে দ্বিমত করতেন না। এইভাবে চলতে থাকল প্রায় এক বৎসরেরও বেশি সময়।

একদিন ব্যাটারী গলির লেদু ফুপু আম্মার বাসা থেকে আমার ভাইকে নিয়ে আসলেন। তাঁকে দেখে আম্মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন কারণ আমার ভাইয়ের সারা পায়ে ঘা-পাঁচড়া ভর্তি। পরের দিন সকালে আমি বদনা করে ঘায়ের উপর পটাশের পানি ঢালতে লাগলাম আর আম্মা তুলা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে পরিস্কার করে ধুতে লাগলেন। এরপর মলম লাগিয়ে দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। তখন আব্বা খুব ঘন ঘন শহরে আসতেন। এইসব ঘটনা দেখে সবাই বলতে লাগলেন, বাবাজান ছেলেকে তাঁর মত করে গড়ে তুলছেন (শিক্ষা

দিচ্ছেন)। এইবার নেওয়ার সময় আম্মা খুব অনুনয় করতে লাগলেন, “ন নিওন না যে, আঁর দুধের পোয়া ছাড়া আঁই কেনে থাইক্কুম”। না নেওয়ার পক্ষে আরো অনেক যুক্তি দেখাচ্ছিলেন কিন্তু সে সব কথা আমার মনে নাই। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আব্বা আম্মাকে সান্ত্বনার সুরে বললেন, “হাসান মিয়া যে, কয়েকদিন বেরাই তেরাই চলি আইবু, অনে চিন্তা ন গইজ্জুন”।

আমার আম্মা শান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের চলে যাওয়া দেখতে লাগলেন। আম্মা হঠাৎ পশ্চিম দিকে সিজদায় পড়ে ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন আর বলতে লাগলেন, “আঁ-র পোয়া যেন দুনিয়া গরে”। এই একটা কথা বারবার বলতে লাগলেন। সাংসারিক যে কোন ব্যাপারে আম্মার মতামতকে আব্বা সমর্থন করতেন। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার ছিল যা একান্ত আব্বার। আব্বার হুকুম, সব সিদ্ধান্ত, সব কাজ আম্মা অবনত মস্তকে মেনে নিতেন। অবনত মস্তকে বলছি এই জন্য যে, আব্বার কোন কথা, কোন কাজ নিয়ে আম্মাকে কারো সাথে এমন কি আম্মার মা-ভাইবোন এর সাথে কোনপ্রকার বীতশ্রদ্ধ বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে আমি দেখিনি। চিন্তা করতেন। অনেক সময় কান্নাও করতেন, বিষন্ন হতেন।

আব্বা কিছুদিন পর আমাদেরকে চৈতন্যগলি আমার খালার বাসায় রেখে আসলেন। তখন আমার ভাই চৈতন্যগলিতে চলে আসে। কয়েকদিন পর পর আম্মা বাড়িতে চলে যান আর আব্বা পরের দিনই আমার খালার বাসায় রেখে যান। আব্বা খুব বেশি সময় থাকতেন না। মাঝে মাঝে দু-একদিন থাকতেন। আব্বা বেশি সময় থেকেছেন বেটারী গলি লেদু ফুপুর বাসায়। লেদু ফুপু রক্তের সম্পর্কে অনেক দূরের হলেও আত্মার সম্পর্কে আমাদের অনেক কাছের মানুষ ছিলেন। আমার ভাই-এর জন্মের সময় তিনি সারারাত আম্মার সাথে ছিলেন। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে থাকাকালীন যে কয়জন মানুষ আব্বাকে হুজুর গাউসুল আযম-এর বেলায়তের প্রতিনিধি মনে করতেন লেদু ফুপু তাদের মধ্যে একজন। পড়ালেখা ছাড়া এক বৎসর আমরা খালাম্মার বাসায় আদর-আপ্যায়নে কাটালাম। আমার খালাম্মা ছোট বোনকে অনেক আদর করতেন, দরবারকে অনেক ভক্তি করতেন। এক বৎসর পর আমার ছোট মামী নিজ উদ্যোগে আমাকে এবং বড় আপাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং খালাম্মার বাসা থেকে নিজের বাসায় নিয়ে আসলেন। মামীর বাসায় ৬-৭ মাস থাকার পর বার্ষিক পরীক্ষা না দিয়ে আবার বাড়ি ফিরে গেলাম।

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ছিলেন হুজুর গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার বেলায়তের বাহক, চেরাগে গাউসুল আযম। আমরা জানি বেলায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যা কিছু করেন আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে, মানব কল্যাণে। সুতরাং তাঁদের কথা বা কাজ অন্য দশজনের মত হবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ তাঁরা মানুষের অতীত-ভবিষ্যত অন্তর-বাহির সব দেখেন। বিশ্বের কোথায় কি ঘটে তৎক্ষণাৎ তাঁদের জানা হয়ে যায়। আর আমাদের কোন কিছু সম্পর্কে অগ্রিম জানা বা কারো অন্তরের খবর জানা অসম্ভব। সুতরাং তাঁদের কাজকর্মও বেশিরভাগ সময় আমাদের অস্বাভাবিক লাগে। অসম্ভব বলে মনে হয়। অনেক সময় আশেপাশের মানুষরা মেনে নিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমার আম্মা একটু ব্যতিক্রম ছিলেন। আব্বার ব্যতিক্রম কোন কথা বা কাজ আম্মাকে বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ করেনি। আব্বার সবকিছু তিনি সহজভাবে দেখতেন। তিনি মাঝে মাঝে হেসে হেসে বলতেন, "আঁই মুসা (আ.) আর খিজিরের (আ.) তালত পজ্জি [অর্থাৎ আমি মুসা (আ.) আর খিজির (আ.)-এর তালে পড়েছি]"। তিনি বুঝেছিলেন খিযির (আ.) আর বেলায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম পদ্ধতি এক। তিনি বৈবাহিক জীবনের শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামী একজন মাদারজাত আল্লাহ্‌র অলি। কোরআনের বর্ণিত ঘটনা এবং হযরতের (ক.) স্বপ্নযোগে তাঁর স্বামীকে হযরতের চেরাগ সম্বোধন করাকে তিনি আমল করেছেন দৃঢ়ভাবে। এই আমল করতে পারাটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি বুঝেছিলেন এখানে আবেগ চলে না। এখানে বিবেক চলে না এখানে চলে শুধু আনুগত্য। তিনি সেটাই করেছেন।

হযরতের চেরাগের আলোর পথ চলতে চলতে তিনি নিজেই এক সময় আলোকিত মানুষ হয়ে গেলেন। সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে গেলেন। স্বল্প অর্থ-সম্পদ দ্বারা পরিবার এবং দরবারকে সুশৃঙ্খল এবং সমৃদ্ধশীল অবস্থায় নিয়ে আসার কৃতিত্বকে তিনি কখনোই নিজের মনে করতেন না। নিজেকে মুনিবের হুকুমের তাবেদার মনে করতেন। তিনি বলতেন, "মুনিবের কাজ মুনিবই করিয়েছেন, আমার কি সাধ্য"। কেউ যদি বলতেন, আম্মাজান আপনার দোয়ায় আমি সংকট মুক্ত হয়েছি, সে কথা তিনি ছাতার মতো উড়িয়ে দিতেন, বলতেন– "আঁ-ই কন দোয়া গরইন্না, ভাণ্ডারীর দোয়া"। অর্থাৎ 'আমি কে দোয়া করার, দোয়া ভাণ্ডারীর'। কিন্তু আমরা যারা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে দেখেছি, আমরা জানি তাঁর দোয়া কত বরকতময় ছিল। তিনি অর্থ-বিত্ত কর্মক্ষমতা-কর্মদক্ষতা বা

মহত্ত্বতা কোন কিছুই নিজের মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন তাঁর যা কিছু অর্জন সব মুনিবের মেহেরবানী এবং এইভাবে তিনি স্বীয় মুর্শিদের-মুনিবের চরণে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করেছেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা এইজন্য বললাম, মৃত্যু পরবর্তী এমন একটা ঠিকানা আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছেন, সেখানে তাঁর পাশে শায়িত আছেন হুজুরে গাউসুল আযমের নূরের চেরাগ, যিনি আউলিয়াদের বাদশাহ্– "শাহানশাহ্"।

পৃথিবীর সব মা-ই মমতাময়ী সব মা-ই দায়িত্ববান। কিন্তু কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য্য সহকারে, বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসিক ক্ষমতা সবার থাকে না। অনেক বড় বল কিছু কিছু মানুষের মধ্যে থাকে। আমরা ভাগ্যবান আমার মা তাদের একজন। মায়ের ভালবাসা বর্ণনা করার জন্য এক-দুই পৃষ্ঠা যথেষ্ট নয়। পুরো একটি বই লিখতে হবে। তাই আমি আমার জন্মের পরের একটি ঘটনা এবং আমার মায়ের ইন্তেকালের কয়েক মাস আগের একটি ঘটনা দিয়ে মায়ের কথা শেষ করছি।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে, মাতৃগর্ভে অপূর্ণ অবস্থায় অর্থাৎ ৭ মাসে আমার জন্ম হয়। ধাত্রী থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন সবাই বলতে লাগলো, এই বাচ্চা বাঁচবেনা। শারীরিক অবস্থা গুরুতর। সবাই মোটামুটি নিরাশ। আমার মা নিরাশ হলেন না। আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। পুরনো সুতি কাপড়কে ৩-৪ ভাজ করে তাতে বাচ্চাকে পেঁচিয়ে গরম রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রতি ঘণ্টায় খাওয়াতে লাগলেন। এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে আমাকে সুস্থ করে তোলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে, ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম। ২০২১ সালের মে-জুনের দিকে হঠাৎ একদিন আমার মা আমার ডান হাত ধরে উপরের দিকে তুলে বিষন্নভাবে বলতে লাগলেন, "অ-পুত তুঁই এইল্লা গরি ফুয়াইয়ো কা? (অর্থাৎ তুমি এতো শুকিয়েছো কেন?)" আমি বললাম, "আম্মা আমিতো এখন অনেক ভাল আছি। অল্প অল্প করে খাচ্ছি। এতো দিনতো একদম খেতে পারিনি, তাই একটু বেশি শুকিয়ে গেছি"। তিনি এক হাত দিয়ে আমার ধরা হাতের উপর আম্মার অন্য হাত বুলাচ্ছেন। হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তাঁর দুই হাত উপরের দিকে তুলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "আল্লাহ্ আঁ-র মাইয়া পোয়ারে ভালা গরি দ" "আল্লাহ্ আঁ-র মাইয়া পোয়ারে ভালা গরি দ" এভাবে কয়েকবার বলতে লাগলেন। আমি দুই হাতে আমার মাকে জড়িয়ে

ধরে বললাম, “অনে চিন্তা নগইজ্জুন, অনে দোয়া গইরলি আঁই ভালো অই যাইয়ুম”। তখন তিনি শান্ত হয়ে গেলেন এবং আমাকে ঘন ঘন খাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন। তার কিছুদিন পর একদিন দুপুরে আমি জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর রাতে কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হয়ে আবার জ্ঞান হারাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মায়ের দোয়ায় এবং মুনিবের মেহেরবানীতে আল্লাহ্ আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন।

শাহ্জাদী সৈয়দা হুমায়রা বেগম
উম্মুল আশেকীন-এর মেজ মেয়ে

গরীব মানুষ দরবারে হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি নিতেন না

উম্মুল আশেকীন আমার মা। সব মায়েরা যেমন ভালবাসা দেয়, আদর যত্ন দেয় এর বাইরে আলাদা তেমন কোন স্মৃতি নেই, কেননা অন্যান্য মানুষের মতো সাধারণ জীবন-যাপন আমাদের ছিলোনা, আমাদের জীবনটা অন্যদের চেয়ে আলাদা ছিলো। মায়েরা যেমন বাচ্চাদেরকে নিয়ে আদর করে, বসে গল্প করে, এরকম অনেক স্মৃতি থাকে, আমাদের সে রকম হওয়ার কোন সুযোগ ছিলনা। আমার স্মৃতিতে আছে আম্মা সবসময় দরবারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। এজন্য আমাদের লেখাপড়া, অন্যান্য সবকিছু যথানিয়মে চলতো। আমার মনে হয় জীবনের পুরো সময়টাই একটা স্মৃতি।

আমি মনে করি হক মন্‌জিলের কিছুটা নয়, পুরোটাই আম্মার করা এমনকি প্রতিটি কোণা আমার আম্মার করা। আমার দাদা দুইটা রুম দিয়ে তাঁর মতো করে গুছিয়ে দিয়েছেন। হক মন্‌জিল এখন যে অবস্থায় দেখা যাচ্ছে তা পুরোটাই আম্মার করা। তবে অবশ্যই দরবারের বড় বড় কাজ/সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আব্বার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই করতেন।

এখন যেখানটায় অফিস আছে সেখানটায় একটা ডোবার (লোকমুখে কথিত আছে শিয়াল কুয়ার পাড়) মতো ছিলো। আম্মা সেটা কিনে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে রাজি করাতে পারছিলেন না। আব্বার সাথে এ ব্যাপারে কথা বললে, তিনি আম্মাকে বললেন, আপনি ভরায়ে ফেলেন। ওটা কিন্তু তখনও কেনা হয়নি, মালিক আদৌ বিক্রি করবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। তিনি বলেছেন, "ভরায়ে ফেলেন" কিন্তু ভরানোটা কিভাবে হবে, সেটা কিন্তু বলেননি। তবে আম্মা বুঝতে পেরেছিলেন, আব্বা ভরায়ে ফেলতে যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয় এ কাজ যে কোনভাবে হবেই, ইনশাআল্লাহ্!

আম্মাকে যখন ডোবা ভরায়ে ফেলতে বলেছেন, তখন আম্মা চাইলে জোর করে, প্রভাব খাটিয়ে লোকজন দিয়ে সেটা ভরায়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু আম্মা জোর খাটাতে চাননি, দরবারের সম্মান বজায় রেখেই জায়গার মালিকের সাথে কথা বলে, চুক্তি করে, মালিকের চাওয়া চড়া দামেই ডোবাটা কিনেছেন।

আমি বলবো, সে সময়ে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত না করে সুদূরপ্রসারি চিন্তা করে সুকৌশলে যে কাজটি সুন্দরভাবে করেছিলেন তা অনেক পুরুষ মানুষেরা হয়তো পারতোনা।

আম্মা সে সময় যে চড়ামূল্যে জায়গাটি কিনেছিলেন, তখন তিনি চাইলে সে টাকা দিয়ে শহরে জায়গা কিনে বাড়ি করতে পারতেন। তাঁর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি শহরে কোন জায়গা, জমি কেনেননি কারণ তিনি নিজের স্বার্থের চেয়ে দরবারের স্বার্থকে বড় করে দেখতেন সবসময়।

এছাড়া পূর্বের বাড়ি (কুমোর পাড়া) নেওয়ার ব্যাপারে বলা যায় ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের ঐ বাড়ি থেকে সরিয়ে জায়গাটা নেয়া, তাদেরকে অনত্র জায়গা কিনে দেয়া, তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসন করে দেয়ার ব্যাপারে সবটুকু অবদানই আম্মার।

পূর্বের বাড়ির পুরুষরা যখন জায়গা দিতে রাজি হচ্ছিলনা, তখন আম্মা ঐ বাড়ির মহিলাদের বুঝিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন সমস্যায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তিনি ঐ বাড়ির মহিলাদের দিয়ে পুরুষদের রাজি করিয়েছেন। আসলে ব্যাপারটা খুবই কঠিন ছিলো এবং একদিনে তা হয়নি, আম্মা ধীরে ধীরে ধৈর্য্য সহকারে সময় নিয়ে কাজটা করেছেন। অর্থাৎ, বলতে গেলে পুরো হক মন্‌জিলই আম্মা নিজের হাতে তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

আবার আহমদিয়া প্রাইমারী স্কুলটা যেখানটায় ছিলো সেখান থেকে চারালিয়া ভিটায় জায়গা কিনে দিয়ে সেখানে স্কুলটা স্থানান্তর করে দেয়ার কাজটা আম্মা একাই করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, তখন কিন্তু সব মন্‌জিলে পুরুষরাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একমাত্র হক মন্‌জিলে আব্বার অনুমতিক্রমে আম্মা বড় বড় সব কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আব্বা খুবই কম কথা বলতেন। তবে যে দু/একটা কথা বলতেন তা আম্মা বুঝতে পারতেন এবং আব্বার কথাগুলো অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন। এভাবে আব্বার নির্দেশানুক্রমে আম্মা নিজ প্রখর বুদ্ধিমত্তায় কাজগুলো সম্পন্ন করতেন।

আমি অনেক ছোট ছিলাম বিধায় তেমন বেশি জানা নেই। তবে আম্মা যখন দাদা-দাদীর গল্প করতেন তখন আমার দাদাকে কখনোই শ্বশুর বলতেন না, বাবা বলতেন। আমার দাদীকে কখনোই শ্বাশুড়ি বলতেন না, মা বলতেন। আম্মা শ্বশুর-শাশুড়ি-দেবর-ননদসহ শ্বশুর বাড়ির সবাইকে অত্যন্ত ভালবাসতেন

ও সম্মান করতেন। তাঁদেরকে আপ্যায়নের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে যেতেন এবং তাঁদের প্রসঙ্গে বলতেন, তাঁরা গাউসুল আযমের আওলাদ না? নবীপ্রেম, দরবার, গাউসুল আযম তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেতো। আমার নানা জনাব বদরুজ্জামান সিকদার যেভাবে দরবারকে সম্মান করেছেন, ঠিক সেভাবেই আম্মা দরবারকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছেন, ভালোবেসেছেন। আম্মা বাপের বাড়ির আত্মীয়দেরকে আদর-স্নেহ করতেন তবে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের আরো বেশি যত্ন-আত্তি করতেন।

আম্মা আব্বাকে পুরোপুরিই বুঝতে পারতেন। দরবারের ও সংসারের বড় বড় সিদ্ধান্ত, বড় বড় কাজ, আমাদের লেখাপড়া, মেয়েদের বিয়ে-শাদী, শহরে যাওয়া, থাকা থেকে শুরু করে সবকিছুই আব্বাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর সম্মতি নিয়ে সে অনুযায়ীই করতেন। কখনোই নিজের থেকে কিছুই করতেন না।

আমরা যারা সাধারণ জীবনযাপন করি আমরা অনেক সময় অনেক কাজ নিজেরাই করে ফেলি। স্বামীর কাছ থেকে সবসময় অনুমতি হয়তো নেয়া হয়না। আম্মা কিন্তু কখনোই সেটা করতেন না। আবার আম্মা আমার ফুপু-চাচাদের বিভিন্ন খাবার-দাবার অন্যান্য কিছু পাঠাতে বলতেন। তারই ধারাবাকিতায় আম্মা আমার ফুপুদের বাড়িতে আমৃত্যু খাবার-দাবার সহ বিভিন্ন মৌসুমী জিনিসপত্র পাঠাতেন।

অনেক সময় আব্বা গভীর রাতে চা চাইলেও তখন আম্মা চা করে নিয়ে গেলে আব্বা তখন অন্য হালতে চলে গেছেন। তারপর সারারাত আম্মা চা নিয়ে অপেক্ষা করেছেন এভাবে বছরের পর বছর আম্মা যে কত নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন তার কোন হিসেব নেই। আব্বার যে অন্যরকম জীবনযাপন, এটাতে আম্মা মোটেই বিরক্তি প্রকাশ করতেন না বরং খুশি মনে তা মেনে নিতেন।

আমরা কথায় কথায় বলি, স্বামী-স্ত্রী একজন অন্যজনের অর্ধাঙ্গ-অর্ধাঙ্গিনী। সত্যিকার অর্থে সবাই কি স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হতে পারে? সত্যিকারের অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন মা খাদিজাতুল ক্বোব্‌রা (রা.) আমাদের প্রিয় নবীজী (সা.)-এর সহধর্মিনী। আমি মনে করি আমার আম্মা আব্বার প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী হতে পেরেছেন। কেননা আমার আব্বার প্রত্যেকটা কাজের সমান অংশীদার আমার মাও। আব্বার সাথে সাথে তিনিও রিয়াজত-সাধনা করেছেন। আব্বা যখন, যেভাবে যেটা চেয়েছেন, আম্মা ঠিক সেভাবেই সেটা করেছেন। আমার আম্মা অন্যদের মতো স্বাভাবিক স্বামী, সংসার পাননি, আম্মার জীবনটাও অন্যদের

চেয়ে আলাদা ছিলো। তাঁকে অনেক কষ্ট ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আম্মার কখনোই কোন অভিযোগ ছিলোনা। আম্মা সেইসব কষ্টগুলো হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে দরবারের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আমি সেই অর্থে বলছি – আমার আম্মা হলেন আব্বার প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী।

একজন আদর্শ জননীর সব বৈশিষ্ট্যই আম্মার মধ্যে ছিলো। যেমন ছেলেমেয়েদের আদব-আখলাক, নতুন পরিবেশে কিভাবে মানিয়ে নিতে হয় তা শিখানো, সমাজের সব স্তরের মানুষকে সমান চোখে দেখা, মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া ইত্যাদি আম্মাই আমাদের শিখিয়েছেন। যেমন– আমার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে আসলে আমি শাশুড়িকে সালাম করে এসেছি কিনা, বলে এসেছি কিনা, আমার দায়িত্ব আমি ঠিকমতো পালন করেছি কিনা ইত্যাদি জানতে চাইতেন। আবার আমাদের সাথে যেসব দরবারী বোনরা থাকতো, তাদের সাথে ভালো আচরণ করা ও তাদেরকে সম্মান করার কথা বলতেন। আমাদের ভাই-বোনদের ও তাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করতেন না।

আম্মা দরবারের খেদমতদারদের খুবই সম্মান করতেন। আম্মা বলতেন তাদের সাথে কাজের মানুষের মতো আচরণ করিও না, তারা দরবারকে মহব্বত করেই খেদমত করছেন, তাদের সে মহব্বতের মূল্য দিতে হবে। আমার আম্মার কাছ থেকে সত্যিকারের আদর্শ জননীর শিক্ষা আমরা পেয়েছি।

দরবারে আগত আশেক-ভক্তদের আম্মা অনেক ভালবাসতেন, দয়া করতেন। যারা স্থানীয় তাদেরকে তিনি নিয়মিত সাক্ষাৎ দিতেন, তাদের আর্জি ফরিয়াদ শুনতেন। তাদের জন্য দোয়া করতেন। যারা বিভিন্ন সমস্যার কথা বলতেন তাদের সমস্যার কথা শুনে তাঁর প্রাজ্ঞ চিন্তাধারার মাধ্যমে যথাযথ সমাধানের পথ বাতলে দিতেন।

দরবারে জিয়ারতে আসা প্রত্যেক মহিলা জায়েরিন জিয়ারত শেষে আম্মার কাছে দোয়া প্রার্থী হতেন। প্রত্যেককেই আম্মা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিতেন।

দরবারের খেদমতদারদের ছোট ছেলেমেয়ে যারা আম্মার কাছে বড় হয়েছেন, তাদেরকে আম্মা কখনো আমাদের চেয়ে আলাদা ভাবতেন না। নিজের সন্তানের মতোই আদর, স্নেহ, ভলোবাসা, দিয়ে বড়ো করেছেন।

উরসের সময় বাইরের জেলাসমূহের মহিলা ভক্তবৃন্দের আতিথেয়তার ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা ছিলো। বিশেষ করে শীতকালে যাতে তাদের বিছানাপত্রের কোনরকম সমস্যা না হয় সে ব্যাপারে আম্মা বার বার তাগাদা দিতেন।

আম্মার কাছে এসে কেউ কোনদিন খালি হাতে ফিরে যেতেন না। আম্মা খুবই পড়ালেখার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, লেখাপড়াকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি অগণিত গরীব ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ দিয়েছেন। তিনি খুবই দূরদর্শী ও উন্নত চিন্তার অধিকারী ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দরবারের খাদেমাদেরকে তিনি ব্যাংক একাউন্ট করে দিতেন। সেখানে তাদের টাকা জমা রাখা হতো, তা দিয়ে তিনি তাদেরকে জমি কিনতে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন, নগদ টাকা হাতে থাকলে তা তো খরচ হয়ে যাবে, বরং জমানো টাকা দিয়ে সে যদি স্থায়ী একটা সম্পদ কিনে রাখে ভবিষ্যতে এটা দিয়ে অনেক উপকৃত হবে। বর্তমান SZHM ট্রাস্টের 'যাকাত তহবিল' তাঁর সেই চিন্তাধারার সফল বাস্তবায়ন।

তিনি দরবারের অনেক খাদেমাদের নিজ খরচে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সে সব খাদেমারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে সম্মান ও মর্যাদার সাথে সংসার করছেন।

আম্মা আশেক-ভক্তদের খুবই ভালবাসতেন। ধনী, দরিদ্র সবাইকে সমানভাবে ভালবাসতেন। বরঞ্চ দুঃখী, অসহায়, নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর দয়ার নজর বেশি ছিলো, অসহায়দের সহায়তা দিয়েছেন বেশি। অসত্য, অন্যায় নয়, বরং সত্যের পক্ষে কিভাবে একা দাঁড়ানো যায় তা আম্মাই শিখিয়েছেন।

অনেক গরীব মানুষ দরবারে হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি নিতেন না। বলতেন হাদিয়া দিতে হবে না, তুমি দরবারে আর্জি দিয়ে যাও। আবার কেউ তাবার্‌রুকের টিকেটের ব্যবস্থা করতে না পারলে তাকে তাবার্‌রুকের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিতেন।

আম্মা প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন। আমার নানা ছিলেন জমিদার। তাঁর বাবার বাড়িতে অঢেল ধনসম্পত্তি ছিলো, কিন্তু কোনদিনও ভাইদের কাছে কিংবা দেবর-ননদদের কাছে কোন সমস্যার কথা বলেননি, কোন টাকা-পয়সাও ধার চাননি। এভাবে তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করেছেন, পারতপক্ষে কারো দ্বারস্থ হননি।

আম্মা ছিলেন খুবই আধুনিক মন-মানসিকতাসম্পন্ন, সংস্কারমুক্ত, মুক্তমনা একজন মানুষ। যেমন, তিনি আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে কখনোই কোন

পার্থক্য করেননি। একমাত্র পুত্র সন্তান হিসেবে ভাইয়াকে কখনোই আমাদের বোনদের চেয়ে আলাদা কোন সুবিধা দেননি। আম্মার ৬ সন্তান আমরা সম অধিকার নিয়েই বড় হয়েছি।

অরেকটা বিষয় আমি শিখেছি, কোন কিছু জানা বা শেখার জন্য বাইরে বের হতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। বাইরে বের না হয়েও একটা মানুষ কিভাবে বাইরের দুনিয়াকে নিজের ভেতর ধারণ করতে পারে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমার আম্মা।

আম্মা সবসময় নতুন কিছু শিখতে ও তা করতে পছন্দ করতেন। যেমন নতুন নতুন রেসিপি দিয়ে রান্না করতে ও তা সবাইকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন। আম্মার তোষকের নিচে 'নক্শা'র রেসিপিগুলো রেখে দিতেন ও সেগুলো রান্না করে সবাইকে খাওয়াতেন।

আম্মা শালীনতা পছন্দ করতেন, তবে খুব বেশি রক্ষণশীল ছিলেন না। আমি সবসময় সবকিছুতে আম্মাকে অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করি... এভাবে যে, এই জায়গায় আম্মা হলে কি করতেন, কিভাবে চিন্তা করতেন।

আম্মা নিজে কখনোই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দরবারের টাকা-পয়সা খরচ করেননি। তিনি এটাও চাননি যে, তাঁর একমাত্র শাহ্জাদা (শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী মা.জি.আ) দরবারের আয়-উপার্জন দিয়ে চলুক। তিনি তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চিন্তা করেছেন ছেলের সংসার হবে, তাঁর স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন, সেজন্য তিনি আলাদা ব্যবসা করার চিন্তা করলেন এবং সে অনুযায়ী ভাইয়াকে গাইড করে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কতটুকু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হলে একজন মা তাঁর সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে সবকিছু গুছিয়ে দিয়েছেন।

দরবারের একটা টাকাও কখনোই তিনি নিজের কিংবা পরিবারের জন্য খরচ করেননি। তিনি নিজের জন্য কখনোই একটা কাপড়ও কিনেননি। যখন তাঁর ছেলেমেয়েরা শহরে পড়াশোনা করেছে, শহরে নিজের বাসা না থাকায় নানারকম সমস্যা হয়েছে, অথচ তিনি চাইলেই একটা জায়গা কিনে বাড়ি করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। কারণ তাঁর মধ্যে সেই ধরণের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা কোনটিই ছিলোনা।

আম্মার ব্যক্তিজীবন বলতে কিছুই ছিল না, তিনি দরবারের সাথে পুরোপুরিই মিশে গিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা, মেধা, মনন সবকিছুই দরবারকে ঘিরে আবর্তিত হতো। দরবারের বাইরে অন্যকিছুই চিন্তা করতেন না। গাউসুল আযম দরবারের খেদমতের জন্য আম্মাকে নির্বাচিত করেছেন, সেজন্যই আম্মার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। আম্মা প্রায় সময় বলতেন, আমি কি করেছি? আমার ভাণ্ডারীই আমাকে দিয়ে করিয়েছেন। এখানে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

SZHM ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত আম্মার থেকে শুরু হয়েছিলো। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও দূরদৃষ্টি সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতা দিয়ে ভাইয়াকে গাইড করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

আম্মা খুবই মেধাবী ছিলেন। কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একজন মহিলা হয়েও তিনি শূন্য থেকে একটি প্রতিষ্ঠানকে আজকের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, তা তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার কারণেই সম্ভব হয়েছিলো, তা আমরা এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। আমি প্রতিনিয়ত অনুসরণ করার চেষ্টা করি।

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উসিলায় আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আম্মার জীবনাদর্শগুলি অনুসরণ ও সে অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

শাহ্জাদী সৈয়দা কুমকুম হাবিবা
উম্মুল আশেকীন-এর সেজ মেয়ে

মা বলতেন : শ্বশুর বাড়ি নয় – দরবার

ছোটবেলায়, হয়ত ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ি। ঐ সময় একটি ইরানী ছবি দেখেছিলাম বিটিভিতে। ছোট একটি মেয়ে বয়স কত হবে সাত/আট। সে তার মায়ের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে নিচের এই পংক্তিটি লিখেছিল, বরফের উপর। তার নাম মালিহা, সে লিখেছিল–

Maliha is black · Maliha's car is black · Mother is white · Teacher is white · As white as snow.

আম্মার ক্ষেত্রে ঠিক এই উপমাটি যেন চলে As white as snow. বাইরেরটা যেমন সুশীতল, সুন্দর, শুভ্র ছিল। তাঁর ভিতরেরটাও তেমন ছিল; তাঁর সরলতা ও দরদী মন সবাইকে মোহিত করতো। তাঁর সরল ব্যক্তিত্ব, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অন্তরের ময়দানটা ছিল বিশাল। এটা সত্য যে আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোনীত বা পছন্দের মানুষের মানবীয় গুণাবলির বিশালত্ব দান করেছেন। ভক্তরা খুঁজে পেয়েছিল 'মা'জান'। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি ভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজন সবার প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা, দরদী এবং নমনীয় ব্যবহার প্রদর্শন করে গেছেন। এটা লোক দেখানো ছিল না। আমরা যারা সবসময় তাঁর আশে পাশে ছিলাম কখনো তাঁকে এসব ব্যাপারে বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। আল্লাহ্-রাসূল, মুনিব-মুর্শিদের প্রতি অগাধ দরদ, ভক্তি ও আনুগত্যই সম্ভবত তাঁকে দরবারের খেদমতের প্রতি এতটা অকৃত্রিম অবিচল করেছিল। কর্মে খুব তৎপর এবং দক্ষ ছিলেন। গুণবতী, গুণি বলতে যা বোঝায়, আল্লাহ্ পাক তাঁকে শাহানশাহ্ বাবাজানের সহধর্মিনী হিসেবে সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

গাউসিয়া হক মন্‌জিলের ভেতর বাড়িতে পুরুষ মানুষ আসা নিষেধ। এটা বাবাজানই করে গিয়েছিলেন। মা'জান শুধু মেয়ে ভক্তদের সাথে দেখা করতেন। ভক্তরা যখনই আসত তখনই তিনি দেখা করতেন, সময়ের কোন ব্যাপার ছিল না। ভক্তদের মধ্যে থাকতে এবং তাদের খেদমতে মা'জান অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। যেন সন্তানদের মাঝে বসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনছেন আর তাদের সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। সবকিছু সহজভাবে নিতেন কঠোরতা পছন্দ করতেন না।

আম্মা একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিডনীতে পাথর। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অপারেশন করাতে হবে। এমতাবস্থায় আব্বা এসে উপস্থিত হন। আব্বা সহাস্যে আম্মাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন এবং একপর্যায়ে হাসতে হাসতে বলেন, "সবাই 'মা' 'মা' বলে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই আপনাকে দেখতে আসলাম"। এই কথাটা বলতে বলতে আম্মা খুব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। আব্বা আম্মাকে খুব সম্মান করতেন এবং প্রশংসাও করতেন খুব। আম্মা শ্বশুরবাড়িকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন। শ্বশুরবাড়িকে দরবার হিসেবে বেশি জানতেন এবং মানতেন। তাই শ্বশুরবাড়িতে তাঁর চলাফেরায় কোন আড়ম্বরতা ছিল না, ছিল দরদী খেদমত। আল্লাহ্‌র দরবারকে এতটা ভালোবাসা এবং সম্মান করার কারণে হয়তো, আল্লাহ্ পাক তাঁর সম্মানকে আকাশচুম্বি করে দিয়েছেন। দাদা-দাদীকে আম্মা খুবই ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন।

সবসময় দাদা-দাদীর প্রশংসা করতেন। দাদার জ্ঞান এবং বিচক্ষণতা আর ভক্তদের প্রতি দাদীর দরদী ও নমনীয় ব্যবহার আম্মাকে মুগ্ধ করত। দাদা এবং দাদী ছিলেন আম্মার আদর্শ। আব্বা ছিলেন আম্মার পীর। এটা আমার কোন মনগড়া কথা নয়। স্বয়ং আম্মাই এটা বলেছিলেন। আম্মা আব্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার পীর কে?" উত্তরে আব্বা নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, "আমি"। এইভাবে দুইবার জিজ্ঞাসা করেন দুইবার একই উত্তর দেন আব্বা। আব্বা যখন খুব জালালী অবস্থায় কাউকে খুব উচ্চস্বরে বকাঝকা করতেন তখন আম্মা কাউকে পাঠিয়ে লোকটিকে সরিয়ে দিতেন।

আব্বার প্রতিটা ব্যাপারে আম্মার নজর ছিল অনেক বেশি। আব্বা যখন বাড়িতে থাকতেন তখন আম্মা দিনে-রাতে সারাক্ষণ আব্বার ঘরের আশপাশে ঘুরাঘুরি করতেন। আব্বা কাউকে ডাকছেন কি না, আব্বার কিছু প্রয়োজন হচ্ছে কি না, আব্বার দরজা বন্ধ আছে কি না, আব্বা খাবার গ্রহণ করবেন কিনা – এসব বিষয়ে সবসময় সতর্ক থাকতেন।

আব্বার সাথে আম্মার যখন বিয়ে হয় তখন আম্মার বয়স মাত্র পনের বৎসর। আম্মার তাতে কোন কষ্ট নেই। কারণ তিনি বিশ্বাসই করেন না যে তাঁর স্বামী দুনিয়া বিমুখ আল্লাহ্‌র রাহে ফানা ব্যতীত অন্যকিছু। আম্মা এটা তাঁর মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন গভীর দরবার ভক্তি। যা তাঁকে জানান দিয়েছিল যে দরবারের আওলাদ আর যাই হোক মজ্জুবে মাহজ হতে পারে না, ঐশী ভাব-বিভোর হতে পারে। পনের বৎসর বয়সে এটা বুঝতে পারা সহজ ব্যাপার না।

আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য তাদের উপযুক্ত সহধর্মিনী সৃষ্টি করেন।

আমি একবার আম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আম্মা আপনার বিবাহিত জীবনের প্রথম সময়ে আব্বা যে এরকম তা দেখে কি আপনার কষ্ট হত না?” তার উত্তরে আম্মা আমাকে যা বলেছিলেন তার জন্য আমি একবারে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি অবাক হয়ে যাই তাঁর উত্তর শুনে। তিনি বলেন, “না আমার কাছে তাঁকে কখনো অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তাঁর কথাবার্তা চলাফেরা কিছুই আমার কাছে অদ্ভূত মনে হয়নি। আমার কাছে তিনি এখন যে অবস্থায় আছেন তাই মনে হয়েছিল”। অবাক হওয়ারই ব্যাপার, পনের বৎসর বয়সে কি করে একটি মেয়ে এতদূর বুঝতে পারেন!

আম্মা অসাধারণ সাংসারিক জীবনে ছিলেন। সংসারে নিজের আমিত্বটা বাদ দিয়েছিলেন। সংসারের কাজে এতই দক্ষ ছিলেন যে, মন্‌জিলের যে কোন সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন খুব সহজে। ধান ক্ষেতের কোন সমস্যা থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ারের বিল্ডিং তৈরিতে কোন সমস্যাও তিনি খুব দ্রুত সহজভাবে সমাধান দিতে পারতেন।

রান্না-বান্নার হাত ছিল অসাধারণ। একবার খেলে ভোলা যেত না। কোন কিছু খেয়ে তিনি তা রান্না করে ফেলতে পারতেন। নিজ হাতে রান্না করে, সবার প্লেটে খাবার তুলে দিয়ে একসাথে বসে খাওয়াটা মা খুব পছন্দ করতেন। কেউ যদি মন খুলে না খেত তিনি স্বস্তিতে খেতে পারতেন না। আব্বার ও ভাইয়ার পছন্দের খাবারগুলো রান্না করতে পছন্দ করতেন।

আম্মা খুব সাদামাটা ছিলেন। বেশি খরচ করা, বিলাসিতা, লোক দেখানো কোনকিছু করা একদমই পছন্দ করতেন না। তিনি জীবিত অবস্থায় অনেক খ্যাতিমান মানুষ দরবারে আসেন, তাদের মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও আছেন। আম্মা তাঁদের সাথে দেখা করেন ঘরোয়া কাপড় পরিধান করা অবস্থায়, ঘরোয়াভাবে কথা বলেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে।

আম্মা খুবই গুণবতী ছিলেন। কিন্তু নিজের গুণ নিয়ে কোন অহংকার ছিল না তাঁর। নিজের গুণ, কর্মদক্ষতা এবং মানবীয় গুণাবলি দিয়ে দরবারকে সাজিয়েছিলেন। সবসময় বলতেন, “এতকিছু কি একজন মেয়ে মানুষের পক্ষে সম্ভব? আল্লাহ্ করিয়েছেন বলে সম্ভব হয়েছে”। তিনি শত্রুরও কখনো অকল্যাণ

কামনা করতেন না। তাঁর এই গুণটা হয়ত তাঁকে ভিতরে বাইরে জ্যোতি এনে দিয়েছিল।

আম্মা মাতৃত্বের দিক থেকে অতুলনীয়। সংসারে প্রতিটি স্ত্রী – স্বামীর সাহায্য নিয়ে সংসারকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারমধ্যে কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে আবার কেউ পারে না। আম্মা এসব ব্যাপারে একেবারে ব্যতিক্রম। তিনি একাই সন্তানদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন অত্যন্ত সফলতার সাথে। এ ব্যাপারে লিখলে একটা মোটাসোটা বই হয়ে যাবে। আসলে আমি সবকিছু সংক্ষেপেই লিখছি।

একজন মা-ই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষিকা বা পথ প্রদর্শক। মা-ই পারে একটি সন্তানকে ভাল এবং খারাপ কাজে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে। একজন মা যা সন্তানও তা। আমগাছে আম হয়, জামগাছে জাম। আম্মার প্রভাব আমাদের উপর প্রবল। তিনি দরবারকে প্রকৃত ভক্তি, মান্য করা এবং খেদমতের মাধ্যমে আমাদেরকে তা শিখিয়েছেন। "দরবারে ভেদাভেদ নেই, সবাই ভক্ত। তাদের প্রতি ভালবাসা, দরদ এবং সম্মান সমান থাকতে হবে। অহংকারের কোন সুযোগ এখানে নেই। সুতরাং অহংকার করা চলবেনা। বিনয়ী হও" – এই ছিল আম্মার শিক্ষা।

দরবার থেকে কোথাও যেতে চাইতেন না, আমদের যাওয়াটাও পছন্দ করতেন না। কোথাও গেলে দরবারের প্রতি খুব টান অনুভব করতেন। বাচ্চাদেরকে নিয়ে দরবারে থাকাটা বেশি পছন্দ করতেন। আমাদেরকে সব ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। কি ধর্মীয় শিক্ষা, কি বিদ্যালয়ের শিক্ষা। একা একজন মেয়ে মানুষের পক্ষে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনেক কষ্টের। এখনকার মত তখন সহজে শিক্ষক পাওয়া যেত না। তার ব্যবস্থাও করতেন। পড়ালেখায় কোন ত্রুটি রাখেননি। সবাইকে শিক্ষিত করেছেন। পড়া-লেখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। আমার ছোট বোন কানিজকে ডাক্তারী পড়ানোর শখ ছিল, তা অবশ্য পরে আমার বড় বোনের মেয়েকে পড়িয়ে পুষিয়ে নেন।

আম্মার দূরদর্শিতা বুঝতে পারলে যে কোন ব্যক্তি অবাক হবে। মেয়েদের ধর্মীয় আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুনের মধ্যে বড় করে উত্তম শিক্ষিত পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। যদি তা একজন বাবার পক্ষেও সম্ভব না। ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত, দরবারের যথোপযুক্ত আওলাদ এবং দাদার মত খাদেম হিসেবে তৈরি করা একমাত্র আম্মার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

আব্বার ওফাতের পর দুই-তিন বছর আম্মাকে শহরে থাকতে হয়। ঐ সময় প্রতিদিনই তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকতেন দরবারে যাওয়ার জন্য। অনেক কষ্ট করে তাঁকে বুঝিয়ে নিবৃত করতে হত। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত সবাইকে কি পরিমান মায়া-মমতা ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। অসুস্থ্ অবস্থায়ও সবাইকে নিয়ে ভাণ্ডারী গান শুনতে পছন্দ করতেন। আল্লাহ্ পাক সেই ভরা মজলিশেই তাঁকে শায়িত করেছেন শাহানশাহ্ বাবাজানের পাশে। এটাই তাঁর যথোপযুক্ত স্থান। তিনি দুনিয়াতে কি জ্যোতির্ময় ছিলেন, আল্লাহ্ পাক পরপারে তাঁর কবরকে আরো জ্যোতির্ময় করুন। আমিন।

শাহ্জাদী সৈয়দা মুনমুন হাবিবা
উম্মুল আশেকীন-এর চতুর্থ মেয়ে

আমার মা ছিলেন আধুনিক মনস্কা

আমরা যখন ছোট ছিলাম গৃহশিক্ষক আমাদের পড়াতে আসতেন। প্রায়ই আমাদের বলতেন আম্মাজান জাহাজ চালাচ্ছেন। কথাটা শুনে হাসতাম। বয়স কম ছিল তাই বুঝতে পারতাম না। সারাদিন আম্মা অনেক সময় দিতেন আমাদের কিসে ভাল হবে, কোন ভাল খাবারটা দিবেন, কিভাবে আরও ভাল রাখা যায়, মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় তা যত্ন করে প্রতিনিয়িত শিখিয়েছেন। সবার সাথে যোগাযোগ রাখা, সবার কাছে যাওয়া ইত্যাদি। আমরা গ্রামে ছিলাম। শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে যাওয়া বা দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার তেমন সুযোগ ছিল না। তাই মাকে নিয়েই আমাদের ছোট জগৎ, যেখানে আমাদের মধ্যমণি হলেন আমার মা।

ভক্তরা যখন আসতেন তখন আম্মা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করেছে কিনা, কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তদারকি করতেন খুব আন্তরিকতার সাথে। দেখেই মনে হত প্রত্যেক ভক্তই যেন মায়ের কত আপন, গভীর সম্পর্ক। তারা মন খুলে সব কথা বলতেন, মুহূর্তের মধ্যে আম্মা সমাধান দিতেন। আসলে আম্মা কথায়, চিন্তায় ভাবনায় আধুনিকমনা একজন মানুষ ছিলেন। আমরা হয়ত না বুঝেই নালিশ করেছি। তিনি সবার কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অন্যজনকে দোষ না দিয়ে সমস্যা খুঁজতে বলতেন, কি কি কারণ জানতে চাইতেন। এটা এভাবে কর কিংবা ঐভাবে করতে পার বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে সমাধান দিতেন।

আম্মাজানের সাথে সাক্ষাত ভাললাগার ও ভালবাসার জায়গায় পরিণত হয়েছিল ভক্তদের কাছে। মহিলা ভক্তদের সাথে পরামর্শ করতেন। খেদমতকারীদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন, দূর্বলের প্রতি আকর্ষণ ও গভীর ভালবাসা ছিল। অসহায় মানুষের সাথে কথা বলা, সাহায্য করা ও ভরসা দিতেন। মাজার জিয়ারত করে আম্মাজানের সাথে সাক্ষাত নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। আম্মাজানের সাথে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন মহিলা ভক্তরা, মনে হত যেন মিষ্টি পিঠা দেয়া হবে!! খুব অসুস্থ অবস্থায়ও ভক্তদের সাথে দেখা করতেন।

পশুপাখির প্রতি খুব মায়া ছিল তাঁর। আম্মা তখন খুব অসুস্থ, দুনিয়া থেকে চলে যাবার এক সপ্তাহ্ আগে ভাইজানের বাসায় আম্মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। স্যুপ বানানোর জন্য কিছু মুরগি আনা হয়েছিল। হুইল চেয়ারে বসিয়ে আম্মাকে এক

রুম থেকে অন্য রুমে নিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় আম্মার চোখে পড়ল মুরগিগুলি রোদে চেঁচামেচি করছে। আম্মা ইশারা করলেন, মুরগিগুলিকে রোদ থেকে এনে ভিতরে ঢুকিয়ে পানি দিতে। ভিতরে ঢোকা মাত্রই শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আম্মার এই ব্যাপারটা নানার মধ্যেও ছিল। বাবাও সেরকম ছিলেন। দাদা হুজুর বলতেন নানার মত দরবার ভক্ত আর দেখা যায় না।

মা'জান-এর আম্মার (আমার নানু) পরোপকারী মনোভাব ছিলো। জমিদারের বৌ হয়েও আমার নানু রাত বিরাতে বের হয়ে যেতেন ধাত্রীর কাজ করতে। এমন কি দুধ পান করানোর জন্য বাচ্চা নিয়ে আসতেন, অনেকদিন রাখতেন। আম্মার সাথে ঘনিষ্ঠতা দেখে জানতে চেয়েছিলাম এরা কারা? তিনি বলেন, আমাদের মতোই ওদের লালন পালন করেছেন। এভাবেই দুঃখী অসহায় মানুষের পাশে থাকতেন। আম্মাকে অনেকক্ষণ না দেখলেই বুঝতে পারতাম ভক্তদের সাথে আছেন। অনেক মহিলাদের দরবার সম্পর্কে জ্ঞান দিতেন। উরস এলেই স্বেচ্ছাসেবকরা যেমন উৎসাহ নিয়ে দায়িত্ব পালন করতেন, ঠিক তেমনি আম্মাও খুব ভোরে উঠে মানুষের দেখাশোনা ও তদারকি করতেন। সবদিক সামলে নিতেন। ভাইজান যখন ছোট ছিলেন হক মন্‌জিলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত একাই নিতেন। হক মন্‌জিলের দেখাশোনা করতেন জামাল সিকদার সাহেব ও বখতেয়ার সাহেব (দুলাভাই)।

হক মন্‌জিলের জন্য সামনের জায়গাটা দরকার ছিল। তখনকার দিনে অনেক টাকা খরচ করে নিতে হয়েছে। কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না। মহিলাদের মাধ্যমে সুন্দর করে বুঝিয়ে কাজটা করেছিলেন। জোর করে আদায় না করে ভাল দিকটা (দরবারের ভক্তদের জন্য প্রয়োজন) সততার সাথে বুঝিয়ে কাজটি করেছিলেন। আম্মা যদি এ বিষয়ে না জড়াতেন তাহলে ঝগড়া বা বড় ধরণের ঝামেলা হতে পারতো। কেনাবেচার ব্যাপারেও দেখা গেছে এক মন্‌জিলের শাহ্‌জাদা অন্য মন্‌জিলের কর্মচারী এসেছেন কিনতে তখন তিনি কাকে বেশি প্রাধান্য দিবেন। এমন সব জটিল জটিল বিষয় সুন্দর ব্যবহার দিয়ে সকলের সম্মতিতে সততার সাথে কৌশল অবলম্বন করে সমাধান করতেন। পরম যত্নে নিষ্ঠায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তিনি সারাজীবন।

পরিবারের দেবর ননদের কথা শুনলে খুশি হয়ে যেতেন। তাদের সম্পর্কে সবসময় ভাল কথা বলতেন। ছোট ফুপুআম্মার কথা প্রায়ই বলতেন। মাঝে পুরোনো দিনের গল্প বলতেন ছোট ফুপুর সাথে। তখন ছোট ফুপুর বিয়ে ঠিক

হয়েছে। ছোটফুপুর শ্বশুর বাড়ি হতে লাচ্ছি সেমাই পাঠিয়েছে। এতো বেশি পরিচিত ছিলো না লাচ্ছি সেমাই তখনকার দিনে। মাজান দেখলেন ছোটফুপু আর মেঝোফুপুর মেয়ে রানু আপা লাচ্ছি সেমাই খাচ্ছেন। মাজানেরও খেতে ইচ্ছে করছিলো। আমি (কানিজ) তখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে দেয়নি? আপনি খান নি? মাজান তখন মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, দিয়েছে তো একবার। আমি তো বউ মানুষ। তখনকার সেই বউদের সীমিত আচরণ এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এই কথাগুলো।
আমার বুদ্ধি হবার পর থেকেই দাদার গল্প শুনেছি। বাবা (দাদা) এটা করতেন, ওটা করতেন, সময়মতো ঘুম থেকে উঠতেন, ভাত বেশি হলে দুই ভাগ করে এক ভাগ রেখে দিতেন। নানার গল্প তেমন একটা শুনিনি। আসলে মা ও দাদার মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। খেয়াল করেছি দাদার সবকিছুই আম্মা পছন্দ করতেন।

আম্মা দরবারের খেদমত করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। ভেতর বাড়ির ব্যাপারে আম্মা যেমন ছিলেন আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান তেমনি বহির বাড়ির ব্যাপারেও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। মন্জিলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন মন্জিলের সামনের জায়গা ক্রয়ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে এবং যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার মাধ্যমে আম্মার গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি মন্জিলের অদূরবর্তী জায়গা কেনার ক্ষেত্রেও দেখা মেলে আম্মার এক বিশাল মানবিকতার পরিচয়। ঐ সমস্ত পরিবারের মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদের অনুভূতি উপলব্ধির মাধ্যমে, তাদের মনকে শান্ত করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। মানুষের মনের সাহসকে জাগিয়ে, মনের ঘরের কোণে থাকা কষ্ট, ভয় দুর্বলতার উর্ধ্বে থাকার জন্য তিনি যেভাবে মানুষকে উপদেশ দিতেন তা দূর থেকে দেখে খুব আনন্দ পেতাম। এগুলো মনে হয় আমাদের সবার জন্য অনুকরণীয়।

শাহ্জাদী সৈয়দা কানিজ ফাতেমা
উম্মুল আশেকীন-এর ছোট মেয়ে

স্মৃতিতে অমলিন উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর যোগ্য সহধর্মিনী আমাদের মা জননী উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) গাউসিয়া হক মন্‌জিল প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি দরবার ও গাউসিয়া হক মন্‌জিলের জন্য অসীম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেন। বাবাজানের কথা, কালাম ও ইশারা তিনি বুঝতে সক্ষম ছিলেন। শাহানশাহ্ বাবাজানের (ক.) রিয়াজত, সাধনা, কারামত অনুধাবন করতে পারতেন মা-জান। মূলতঃ মা'জানের চেষ্টা, মেহনত ও কষ্ট সাধনার ফসল আজকের গাউসিয়া হক মন্‌জিল। শাহানশাহ্ বাবাজান আমার খালু এবং পরবর্তীতে আমার শ্রদ্ধাষ্পদ শ্বশুর হন। অর্থাৎ শাহানশাহ্ বাবাজানের (ক.) একমাত্র ছেলে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.) আমার খালাতো ভাই। তাঁর মা আমার খালাম্মা।

পরবর্তীতে শাহানশাহ্ হুজুরের বড় কন্যা সৈয়দা জেবুন্নাহার বেগমের সঙ্গে আমার পরিণয় সূত্রে এই বুজুর্গ পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন আরো দৃঢ়তর হয়। শাহানশাহ্ বাবাজানের (ক.) বড় কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ ১৯৮৪ সনে। আরো আগে ১৯৭৮ সন থেকেই হয় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আমার যাওয়া আসা এবং গড়ে ওঠে হৃদ্যতার সম্পর্ক। আল্লাহ্ পাকের কি যে মেহেরবানি, মাইজভাণ্ডার শরিফের মহাত্মা বুজুর্গ পরিবারের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের সৌভাগ্য ঘটে। এজন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে জানাচ্ছি অফুরন্ত শুকরিয়া। হযরত মাশায়েখে কেরামের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অকুণ্ঠ চিত্তে।

আমার আরো বড় সৌভাগ্য যে, মাইজভাণ্ডারী দর্শন প্রচারে নিবেদিত ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক সংগঠন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটিতে দীর্ঘদিন ধরে আমি সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একমাত্র আওলাদ মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন রাহ্‌বারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম.) কৃপায় আমি গাউসিয়া হক কমিটির একজন দায়িত্বশীল হিসেবে সাংগঠনিক পন্থায় মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রচার প্রসারে, দ্বীন

ও সুন্নিয়তের খেদমতে এবং মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখতে সক্ষম হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্।
আগেই বলেছি, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজান কেবলার (ক.) বড় মেয়ের জামাতা আমি। তাই উম্মুল আশেকীন মা-জান মুনাওয়ারা বেগমকে (রহ.) দীর্ঘদিন ধরে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমার স্বচক্ষে দেখা এমন গুণধর কীর্তিমতি মহীয়সী রমণীর যেন কোনো তুলনাই হয় না। উদারতা, অতিথিপরায়ণতা তথা মেহমানদারি, সবার প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার অসাধারণ গুণ ছিল মা-জানের মাঝে। তিনি দরবারের ছোট বড় সবার খোঁজ খবর নিতেন। দরবারে যা হাদিয়া নজরানা নেওয়াজ আসতো তা সবার মাঝে বিলি-বণ্টন করে তিনি তৃপ্তি ও আনন্দ পেতেন। দরবারে ভেতর বাড়িতে গিয়ে কোনো ভক্ত-নারী-শিশু না খেয়ে কখনো আসতেন না। মা-জানের মেহমানদারি ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত।

যে গুণ-বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজানের (ক.) মাঝে। যা বর্তমানে মওলা হুজুর কেবলার (ম.) মধ্যেও বিদ্যমান। হাদিস শরিফে আছে, পরস্পর সালাম বিনিময় এবং সবাইকে আপ্যায়ন করানো বা খাওয়ানো প্রিয় নবীজীর (দ.) অনুসৃত এবং ইসলাম নির্দেশিত সেরা পন্থা। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজান (ক.) এবং উম্মুল আশেকীন মা জননী মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)।
যখন থেকে গাউসিয়া হক মন্‌জিল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই মা-জননী বহু কষ্ট মেহনতের মাধ্যমে পুরো পরিবারকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন মন্‌জিলের অন্যতম স্থপতি ও রূপকার। পাঁচ মেয়ে ও একমাত্র ছেলেকে তিনি পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন-পরিবার-পরিজন সবার সবকিছু তদারকি করতেন। মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের অগাধ ক্ষমতা ও পারঙ্গমতা আমি মা-জননীর জীবনে লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি বারবার।
কেউ বিপদে পড়লে বা সমস্যায় থাকলে তা তিনি সমাধানের চেষ্টা করতেন, দোয়া করতেন। ভালো সুপরামর্শ দিতেন। যেকোনো ফরিয়াদি মানুষ হোক নারী-শিশু বা অন্য কেউ সবার সঙ্গে তিনি শিশুসুলভ সদাচরণ সুন্দর ব্যবহার করতেন। মুচ্‌কি হাসি দ্বারা সবাইকে মুহূর্তেই আপন করে নিতেন। কোনো

নারী-শিশু আম্মাজানকে কোনো বিষয়ে আর্জি ও আবেদন পেশ করলে তার সমাধানের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করতেন, আল্লাহ্‌র দরবারে হাওলা করতেন। মাশায়েখে কেরামের নজর করমের জন্য দোয়া-আশীর্বাদে সবাইকে ধন্য করতেন। এক কথায় দয়া মহানুভবতা, সরলতা, নির্লোভ, নিরহংকার, সাদাসিধে ব্যক্তিত্বের অধিকারী অসাধারণ মহীয়সী নারীই ছিলেন উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)।

আমার এই জীবনে এমন গুণধর নারী আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। তাঁকে হারিয়ে আমি আজ গভীরভাবে শোকাহত। মা-জানকে প্রায়ই আমার মনে পড়ে, চোখের সামনে তাঁর নূরানি চেহারা অবয়ব এখনো বারবার উঁকি দেয়। মা-জানকে সত্যিই কখনো ভুলবো না, ভুলতে পারি না, তিনি আছেন আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তাঁর স্মৃতি আজও অমলিন। তাঁর শূন্যতা অপূরণীয়ই থেকে যাবে।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজান (ক.) যেমন ভক্তকুলের প্রতি আধ্যাত্মিক করুণাসুধা বিলিয়ে গেছেন জীবনভর, তেমনি তাঁরই যোগ্য সহধর্মিনী উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগমও (রহ.) স্বামীর প্রদর্শিত কদমে চলে আজীবন ভক্ত অনুরক্তদের উপকার করে গেছেন। মা'জানের দুয়ার ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। ধনী-গরীব সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। সবাই তাঁর আচার ব্যবহারেও মুগ্ধ হতো। শিশুসুলভ সারল্য, বিনয় ও উদারতার মহৎ গুণ ছিল তাঁর মাঝে। ধৈর্য ধরে সহানুভূতির সঙ্গে ভক্ত-ফরিয়াদির আর্জি-আর্তি শুনতেন। যাকে যেভাবে সহযোগিতা দেয়া দরকার সেভাবে দয়া ও অনুগ্রহ দেখাতেন। মা-জানের দোয়ায় অনেকে নানাভাবে উপকৃত হতো।

ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও দরদ ছিল। জীবনে কাউকে ধমক দিয়ে কথা বলেননি। কারো সঙ্গে বৈরিতা বা অসন্তুষ্টিভাব দেখাননি। সব সময় সবর শোকর করার এবং মহান আল্লাহ্ পাকের ওপর ভরসা রাখার পরামর্শ দিতেন ভক্ত অনুরক্তদেরকে। বিপদে মুসিবতে সবর করার তালিম দিতেন। মা-বাবার খেদমতের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতে সাফল্য ও মুক্তি ঘটে তাই তিনি ফরিয়াদি মানুষকে বলতেন। তাঁর দোয়ায় অগণিত মানুষ উপকৃত হন। তাঁর পরামর্শে ও আশীষে বহু ফরিয়াদি মানুষের জীবন বদলে গেছে। অনেকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এমন নিঃস্বার্থ মহীয়সী ত্যাগী নারীর

সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা সৌভাগ্যবান। তাঁদের জীবন অবশ্যই ধন্য ও কামিয়াব।

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম আজ আমাদের মাঝে সশরীরে নেই। কিন্তু তাঁর রুহানি নজর করম নিশ্চয়ই আমাদের মাথার ওপর ছায়া হিসেবে সদা বিরাজমান। এ ধরনের মহীয়সী ব্যক্তিত্বরাই দুনিয়া আখেরাতে আমাদের নাজাত ও পরিত্রাণের উসিলা।

মা'জান আজ দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর রুহানি দয়া-কৃপায় চিরদিন আমরা ধন্য হবো। তিনি স্নেহ-ভালোবাসার যে বন্ধন রেখে গেছেন তা কখনো বিস্মৃত হবার নয়। মাইজভাণ্ডারী মাশায়েখে হযরত, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ বাবাজান কেবলা (ক.), মা-জননী (রহ.) এবং বর্তমান মওলা হুজুর কেবলার (ম.) শুভ দৃষ্টিতে আমাদের জীবন সুন্দর ও কামিয়াব হোক, মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই ফরিয়াদ। আমিন, বেহুরমতি সৈয়্যদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আলহাজ রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী
সভাপতি, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ
উম্মুল আশেকীন-এর বড় মেয়ের জামাতা

আম্মা একজন আল্লাহ্‌প্রেমি সাধক

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে আমাকে ভক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, এজন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজারো শোকরিয়া জানাচ্ছি।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে থেকেই আমি দরবারের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। যখনই আমি দরবারী গান, ওয়াজ মাহ্‌ফিল ও মানুষ জনের মুখে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে শুনতাম তা আমি মনোযোগ সহকারে শুনতাম ও তখন আমার মনের মধ্যে এক ধরণের ভাবাবেগ সৃষ্টি হতো। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে কিভাবে সম্পৃক্ত হওয়া যায় সেই ইচ্ছাই জাগতো।

দরবারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিয়ের পূর্বের কয়েকটি ঘটনা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ) পাশ করার পর কে.পি.এম-এ চাকরি শুরু করি। এর ৪/৫ বৎসর পর আমি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সেজ শাহ্‌জাদী সৈয়দা কুমকুম হাবিবা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।

আমি দরবারকে খুবই ভালোবাসি, সম্মান করি কিন্তু দরবার থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসার পর আমার মনের মধ্যে ভয় হতো এই ভেবে যে, দরবারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এতো বড় দরবারের মান-সম্মান, শান-শওকত আমি রক্ষা করতে পারবো কিনা? এজন্যই আমি খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম, আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।

অবশ্য বিয়ের আগে থেকেই আমার মেজো ভায়রার (শাহানশাহ্ বাবাজানের মেজো জামাতা প্রকৌশলী কামালুর রহমান) সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো। আমি তাঁকে আমার আর্থিক, মানসিক অবস্থা ও আমার সামাজিক অবস্থানের কথা জানিয়ে, তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে শাহ্‌জাদীদের ব্যাপারে বললেন, "তাঁরা হচ্ছেন পানির মতো, যেখানে যে পরিবেশেই যাবেন মানিয়ে নিতে পারবেন"। একথা শোনার পর আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আমি আশান্বিত হলাম।

এরও কিছুদিন আগে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর আমি একজন ধার্মিক পরহেজগার হুজুরের কাছে গিয়ে এস্‌তেখারা করিয়েছিলাম। হুজুর কয়েকদিন পর আমাকে

জানাবেন বলেছেন। কয়েকদিন পর তিনি (হুজুর) আমাকে এ ব্যাপারে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।
বিয়ের ব্যাপারে আরেকটা ঘটনা না বললেই নয়। বিয়ের কথাবার্তা চলাকালীন আমি যখন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা, তখনই একদিন আমার মেজোভাই শফিউর রহমান চৌধুরী বললেন, "ঘর বাড়ি সব জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে"। তিনি আমাকে এই বিয়ের ব্যাপারে খুবই জোর দিচ্ছিলেন। আমি আমার দ্বিধাগ্রস্ততার কথা বলার পর তিনি জোর দিয়ে বললেন, "এখানে তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, না হলে আমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে"।
এরপর আমি আরো গভীরভাবে চিন্তা করলাম, নিশ্চয়ই এখানেই আমার জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে, তা নাহলে এতগুলো ঘটনা কেন ঘটছে। এভাবে আমি বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম।
আম্মাজান একজন অনন্য মহিয়সী মহিলা ছিলেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা, আদেশ-উপদেশ আমাকে প্রভাবিত ও আন্দোলিত করতো। যেমন কোন লোক যখন তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে আসতো কিংবা আমরা যদি আমাদের সমস্যা জানাতাম তখন তিনি সেটা নিজের সমস্যা মনে করে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা নিয়ে ভাবতেন। তিনি সেটা আন্তরিকতার সাথে সুন্দরভাবে সমাধান দিতেন। এটা আমার কাছে অবাক লাগতো কিভাবে তিনি এতো সুন্দর করে জটিল, কঠিন সমস্যার সমাধান দিতেন। তিনি আমাদের এতো আদর, যত্ন করতেন যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, একেবারেই কল্পনাতীত।
আমি যখন কে.পি.এম-এ চাকরি করতাম তখন একদিন রাতে শহরে চলে আসতে চাচ্ছি, পরদিন অফিস করার জন্য। তিনি বললেন, "তুমি বাবা যেও না, কালকে যেও"। এভাবে তিনি ৪/৫ বার আমাকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরদিন অফিসে মিটিং থাকায় আমি শহরে চলে আসার জন্য অস্থির হয়ে গেলাম এবং এরপর আমি শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এর মধ্যে প্রথম বাধাটা পেলাম ঝংকার সিনেমার কাছে সেখানে কি যেন ঝামেলা হয়েছে গাড়ি চলছে না। হেঁটে হেঁটে অনেকটুকু আগালাম। এরপর নাজিরহাটের মোড়ে এসে আবার আটকে গেলাম, এখান থেকে কোনরকমে একটি গাড়ি চড়ে আমি আসলাম হাটহাজারীতে। ওখানে এসে দেখলাম গাড়ি চলছে না, মারামারি হচ্ছে, সামনে আর যাওয়া যাবেনা। এভাবে আমি বার বার বাধা পাচ্ছিলাম। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমার আর সামনে আগানো ঠিক হবে না। এরপর আমি আর সামনে

না গিয়ে প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা/বারোটার দিকে হেঁটে হেঁটে দরবারে আবার ফিরে আসলাম এবং সে রাত দরবারে অবস্থান করি।

পরদিন সকালে আম্মাকে আমি আগের রাতের কথা জানালাম এবং সকালবেলা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

এ থেকে আমি আম্মার আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। আমার তখন মনে হচ্ছিল আমি যদি আরো সামনে আগাতাম, তাহলে আমার অনেক বড় বিপদ হতে পারতো। সেজন্য আম্মা আমাকে এভাবে বার বার শহরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করছিলেন।

আমি বুঝলাম, আম্মা একজন আল্লাহ্ প্রেমি, অলি আল্লাহ্। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের কুদরত দেখতে পান, তাঁরা আল্লাহ্ অনুরাগী, আল্লাহ্ পাক তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাবলে তিনি অনেক কিছু আগে থেকেই বুঝতে পারতেন। সেদিনের সেই ঘটনার কথা মনে করেই আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আমরা কিভাবে উন্নতি করবো সবসময় তিনি সেই চিন্তাই করতেন। আমরা কিভাবে সমাজে ভালো অবদান রাখবো, প্রভাব রাখতে পারবো সেই ব্যাপারে তিনি আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণা ও সাহস দিতেন। আমার মনে হয় তিনি অনেক দূর দেখতে পেতেন, তিনি আমাদের সবসময় স্বপ্ন দেখাতেন এবং বলতেন, "বড় একটা কিছু কর"। এভাবে তিনি আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনুপ্রেরণা ও আদর্শ হয়ে আছেন।

আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর জন্য সবসময় দোয়া করি।

প্রকৌশলী আজিজুর রহমান চৌধুরী
এক্স সিইও (কাফকো)
উম্মুল আশেকীন-এর সেজ মেয়ের জামাতা

মওলা হুজুর প্রায়শ আম্মার মতামত নিতেন

উম্মুল আশেকীন-এর চতুর্থ জামাতা আমি। আমাদের আম্মাজান সম্পর্কে লিখতে হলে অনেক লেখার পরেও শেষ করা যাবে না। তারপরেও সংক্ষিপ্তভাবে আমি কিছু লেখার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আম্মা খুবই মিষ্টিভাষী ছিলেন। মানুষের কথা মন দিয়ে শুনতেন আর সুন্দর মিষ্টি কথা দিয়ে মানুষের মন হাসি খুশিতে পরিপূর্ণ করে দিতেন। আম্মার হাসি ছিল অসাধারণ। এই সুন্দর হাসি দিয়ে যে কোন মানুষের দুঃখকষ্ট মুহূর্তেই নিভিয়ে দিতেন। আম্মার অন্তরটা ছিলো অনেক বড়ো আর তাই যে কোন কেউ তাঁর সংস্পর্শে এলেই তাদের অন্তরটা বিশাল হয়ে যেতো। আম্মা কোন সময় কারো মনে কষ্ট দেননি বা কোন কটু কথা বলেননি।

আম্মা ছোট বড় সবাইকে অনেক সম্মান করতেন আর সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। আর এই গুণের মাধ্যমে তিনি সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতেন। অনেক সময় দেখেছি অনেকে মনের অশান্তি নিয়ে বা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আম্মার কাছে পরামর্শ চাইতেন। বিনিময়ে আম্মার অমায়িক ব্যবহার, আদর আপ্যায়ন আর মূল্যবান উপদেশের বিনিময়ে হাসিখুশি মন নিয়ে ফিরে যেতেন। আম্মা যে শুধুমাত্র অসহায় এতিমদের অকাতরে সাহায্য করতেন তা নয় এইসব এতিমদের আয় উপার্জনের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

অনেক সময় দেখেছি ভাইয়া (মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী) দরবারের যে কোন বিষয়ে আম্মার সাথে আলোচনা করতেন আর মতামত নিতেন। আর আম্মা বিচক্ষণতার সাথে তাৎক্ষণিক মূল্যবান মতামত দিতেন যাতে ভাইয়া সেই মোতাবেক অগ্রসর হতেন। আম্মা সবসময় যে কোন মানুষকে হাসিমুখে দেখতে চাইতেন। আর এইজন্য তিনি অর্থ দিয়ে হোক অথবা বুদ্ধি দিয়ে হোক যে কোন ভাবে মানুষের দুঃখ দূর করে একটা সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিতে চাইতেন।

আম্মা রান্নায় অনেক পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বেশ কিছু একক রান্নার পদ শুধুমাত্র তিনিই তৈরী করতে পারতেন। অন্য কাউকে অনেক শেখানোর পরও আম্মার হাতের রান্নার মত রান্না কেউ করতে পারতো না। তিনি সেলাইতে ছিলেন অসাধরণ পারদর্শী। অনেক সুন্দর সুন্দর নিখুঁত নক্‌শী কাঁথায় গ্রামীণ বৈচিত্র তুলে ধরতেন একজন উঁচুমাপের শিল্পীর মতই।

এককথায় আম্মা ছিলেন একজন দূরদর্শী, মিষ্টিভাষী, বিচক্ষণ, উদার, পরোপকারী আর হৃদয়বান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমার সবসময় মনে হতো আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা আম্মাকে অনেক গুণের অধিকারী করে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন যাতে আমরা কিছু গুণ শিখতে পারি। আম্মার গুণগুলো আমাদের মাঝে ধারণ করার জন্য আল্লাহ্ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন আর দোয়া করি আম্মাকে আল্লাহ্ জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমিন।

সরফরাজ খান বাহাদুর
উম্মুল আশেকীন-এর চতুর্থ মেয়ের জামাতা
পাঠানটুলী খান বাড়ি, চট্টগ্রাম
বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী

তিনি ছিলেন মমতাময়ী মা – পথনির্দেশক

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সুপ্রসিদ্ধ হক মন্‌জিলের আম্মাজান মরহুমা মুনাওয়ারা বেগম সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গেলে সময় শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তাঁর গুণের কথা বিশেষ করে তাঁর স্নেহ, মমতা, আদর-যত্ন, আন্তরিকতা, পরামর্শ, উপদেশ ও সময়োপযোগী দিকনির্দেশনার কথা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি ছিলেন একজন মমতাময়ী মা, একজন পথ নির্দেশক, একজন দার্শনিক, একজন পরামর্শক এবং সর্বোপরি পরিপূর্ণ মানবিক গুণের অধিকারী একজন সাদা মনের মানুষ।

আমি ছোট জামাতা হিসেবে তেইশ বছরের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি তিনি ছিলেন একজন মানব দরদী মহীয়সী নারী যিনি সবসময় পরিবার, আত্মীয়-স্বজনসহ দরবারের সাথে সম্পর্কিত সকল ভক্ত মুরীদানের খোঁজ খবর রাখতেন, জীবনে সফলকাম হওয়ার পরামর্শ দিতেন, আর সকলের আপ্যায়ন এবং আরাম আয়েশের দিকে বেশি নজর দিতেন।

আমরা জামাতারাও সবসময় তাঁর কাছ থেকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ, মমতা ও আদর-যত্ন পেয়েছি যা কখনও ভুলতে পারব না। আমার ক্ষুদ্র জীবনের সকল সফলতা ও প্রাপ্তির পেছনেও রয়েছে তাঁর আন্তরিক স্নেহ, মমতা, দোয়া, সময়োপযোগী উপদেশ ও পরামর্শ যার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এবং গর্ব অনুভব করি।

সময় কত দ্রুত চলে যায়। দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল, আমরা হারিয়েছি আমাদের মমতাময়ী আম্মাজানকে। তাই আমাদের প্রিয় আম্মাজানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করছি ও ফরিয়াদ করছি যেন আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে দাখিল করেন। আমিন।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন
উম্মুল আশেকীন-এর ছোট মেয়ের জামাতা
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ

আমার সুপ্রিয় নানু : ভক্তের আম্মাজান

উম্মুল আশেকীন, “মুনাওয়ারা বেগম”, আমাদের নানু, ভক্তরা তাঁকে ডাকতেন আম্মাজান। মা শব্দটির অর্থ এবং এর সাথে জড়িয়ে থাকা কর্তব্য নানু এত দৃঢ়ভাবে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন যে, আমাদের সবার জন্যই তিনি মাতৃ স্বরূপ। আমরা সবাই তাঁর স্নেহের জন্য লালায়িত থাকতাম।

ভক্তরা তাঁর কাছে এমনভাবে নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা বলতেন ঠিক যেভাবে সন্তান তার নিজের মায়ের কাছে বলে, যেন মা সব ঠিক করে দেবেন। নানু পরম মমতায় সবকিছু শুনতেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান দিতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না। নানু ছিলেন দরবার অন্তপ্রাণ, সবসময় দরবারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

একদিকে যেমন সাংসারিক দায়িত্ব সুগৃহিনীর মত পালন করতেন অন্যদিকে বিচক্ষণতার সাথে দরবারের প্রাতিষ্ঠানিক কাজ তদারকি করতেন। নিজের কষ্টের কথা না ভেবে সবসময় অন্যের কষ্টকে বড় করে দেখতেন। শারীরিক অনেক কষ্টের মধ্যেও তিনি সবসময় হাসি খুশি থাকতেন, তবে শেষের কয়েকটা বছর শারীরিক অসুস্থতার জন্য দরবারে বেশি অবস্থান করতে পারতেন না তাই খুব মন খারাপ করতেন।

নানু খুব অতিথি পরায়ন ছিলেন, দরবারে আসা সব মেহমানরা তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতেন। আমাদের জন্য নানু ছিলেন সমুদ্রে জাহাজের বাতিঘরের মতো, প্রখর রোদ্দুরে বিশাল বটগাছের ন্যায় মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকতেন। নানু নিজেও সবসময় নতুন কিছু শিখতে চাইতেন আবার আমাদেরকেও অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে জীবনের মূল্যবোধ শিখাতেন। তিনি ছিলেন দুরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম থাকলেও তিনি ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ। পরিবারের সাথে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন তিনি। আমাদের কাছে সময় ছাড়া অন্যকিছুই চাইতেন না। তাঁকে কখনো কোন দামি বিলাসবহুল কিছু দিয়ে ততটা খুশি করা যেতনা যতটা খুশি তাঁর সাথে গল্প করলে বা সময় কাটালে হতেন।

আমাদের পুরোনো দিনের গল্প শুনাতেন তবে অতীত জীবন নিয়ে মাঝে মাঝে দুঃখ করতেন যে একাকি অনেক কষ্ট করেছেন। তবে সবসময় ভাণ্ডারীর দয়ার উপর বিশ্বাস রাখতেন এবং এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। খুব সাধারণ

জীবনযাপন করেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারীনি আমার নানু সবসময় আমার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন।

নানু আমাকে অনেক ভালোবাসতেন, যখনি আমি হতাশ হয়ে যেতাম আমাকে সাহস দিতেন। নানুই আমাকে বিশ্বাস জুগিয়েছেন যে, আমি পারব!! আমার পড়াশুনা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটা পদে আমি নানুকে পেয়েছি উপকারী বন্ধুর মত, মমতাময়ী মায়ের মত, এমনকি দায়িত্ববান বাবার মতও আমি তাঁর অভিভাকত্ব পেয়েছি। আমার যেবার চিকেনপক্স হল নানু সারাক্ষণ আমার সাথে ছিলেন। আমি এম.বি.বি.এস এর মত এত কঠিন ডিগ্রী অর্জন করতে পারব এটা আমার চাইতে নানু বেশি বিশ্বাস করতেন এবং এর জন্য সবরকম সাহায্যই তিনি আমাকে করেছেন।

আমাদের পরিবারের সবার প্রতি নানু ছিলেন যত্নবান, আমাদের সবার জীবন তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত ছিল তাই আমরা সবাই প্রতি পদে পদে তাঁর শূন্যতা অনুভব করি। মাঝে মাঝে খুব অপরাধবোধ হয়, আমি হয়ত তাঁর জন্য তেমন কিছুই করতে পারিনি। নানু সবসময় বলতেন ভাণ্ডারীর দরবারে আর্জি দাও ভাণ্ডারী যাতে আমাদেরকে আউয়ালে আখেরে গোলাম হিসাবে গ্রহণ করে নেন। আমরা সেই দোয়াই করি এবং মহান রাব্বুল আলামিন যাতে নানুকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমিন।

ডা. সাজিয়া তানজিন
নাতনি
বড় শাহ্জাদী সৈয়দা জেবুন্নাহার বেগম-এর বড় মেয়ে

দানশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

"বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তাহার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তাহার নর।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর এই শাশ্বত উক্তিতে একটি সমৃদ্ধ ও সুন্দর সমাজের বাস্তব কথা বলেছেন। একটি আদর্শ সমাজ যেমন হওয়া উচিত তার কথাই বলেছেন কবি। কিন্তু আমাদের এই সমাজে নারীদের এই অর্ধেক কৃতিত্বকে খুব অবহেলার সাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এই পুরুষশাসিত সমাজে নারী যেন শুধু অবহেলার বস্তু। এই মানসিকতা যেই সমাজে বিদ্যমান সেই সমাজের একজন মহিলা নিজের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে একটি উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়।

এই প্রবন্ধে আমি সেই নারীকে নিয়ে কিছু কথা বলব, যে শুধু তাঁর পরিবার বা কাছের মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র নারী জাতির জন্য অনুপ্রেরণা। যিনি শুধু তাঁর সন্তানদেরই নয়, হাজার হাজার ভক্তকুলের মা। তিনি হলেন উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম। আমার নানু। নানীর সাথে নাতী-নাতনিদের সম্পর্ক হয় মায়ের সাথে তার সন্তানের সম্পর্কের মতোই নিবিড়। মায়ের মা যেহেতু দ্বিগুণ মা জড়িত এই সম্পর্কে তাই মায়াটা ততটাই গভীর। জন্মের পর থেকে মমতাময়ী আমাদের নানু খুব যত্ন সহকারে বেঁধে রেখেছিলেন আমাদের। এই মায়ার বাঁধনের টানেই হয়তো বা প্রতি সপ্তাহে যেতাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ এবং খুব কাছ থেকেই দেখেছি এই মহীয়সী নারীকে।

নতুন সবকিছুর প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল নানুর। নানা বিষয়ে শিখতে চাইতেন তিনি। কৌতুহল বশতঃ নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন। নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান ধারনা সম্পর্কে জানতে চাইতেন। নিজে পাকা রাঁধুনী হওয়া সত্ত্বেও নতুন কোন খাবার দেখলে তা শিখার চেষ্টা করতেন সব সময়। তাঁর দূরদর্শিতা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু আমাদেরই নয়, সবার কথা চিন্তা করতেন।

আমরা দেখতাম মাইজভাণ্ডার দরবারে যখন নারী ভক্তরা আসতেন তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলতে, তিনি খুব মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শুনতেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বহুমুখী পরামর্শ দিতেন। দরাবরের প্রতি

তাঁর যে আনুগত্য তা আমাদের সবার জন্য অনুরকণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সারাটা জীবন তিনি দরবারের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।
নানু অসুস্থ অবস্থায় এভারকেয়ার হসপিটালে ছিলেন, সারা শরীরে ব্যথা। অনেক অসুস্থ। শরীরে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমন। চারদিকে ব্যথা। রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত নিতে নিতে দাগ হয়ে গেছে শরীরে। ঠিকমত কাউকে চিনতে পারছেন না। এমতাবস্থায় একদিন তাঁর সাথে হাসপাতালে ছিলাম। ঐদিন নানুর শরীর বেশি ভাল ছিল না। আমাকেও ঠিকমতো চিনতে পারছিলেন না। তাঁকে ঔষধ দিয়ে নার্স চলে যাওয়ার পর আমি তাঁর পাশে বসে আছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম নানু কথা বলছেন। দেখলাম তিনি আমার সাথে নয় তাঁর কল্পনায় দরবারের বিভিন্ন কাজ তদারকি করছেন। এই অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি মাইজভাণ্ডারে আছেন এবং সব কাজগুলো তদারকি করছেন। এমনই গভীর ছিল তাঁর দরবারের প্রতি টান।

দানশীলতার এক উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত ছিলেন উম্মুল আশেকীন। তাঁর উপস্থিতিতে ভাণ্ডার শরিফ থেকে কেউ না খেয়ে যেতে পারতো না। সবসময় সবাইকে সাহায্য করার এবং কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে না দেওয়ার এক মহৎ গুণ তার মধ্যে সর্বদা লক্ষ্যণীয়।

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক মানুষের সাথে দেখা করি কথা বলি কিন্তু খুব কম মানুষই আছে যারা আমাদের হৃদয়ে ছাপ রেখে যায়। উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.) ছিলেন এমনই একজন মানুষ। যিনি আমাদের সমাজের জন্য এক অনন্য উদাহরণ যা বর্তমান নারী সমাজ যদি অনুসরণ করতো তবে আমাদের সমাজের অনেক সমস্যা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

তাসনীম ফেরদৌস
নাতনি
বড় শাহ্জাদী সৈয়দা জেবুন্নাহার বেগম-এর ছোট মেয়ে

ধৈর্য্য – সহনশীলতার শিক্ষক

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম তথা আমার নানু সম্পর্কে গল্প করা যত সহজ, তাঁর জীবন নিয়ে লিখা তার চেয়ে সহজ মনে হয়েছে আমার। আমার জীবনের ৩২ বছর তিনি অক্সিজেনের মত ছিলেন। আমার জন্ম, বেড়ে উঠা, শিক্ষা গ্রহন, বিয়ে পর্যন্ত তিনি সশরীরে সাক্ষী থেকেছেন, আমার বাকি জীবন ছায়া হয়ে সাক্ষী থাকবেন। আমার দাদা-দাদি মারা গেছেন অনেক আগে। আমরা ভাই-বোনেরা দাদুর বাড়ি বলতে চিনতাম একটা জায়গা, দরবার শরিফ। আমাদের জন্য নানুর বাড়িও যা দাদুর বাড়িও তা। শীতকালীন ছুটিতে যখন দরবারে যেতাম তখন নানু আমাদের সকল খালাতো ভাই-বোনেদের খাতা আর রঙ পেন্সিল দিয়ে পাটি বিছিয়ে ছবি আঁকতে দিতেন। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝি যে তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি আমাদের যেমন চুট্‌কি বানানো শিখিয়েছেন, তেমনি সৃষ্টিশীল শিক্ষামূলক কাজেও সংযুক্ত করেছিলেন।

নানুকে আমার সবসময় পদ্ম ফুলের মত মনে হয়েছে। আমার বয়স যত বাড়তে থাকল, তত তাঁর পদ্মফুলের পাতার গভীরত্ব বুঝতে পারলাম। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি নানু যখনি শহরে আসতেন, আমাদের বাসাতে থাকতেন। দুবছর আগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "নানু, আপনি যখন এই মন্‌জিলে (হক মন্‌জিল) প্রথম আসেন তখন আপনার রাগ হয়নি? সবার উপর ক্ষোভ হয়নি?" নানু তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন, "আমার এখানে আসাতেতো সব ভালই হল, তাই না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "তাহলে আমার রাগ হবে কেন?" আমি বোকা, বুঝতে পারিনি, যার মন ভালবাসা দিয়ে তৈরি তিনি কিভাবে মানুষের উপর রাগ করবেন!!

তিনি সময়ের সমস্ত পরীক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ইতিবাচকতা আর ভালবাসার সাথে। তিনি বটবৃক্ষের মত শক্ত ভিত গজিয়ে আকাশচুম্বী হয়ে উঠলেন। তাঁর সংস্পর্শে থাকা দরবারের আশিকদের জন্য শান্তির ছায়া হয়ে গেলেন। শহরে তিনি আসতেন কাজে, কিন্তু কখনই বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার শহরে থাকতেন না। শুক্রবার সকাল থেকে তিনি পুরোদস্তুর কর্পোরেট অফিসার, সকল প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু। ঐ দিন জুমা নামাযের আগে আর মাগরিবের নামাযের পর তিনি অন্দরমহলে আসা সকল নারী ভক্তদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, পরামর্শ দিতেন তাদের।

নানুর কাছ থেকে আমি সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছি সেই একটি প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে, কার্যনীতি শিখেছি দরবারের মত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা দেখে, মমত্ববোধ শিখেছি তাঁর সন্তান ও পরিবারের প্রতি ভালবাসা দেখে, সব থেকে বড় শিক্ষা পেয়েছি কিভাবে খোদার খেদমত করতে হয় মানবতা চর্চার মাধ্যমে। তাঁর একান্ত ইবাদত ছিল ফজরের ওয়াক্তে। নানুর সাথে রাতে থাকা হলে প্রায় ফজরের ওয়াক্তে দেখতাম তিনি নানাভাই, তথা বিশ্বঅলি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর রওজা মোবারকে উপস্থিত। অনেকবার তাঁর সাথে গিয়েছিলাম সেই ভোরে জিয়ারত করতে। যতবার গিয়েছি, দেখেছি তিনি সিজদাহ্ করে একমনে নানা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে দোয়া চাইছেন। বিশ্বে যেসব বস্তুর উৎস সীমিত তাদের সম্পদ বলা হয়, যেমন– মোনালিসা। এই চিত্র বিশ্বে মাত্র একটি। আমার কাছে তেমন একটি সম্পদ আমার নানুর হাতের বানানো আমসত্ত্ব। ছোটবেলার চিরচেনা একটি দৃশ্য, নানু পাটিতে আমসত্ত্ব বিছিয়ে রোদে শুকাচ্ছেন। সেই পাটির ছাপওয়ালা আমসত্ত্ব আজ বিলুপ্ত, সেই সৃষ্টির স্রষ্টা আর নেই। এখন দিন শেষে সূর্য অস্তমিত, কিন্তু সূর্য যেমন চাঁদের মাধ্যমে আলো ছড়িয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখে, তেমনি তিনি আজও আমাদের মাঝে চাঁদের আলো হয়ে উপস্থিত। তাঁর 'উম্মুল আশেকীন' হয়ে উঠার নেপথ্যে উনার যাত্রার ইতিহাস ভাল জানা যাবে তাঁর সন্তানদের লিখিত দলিল থেকে। আমি কেবল একজন নাতনী ও একজন ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখলাম।

আফিফা রহমান
পিতা: মোঃ কামালুর রহমান
মাতা: সৈয়দা হুমায়রা বেগম
সম্পর্ক: নাতনি (উম্মুল আশেকীন-এর মেজ শাহ্‌জাদীর বড় মেয়ে)

কোন জিনিস অপচয় করো না

শুভ্র বসনা আমার নানুকে এক কথায় বলা যায়, “Simplicity is the ultimate sophistication”. ঘড়ির কাঁটার সাথে চলতেন যেন পুরোদস্তুর পেশাদার একজন ব্যক্তিত্ব, পরিধেয় বসন তাঁর এতই সরল রাখতেন যে অতিরিক্ত সময় যেন সাজপোশাকে না যায়। তবে সরল সাধারণ ছিলেন বলে যে রুচিশীল ছিলেন না তা নয়। নির্দিষ্ট ধরণ, রঙ, বুনন এবং কাপড়ে সূক্ষ্ম কাজ খুব পছন্দ করতেন। এছাড়া দুবাই, আরব আমিরাত থেকে অনেকে দামী প্রসাধনী, পোশাক, গহনা উপহার হিসেবে পেলে তিনি তা গ্রহন করতেন কিন্তু পরিধান করতেন না। দরবারে যে তিনি ভোগ নয় কেবলই খেদমতের জন্যে এসেছেন।

আম্মুর কাছে নানুর প্রথম জীবনের সংগ্রামের অনেক গল্প শুনেছি। ভাণ্ডারী তাঁকে দিয়ে যেমন খেদমত করিয়েছেন পুরস্কার হিসেবে অফুরন্ত নেয়ামতও দান করেছেন। আমরা তাঁর নাতি-নাতনিরা তাঁর সোনালী সময়ের সাক্ষী ও সহযাত্রী। রিজিক শব্দের অর্থ কেবল অর্থ ও আহার নয় বরং সুস্বাস্থ্য, হৃদয়ের বিশুদ্ধতা, আত্মার প্রশান্তি এবং নেককার সন্তান-সন্ততি ও পারিবারিক সম্প্রীতিও বোঝায়, সেই অর্থে, মহান আল্লাহ্ তা-আলা আমার নানুকে উত্তম রিজিক দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন। নানুর জীবনের যে অধ্যায় আমি দেখেছি তাতে দরবারে কোন কিছুর অভাব ছিল না বরং ছিল প্রাচুর্য। এত প্রাচুর্যের ভিতরেও আমার নানু ছিলেন মিতব্যয়ী, অপচয় তিনি একদম পছন্দ করতেন না। সর্দি কাশির সময় আমার আম্মুকে দেখেছি তাঁকে টিস্যু দিলে তিনি দু’ভাগ করে টিস্যু ছিড়ে নিতেন। এক ভাগ ব্যবহার করতেন বাকিটা পরবর্তীর জন্য রেখে দিতেন। আমরা হেসে নানুকে এমন করার কি দরকার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, “যে জিনিস সাশ্রয়ী করে চলা সম্ভব তা অযথা কেন অপচয় করব”।

তাঁর ব্যক্তিত্বে যেমন ভাবগাম্ভীর্যতা ছিল ঠিক তার পাশাপাশি শিশুসুলভ সরলতাও ছিল। আমাদের নাতি-নাতনিদের নিয়ে লুডু খেলা, বনভোজন আয়োজন করা, মৌসুমী ফল, পিঠা নিজ হাতে খাইয়ে দিতেন। তবে, আদব-কায়দার ব্যাপারে আমার নানু সবসময় আপোষহীন ছিলেন। দরবারে খেদমতের জন্য আসা গৃহকর্মী বা দূর দূরান্ত গ্রাম থেকে আসা ভক্তকূলের সাথে যেন আমরা বিনীত আচরন করি তা আমাদের নানুর শিক্ষা যা তাঁর ভাষ্যে তাঁর শ্বশুর অসি-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশ ছিল।

আমাদের জন্ম, বেড়ে উঠা, পড়াশোনা, বিয়ে, সংসার জীবনে প্রবেশ, মা হওয়া সব কিছুতেই নানুর প্রত্যক্ষ অবদান ও দোয়া রয়েছে। তাই, অজস্র স্মৃতিভাণ্ডার থেকে কেবল ২টি স্মৃতিকথা আজকে বলবো।

প্রথম স্মৃতি:

প্রেগন্যান্সিকালীন পুরোটা সময় পেঁপে ও আনারস ডাক্তারের নির্দেশে পরিহার করি। একদম শেষের দিকে বাচ্চা প্রসবের আগ মুহূর্তে আমি নানুর কাছে যাই দোয়া চাইতে। তিনি আমাকে পেঁপের একটি টুকরো নিজ হাতে খাইয়ে দিলেন। শোকর আল্লাহ্‌র দরবারে, পরের দিন সকালে প্রসব বেদনার চার ঘণ্টার ভেতরে নরমাল ডেলিভারীর মাধ্যমে আমার সন্তান যাক্‌ওয়ান হোসেন পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখে।

দ্বিতীয় স্মৃতি:

একদিন আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "ও নাতিন, সবসময় হাসিখুশি থাইবে, মন বেজার ন' গরিবে, সবর ধরিবে" তখন হয়তো এই কথাগুলোর গভীরতা বুঝিনি। তবে, এখন যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে তাঁর বাণী আমাকে ধৈর্য্য ও সবরী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

শেষ স্মৃতি:

হাসপাতালের বেডে অনেকগুলো মেশিন হাতের আঙ্গুলে, কপালে, বুকে লাগানো। তিনি ভীষণ ক্লান্ত অনুভব করছিলেন। হাতে তাঁর বিয়ের চিকন চুড়িগুলো (যেগুলো সারাজীবন তিনি একবারও খুলে রাখেননি) নিয়ে ভীষণ অস্বস্তিতে ছিলেন। আমি বললাম, "নানু মেশিনতো খোলা যাবে না, আপনার অস্বস্তি লাগলে চুড়িগুলো কি খুলে রাখব?" তিনি বললেন "তা কি করে হয়?" আমি বললাম "আপনার খারাপ লাগছে? আপনি কি চান খুলে রাখতে?" তিনি বললেন, "খোলা তো যাবে না সামনে বিয়ে আছে না" বলে তিনি লাজুক ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে ফেলেন। আমি বললাম, "কার বিয়ে নানু?" তিনি নিরুত্তর থাকলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার?" তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে বোঝালেন, তাঁর। আমার বুঝতে আর দেরি হল না, শাহানশাহ্‌ এই যাত্রায় তাঁর ভালোবাসার সহধর্মিনীকে নিয়ে যাবেন ঠিক যেমন করে নিয়ে এসেছিলেন ১৯৫৫ সালে দাঁতমারার জমিদারবাড়ি থেকে। ঠিকই তার পরের সপ্তাহে আমার নানু তাঁর জীবনের শেষ সাজ সেজে আমার নানাভাইয়ের বুকে ফিরে যান।

যাহ্‌রা মান্‌ওয়ারা রহমান

নাতনি

উম্মুল আশেকীন-এর মেজ শাহ্‌জাদীর ছোট মেয়ে

দরবার খেদমতের জায়গা

২০১৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত শাহানশাহ্ বাবাজানের দরবারে আমি কেবলই একজন ভক্ত ও আশেক যে কিনা মুনিব মওলাকে এক নজর দেখতে এবং বাবাজানের কদম মোবারকে হাজিরা দিতে যেতাম, উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম আমার জন্য তখন কেবলই ছিলেন শাহানশাহ্ বাবাজানের বিবি এবং মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারীর মাতা। পরবর্তীতে তাঁকে নানু বলে সম্বোধন করার এবং তাঁর স্নেহভাজন হওয়ার সৌভাগ্য হবে তখন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

২০১৬ সালের জুন মাসের ৫ তারিখ তাঁর নাতনি যাহ্রা মান্ওয়ারা রহমান (শাহ্জাদী সৈয়দা হুমায়রা বেগম-এর কনিষ্ঠ কন্যা) এর সাথে আমার বাগদান সুসম্পন্ন হয়। ঐদিন প্রথমবার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। নিজ হাতে আমাকে আংটি পরিয়ে মজার ছলে দুলাভাই বলে সম্বোধন করেন, যার শক্ত হাতে দরবার গঠনের গল্প শুনেছি, কঠিনতম সময়ে কঠিনতম সিদ্ধান্ত ভাণ্ডারীর দয়ায় তিনি একা নিয়েছেন। তাঁর এত নির্মল প্রণোচ্ছলতা দেখে আমি অভিভূত। নানী শ্বাশুড়ি হিসেবে অনেক আদর দিয়েছেন আমাদের নাত জামাইদেরকে।

আপ্যায়নে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর অজস্র গুণাবলির মধ্যে একটি গুণ আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে তা হল, প্রচন্ড অমায়িক তিনি। তাঁর যে কোন সফলতা ও সার্থকতা তিনি ভাণ্ডারীর কদমে সমর্পন করেন, তিনি বিশ্বাস করতেন ভাণ্ডারী তাঁকে দিয়ে করিয়েছেন। নিজেকে প্রশংসার দাবীদার নয় বরং ভাণ্ডারীর খেদমত করতে পেরে শোকরগুজারি ছিলেন। দোয়া নিতে একদিন দেখা করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "দরবার খেদমতের জায়গা, চেষ্টা করবে সাধ্যমত খেদমত করতে"। আমি হয়তোবা সীমিত সময়ের জন্য তাঁকে কাছে পেয়েছি তবে যে দোয়া ও ভালোবাসা পেয়েছি তা আমার বাকী জীবনের জন্য অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

মোঃ সাবাব হোসেন
উম্মুল আশেকীন-এর মেজ শাহ্জাদীর ছোট মেয়ের স্বামী

তিনি ছিলেন সুশৃঙ্খল – নিয়মানুবর্তী

উম্মুল আশেকীন হলেন আমার নানু। তিনি আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি সবসময় আমার আদর্শ ছিলেন, থাকবেন। তাঁকে নানু হিসেবে পাওয়া আমার জন্যে মহান স্বর্গীয় আশীর্বাদ। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ। তিনি শুধু ক্ষুধার্তদেরকে খাদ্য, পানীয় এবং আশ্রয় দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না বরং তাদের বিভিন্ন রকম ফরিয়াদ এবং অভাব-অভিযোগ পূরণে সহযোগিতা করতেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন, সবাই সেটা জানত এবং সবাই তাঁর কাছ থেকে সমস্যার সমাধান চাইতেন। তাঁর প্রতি সবার সুগভীর আস্থা ছিল। বিভিন্ন জনের সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ আচরণ ও ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে করেই আমি বড় হয়েছি।

তিনি নাতি-নাতনিদের সঙ্গে কৌতুক/মজা করতে পছন্দ করতেন। আমাদের খেলার সময় তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। মাইজভাণ্ডার শরিফে যখনই মাজার জিয়ারতে যেতাম, আমরা তাঁর দোয়াপ্রার্থী হতাম। সে সময় তিনি আমাকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশৃংখল এবং নিয়মানুবর্তী। এমন কোন দিন নেই যখন খাওয়ার সময় হলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠাতেন না। সকল পরিস্থিতি তিনি মহানুভবতার সাথে মোকাবিলা করতেন। আমি কখনোই তাঁকে আবেগতাড়িত হয়ে রাগারাগি করতে দেখিনি।

তাঁর সাহচর্যে থাকা সকলের প্রতি তিনি সদয় ছিলেন। তিনি শিশুদের ভালবাসতেন। প্রত্যেকে তাঁকে ভালবাসতো।

সামিহা মুনাওয়ারা জসিম

নাতনি

উম্মুল আশেকীন-এর ছোট শাহ্‌জাদীর বড় মেয়ে

আমরা তাঁর পাশে থাকলে খুব খুশি হতেন

উম্মুল আশেকীন আমার নানু। আমার মা যখনই সুযোগ পেতেন আমাদের নানুর কাছে নিয়ে যেতেন। তাই বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে অনেকটা সময় আমরা তাঁর সাথেই কাটিয়েছি। তাঁর সাথে কাটানো সময়গুলো এতটাই আনন্দময় ছিল যে, আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তিনি আমাদের সকলের প্রতি এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, আমরা তাঁর চারপাশে প্রশান্তি অনুভব করতাম। আমি সবসময় দেখেছি নানু অচেনা মানুষের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন যেন তারা বহুদিনের পরিচিত। তিনি তাদের পরম মমতায় জড়িয়ে ধরতেন এবং তাদের বলা প্রতিটি কথা শুনতেন। তাঁর সাথে আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। বিশেষ করে নানুবাড়িতে যখন আমরা খেলায় ব্যস্ত থাকতাম দুপুর বা রাতের খাবারের সময় হলে তিনি আমাদের আগে খাবার খেয়ে তারপর খেলতে বলতেন। আমরা না থামা পর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে দিতেন না। আমরা তাঁর চারপাশে থাকলে তিনি খুশি হতেন এবং সবার সাথে একসাথে খেতে ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের সাথে কথা বলতে ও হাসি ঠাট্টা করতে পছন্দ করতেন।

আপনজনদের সংস্পর্শে থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। যদিও তিনি মানুষের জন্য ব্যস্ত জীবন কাটিয়েছেন তবুও আমাদের সময় দিতেন এবং আমরা একসাথে অনেক জায়গায় গিয়েছি। আল্লাহ্‌র রহমতে আমি তাঁর সাথে কাবা শরিফ জিয়ারতের সুযোগ পেয়েছি। এই অনুভূতি আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তিনি আমাদের খুব যত্ন নিতেন। আমাদের চলে যাওয়ার সময় রাত বেশি হলে বা আবহাওয়া খারাপ থাকলে যেতে দিতেন না। তিনি আমাদের সবসময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন এবং নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর জন্য দোয়া করতেন। আমরা গেটের বাইরে না আসা পর্যন্ত তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং নিরাপদে পৌঁছেছি কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফোন করতেন। তাঁর সাথে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে যা আমি চিরকাল আমার মধ্যে লালন করবো। তিনি আমার দেখা সবচেয়ে দয়ালু ও নির্ভরযোগ্য মানুষ এবং তাঁর মতো অসাধারণ মানুষকে নানু হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত। সবার প্রতি তাঁর স্নেহ, মমতা ছিল অবিরাম এবং আমি মনে করি, তিনিও সবার মায়া অনুভব করতেন।

ফাবিহা নূর জসিম

নাতনি

উম্মুল আশেকীন-এর ছোট শাহ্‌জাদীর ছোট মেয়ে

তথ্য সংগ্রহকারীর মতামত

মা'জান

যে নামে কখনো ডাকা হলো না তাঁকে। কারণ বলতে পারবোনা। জানিনা। খুব ইচ্ছে করতো যখন সবাই ডাকছে।

যেদিন ট্রাস্ট অফিস হতে ফোন করে বলা হলো, "উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম" মানে আমাদের "মাজান"-এর স্মরণে একটা বই বের করবে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট', সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎকার নিবার ভার পড়েছে এই অধমের উপর।

এতো সম্মানিত মনে হয় এই জীবনে প্রথম বোধ করলাম। আনন্দ কান্না এবং শংকা তিনটা বোধ একসাথে খেলা করলো ভিতরে।

আসলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার করুণাতে জন্ম থেকেই তাঁকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। তবে চর্ম চোখে। সেই এক ধৈর্য্যের পরম এবং চরমতম জাগ্রত মূর্তি ছিলেন আমার মা'জান। তাঁর একটা ছবি আমার চোখে সবসময়ই থাকে। সেটা ১৯৯১ সালের ৩রা অক্টোবর, আমার আব্বা (উম্মুল আশেকীন-এর ছোট ননদ সৈয়দা নাজমুন্নেসা বেগম-এর স্বামী চৌধুরী এন জি মাহমুদ কামাল) যেদিন ইন্তেকাল করলেন। আব্বা রাত ২.৩০ মিনিটে মারা গেলেন। ভোর ৪.৩০ এ মা'জান একরাশ নাস্তা-চা নিয়ে আমাদের বাসায় হাজির। তখন শহরের অনেক আত্মীয় এসে পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে চলে এসেছেন। আম্মার রুমে ছিলেন। আমি ঢোকার সাথে সাথেই মুখ শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে ফেললেন। আমি কাছে গেলাম তিনি মুখ দেখাবেন না আমাকে। মনে হচ্ছিল আমার কষ্টটা তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন না। কারণ কদিন আগেই তো বাবাজান পর্দা করেছেন। বাচ্চাদের বাবা হারানোর কষ্টটা কাছ হতে দেখেছেন। আমি ওইদিন জানলাম মা'জান কতো কাছের।

এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার কাজটা করা অবস্থায় একটা কথা বারবার মনে হচ্ছিল। মা'জান আমাদের সাথে মাঝে মাঝে খুব কৌতুক করে হাসতেন। কি যে এক মায়াভরা স্মিত হাসি, অভয়ের হাসি। আবার মনে হতো তিনি খুব চিন্তা করছেন। অনেক কিছু নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন। প্রায় সবকিছু নিয়ে সবার মংগলের চিন্তা। হঠাৎ করে বলে উঠতেন, "আচ্ছা, আমি এমন কেনো রে!" বলে খুব সিরিয়াস হয়ে যেতেন। তাঁর প্রতিটি কথা ছিলো আমাদের জন্য শিক্ষা।

আমার বিয়ে আর বড় শাহ্‌জাদী মানে জেবু আপার বিয়ে ৩ মাস আগে-পরে হয়েছিল। আমাকে সবসময় সাহস দিতেন আমার খবর নিতেন। জেবু আপাকে বলতেন দেখো স্বপ্না কি সুন্দর করে সবার সাথে মিলেমিশে আছে। এটা মানে আমি যা না তাই বলতেন। তিনি ঐ গুণগুলো আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মনোবল বৃদ্ধি করতেন আমার। আমি তাঁর কথার মাধ্যমে নিজেকে সংসারে আমার আসন করেছি।

আসলে মা'জানকে নিয়ে বেশি কিছু লিখার সুযোগ এখানে নেই। তিনি একজন জমিদার তনয়া মাইজভাণ্ডার শরিফে শাহানশাহ্ বাবাজানের মতো একজন মহান অলির সহধর্মিনী হয়ে এসে নিজেই লাখো ভক্ত আশেকের মা হয়ে গেলেন। এই দীর্ঘ সংসার যাত্রা এবং দরবারের খেদমত তিনি এমনভাবে করেছেন, একাধারে জমিদারি আত্মসম্মানবোধ এবং আরেকজন মহান অলি হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) (তাঁর শ্বশুর আব্বা)'র কর্মের আলোকে আলোকিত হয়ে হক মন্‌জিল তথা মাইজভাণ্ডার শরিফের একটা বিশেষ স্থানে তিনি আসীন হয়েছেন, সেটা তাঁর ইন্তেকালের দিন, জানাযার দিন লাখো আশেকের ঢল দেখেই সবাই বুঝতে পেরেছেন। এমন ব্যক্তিত্বশালী যিনি প্রত্যেক আশেক-জায়েরীনদের নিজের অকুণ্ঠ মায়া-মমতা দিয়ে, সবার সমস্যা এবং সবার আর্জি ফরিয়াদ শুনে এবং সমাধানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তিনি করেছেন। জায়েরীনদের মনের কথা এবং কষ্ট তিনি নিজেই বলে দিতেন। আমি নিজেই দেখেছি তাঁর এই আধ্যাত্মিক শক্তি আলহামদুলিল্লাহ্। আর হবেই না কেনো?

শাহানশাহ্ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সাথে তিনি নিজেও যে রিয়াজতের জিন্দেগী যাপন করেছেন তাতে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন একজন অলি হয়ে উঠা আশ্চর্যের কিছু নয়।-

এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়কালটা বড়ো কষ্টের ব্যাপার ছিলো। যিনি দিচ্ছেন তারও এবং আমারও। চোখের জলের সাথেই এই স্মরণের কাজগুলো করেছেন সবাই। আমার ছেলে জিকো অনেক সহযোগিতা করেছে আমাকে প্রতিটি পর্বে। না হয় আমার জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়তো এই কাজগুলো। যাঁরা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভোরবেলার শিউলির মতো সেই স্মিত হাসি দিয়ে, দুহাত বিস্তৃত করে হিমালয়তুল্য সেই বুকে আশ্রয় দেওয়ার, প্রতি ক্ষণ খবর নেওয়ার সেই মা'জান তো আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

কিন্তু সৎকর্মশীল জীবন-যাপন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার তৌফিক আমরা তাঁর উসিলায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর বারগাহে ফরিয়াদ করবো। আমার বিশাল একটা বিশ্বাস মনের কোণে উঁকি দেয়, আমরা সবসময় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তথা সমগ্র মাইজভাণ্ডারী অলিকুলের সাথে আমার "মা'জান" আমাদের সাথে থাকবেন – রহমত হয়ে থাকবেন, ইহকাল পরকাল।

সৈয়দা রাইসা ফাতিমা
উম্মুল আশেকীন-এর ছোট ননদ সৈয়দা
নাজমুন নেসা বেগম-এর বড় মেয়ে

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্‌র দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া এবং সরকারে দোআলম নুরে মোজাস্‌সম আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায়, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্‌ হযরত শাহ্‌ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর অশেষ নেক নজরের কারণে এমন একটি মহতি উদ্যোগে আমি নগন্য কিছু খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি তার জন্য শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। প্রাণপ্রিয় মুরশিদ শাহ্‌ সুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)-এর প্রিয় আম্মাজান উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর স্মৃতিচারণমূলক পবিত্র পুস্তকটির সংকলনে আমাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তার জন্য আমি 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা যখন এই সংকলণের কাজে নিয়োজিত হই তখন আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, মাধ্যম বা উসিলা তৈরি করে দিয়েছিলেন। যার জন্য কাজ করতে গিয়ে আমাকে কোন ধরণের সমস্যায় পড়তে হয়নি। বরং আমি নিজেই হতবাক হয়েছি যেন সবকিছু আগে থেকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পরম শ্রদ্ধেয় উম্মুল আশেকীন আম্মাজান হযরত মুনাওয়ারা বেগম সম্পর্কে যত তথ্য পেয়েছি বেশিরভাগ (বলতে গেলে ৯৯ ভাগ) তথ্য প্রায় একই রকম। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত মহিমান্বিত ছিল যে সবার কাছে আম্মাজান পরম শ্রদ্ধেয় এবং আম্মাজান-এর গ্রহণযোগ্যতা একই রকম। তাঁর সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা এখানে তুচ্ছ। তিনি এমন একজন মহীয়সী নারী যেন মহান রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির সেবক অর্থাৎ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একনিষ্ঠ খাদেমা হিসেবে তাঁকে আমরা আবিষ্কার করি।

লোভ, অহংকার, গৌরব যাবতীয় আমিত্ব তাঁকে কখনোও গ্রাস করতে পারেনি। আম্মাজান ছিলেন পাহাড়ের মত সুদৃঢ়, সাগরের মত গভীর একজন মহয়ীসী নারী। যাকে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন যথাযোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন এবং তিনি প্রকৃতই একজন আল্লাহ্‌র অলি ছিলেন। আমি যতটুকু জেনেছি বা উপলব্ধি করেছি তা অতি সামান্য, এর উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা, শ্রদ্ধেয় আম্মাজান উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর উসিলায় আমাকে ক্ষমা করেন এবং শেষ বিচারের হিসাব যেন সহজ করে দেন। আমিন।

এড. শাহ্‌জাদী ইয়াসমিন মুক্তা
চট্টগ্রাম জজ কোর্ট

অগণিত আশেক-ভক্তের মহীয়সী আম্মাজান 'উম্মুল আশেকীন' হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর জানাযা শরিফ

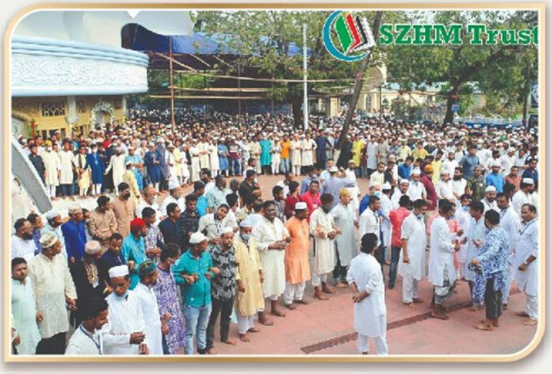

SZHM Trust

SZHM Trust
-ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবর্গ

SZHM Trus

SZHM Trus

মহীয়সী আম্মাজান 'উম্মুল আশেকীন' হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)-এর ওফাতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বিভিন্ন মন্‌জিল, দরবার, সুফি সংগঠন, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের শোকবার্তা

০৭ অক্টোবর ২০২১

শোক বার্তা

প্রেস উইং, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর সহধর্মীনি মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
প্রধানমন্ত্রী মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

সুপ্রভাত

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্ত্রীর দাফন সম্পন্ন

সৈয়দ জিয়াউল হক

দৈনিক পূর্বকোণ

প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী'র সহধর্মিণী মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগমের জানাজায় জনসমুদ্র

শোকবার্তা

আমরা শোকাহত

মাইজভাণ্ডার শরিফ অধ্যাত্ম শরাফতের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র সহধর্মীনি, লাখো আশেক-ভক্তের 'মহিয়সী আম্মাজান' ও 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট)'-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারপারসন আলহাজ্ব মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে আজ রাত দশটার সময় ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
আগামীকাল ৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বা'দ আসর মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী ময়দানে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
[SZHM Trust]

জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিণী সৈয়দা মুনাওয়ারা বেগমের ইন্তেকাল

মাইজভাণ্ডারের অধ্যাত্মিক শরাফতের অন্যতম প্রাণপুরুষ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সহধর্মিণী ও সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের (এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল বুধবার রাত ১০টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি.......রাজিউন)। আজ বৃহস্পতিবার বা'দ আছর মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী ময়দানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।-বিজ্ঞপ্তি

জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিণীর মৃত্যুতে বিএনপির শোক

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মিণী ও সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর মাতা মোসাম্মৎ মুনওয়ারা বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান মীর মো. নাছির উদ্দীন, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা বেগম রোজী কবির, গোলাম আকবর খন্দকার, এস এম ফজলুল হক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক ডা. শাহাদাত হোসেন, সদস্য সচিব আবুল হাশেম বক্কর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহবায়ক আবু সুফিয়ান, সদস্য সচিব মোস্তাক আহমেদ খান। শোক বার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মহান আল্লাহর নিকট মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

শোক বার্তাঃ

মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহসুফি হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.)'র যুগশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিনী এবং দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মনজিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি, সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী এর শ্রদ্ধেয় আম্মাজান আলহাজ্ব মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম এর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর প্রতি আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দুআ করি, রাব্বুল আলামিন তাঁর সকল দ্বীনি খেদমতকে কবুল করুন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন এবং তাঁর অগণিত ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী সবনাকে সবরে-জামিলের তাওফীক দান করুন। আমিন।

শোকার্তেঃ

এম এ সালাম
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ।
সভাপতি, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ।
০৮.১০.২০২১ইং

Mohibul Hassan Chowdhoury
42 minutes ago

"গভীর শোকাহত"
মাইজভাণ্ডার দরবার অধ্যাত্ম শরাফতের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিশ্বঅলী শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সহধর্মীনি ও শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট (এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট)-এর টাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম ইন্তেকাল করেছেন....ইন্নালিল্লাহি ওইন্না ইলাহি রাজিউন

মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি
13h

শোকবার্তা।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সহধর্মিণী এবং দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মনজিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী এর মাতা আলহজ্ব মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম এর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

Rezaul Karim Chowdhury
2d

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) র বিবি উম্মুল আশেকীন মোছাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

আমি মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

রেজাউল করিম চৌধুরী
মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

1.6K 200 Comments · 56 Shares

Mohammed Khorshed Alam Sujon
3d

◎ শোক সংবাদ ◎
~~~~~~~~~~~~~
বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারীর (ক.) সহধর্মীনি ও শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী (ক.) ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান মাইজভান্ডারীর (ম.) মাতা মোছাম্মৎ মুনওয়ারা বেগম গতকাল রাতে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

আমি মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহতায়ালা মরহুমাকে জান্নাত নসীব করুন। আমিন।

শোকাহত:
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজন
সাবেক প্রশাসক, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ।

০৭ অক্টোবর ২০২১
হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) এর সহধর্মিণীর মৃত্যুতে বিএনপি নেতা আবু সুফিয়ানের শোক বার্তা

মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরাফতের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)- এর সহধর্মীনি, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারপারসন মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহবায়ক ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান ।তিনি তার তাঁর শোকবার্তায় বলেন নিঃসন্দেহে তিনি একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন একাধারে তিনি বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) এর সহধর্মিণী এবং রাহবারে আলম সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম) এর মত মহৎ একজন ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধেয় আম্মাজান।তিনি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
11:36 PM

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর সহধর্মিণী
আলহাজ্ব মোসাম্মৎ মুনাওয়ারা বেগম
(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সহধর্মিণীর জানাজা -প্রতিনিধি

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সহধর্মিণীর দাফন সম্পন্ন

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সহধর্মিণী ও গাউসিয়া হক মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (মা.) মাতা মুনাওয়ারা বেগমের নামাজে জানাজা গতকাল বৃহস্পতিবার বাদে আসর মাইজভাণ্ডার শাহী মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা নামাজ শেষে বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা শরীফের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।
জানাজার নামাজে ইমামতি করেন মাইজভাণ্ডার শাহী জামে মসজিদের সাবেক খতিব মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম কোরকানী। এতে সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীসহ বিভিন্ন দরবারের আওলাদেপাক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ লাখো আশেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, মুনাওয়ারা বেগমের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এছাড়া মরহুমার ইন্তেকালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা আব্দুল করিম সিরাজ নগরী, কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ মাওলানা সাইফুদ্দীন আহমদ আলহাসানী, মহাসচিব আল্লামা মুহাম্মদ আবুল কাশেম নুরী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সৈয়দ বদরুদ্দোজা নকশবন্দি, আল্লামা মুফতি ইব্রাহীম কাদেরী, অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ অছিউর রহমান আলকাদেরী, আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, রাহে ভাণ্ডার তরিকার পীর আল্লামা সৈয়দ জাফর ছাদেক শাহ (মা.জি.আ.), বোয়ালখালী আহলা দরবার শরীফের শাহজাদা মাওলানা মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক জানিয়েছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ

সূত্রঃ আসুওয়াজাবা/শোক/বি-১১/২০২১/১০/০৭
তারিখঃ ০৭.১০.২০২১

বিশ্ব অলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর সহধর্মিনির ইন্তিকালে আহলে সুন্নাতের শোকবার্তা।

[illegible]

০৭-১০-২০২১
মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ
দপ্তর সচিব
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ

জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সহধর্মিণীর ইন্তেকালে ফজলে করিম এমপি'র শোক

নিজস্ব সংবাদদাতা ■ রাউজান

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সহধর্মিণী, আলহাজ হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (ম.) মাতা উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগমের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন রাউজানের সাংসদ, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী। এছাড়াও শোক জানিয়েছেন রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম এহেছানুল হায়দর চৌধুরী বাবুল, উপজেলা আ. লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবদুল ওহাব, রাউজান পৌরসভার মেয়র জমির উদ্দিন পারভেজ, উপজেলা আ. লীগের সি. সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কফিল উদ্দিন চৌধুরী। তারা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।
~~~~~~~~~~~~~

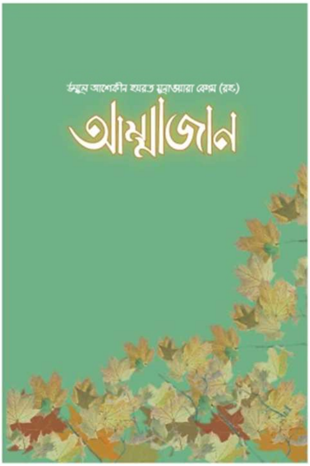

Ummul Ashekeen Hazrat
Munawara Begum (R)

AMMAJAN

szhtrust@gmail.com
facebook.com/szhmtrust
www.sufimaizbhandari.org.bd

ISBN : 978-948-8083-29-1